৯ম সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০১৭ - ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

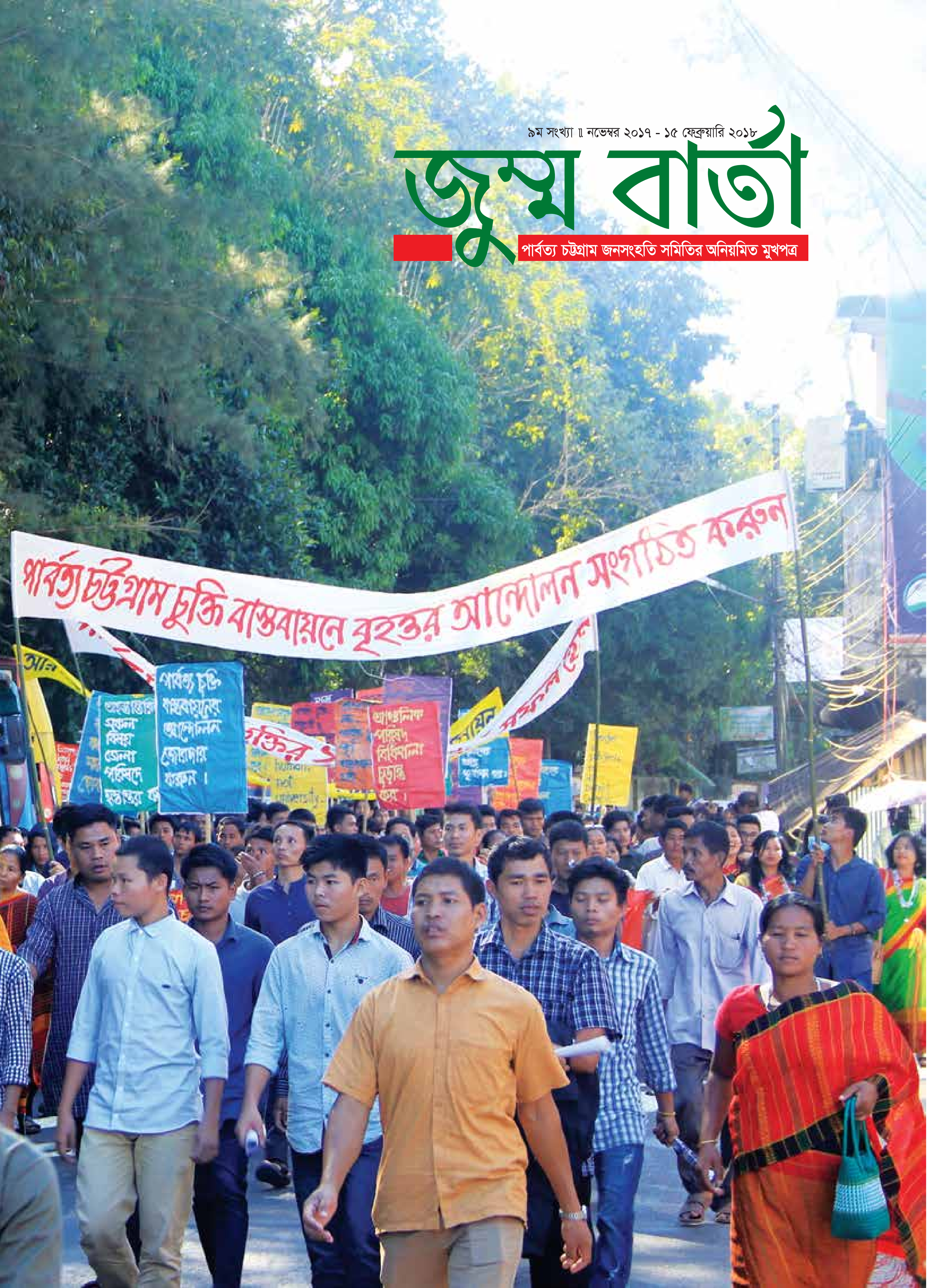
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করুন
পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করুন ।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আলোচনা সভা ০৪-৪৬

- চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে পাহাড়ে আগুন জ্বলবে - জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ০৫
- পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম সামরিক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল - রোবায়েত ফেরদৌস ১২
- বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিক দেশ হতো, পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া হতো না - সোহরাব হাসান ১৩
- চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কেবল সমস্বরে চিৎকার নয়, প্রয়োজন দুর্বার আন্দোলন - নাজমুল হক প্রধান ১৪
- ‘অপারেশন উত্তরণ’ পরিস্থিতির উত্তরণ তো ঘটায়নি, বরং অবনমন ঘটিয়েছে - রাজেকুজ্জামান রতন ১৬
- অখণ্ড বাংলাদেশের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চাই - গোলাম মোর্তজা ১৭
- পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমস্যায় জর্জরিত রেখে দেশের উন্নতি ও অগ্রযাত্রা হতে পারে না - আবু সাইদ খান ২০
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিকীকরণের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সোচ্চার হতে হবে - রাশেদ খান মেনন ২২
- পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে - অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান ২৪
- বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে পাহাড়িদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়া হচ্ছে - সৌরভ শিকদার ২৬
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীকেই উদ্যোগী হতে হবে - ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ২৮
- কেবল আদিবাসীরাই অধিকার বঞ্চিত নয়, মুক্তিযুদ্ধের ধারা ও চেতনাও ভূলুণ্ঠিত - মুজাহেদুল ইসলাম সেলিম ২৯
- প্রশাসনের ভেতরে কিছু লোক আছেন যারা চুক্তি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছেন - নুরুর রহমান সেলিম ৩১
- যারা রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করেন, তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার - নুমান আহমেদ খান ৩২
- পার্বত্য এলাকার ভূমি বেদখলে এজেন্সীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে - অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ৩৪
- পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটির উপর সব বাহিনীর নজর পড়েছে - অধ্যাপক ড. নুর মোহাম্মদ তালুকদার ৩৬
- নির্বাচনের আগেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করুন - এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ৩৮
- চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে বড় কারণ হচ্ছে সামরিক - বেসামরিক আমলাদের প্রভাব - শামসুল হুদা ৩৯
- সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ থেকে ক্রমাগতভাবে দূরে সরে গেছে - অধ্যাপক মেসবাহ কামাল ৪০
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন চাই - সৈয়দ আবুল মকসুদ ৪৪
- চিরন্তন সামরিক শাসন বহাল আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে - পঙ্কজ ভট্টাচার্য ৪৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন ৪৭

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন : রাজনৈতিক সমাধান বনাম সরকারের উন্নয়নের জোয়ার - মঙ্গল কুমার চাকমা ৫১

বিশেষ প্রতিবেদন:

- রাঙ্গামাটিতে একের পর এক মিথ্যা মামলা, ধরপাকড় ও হয়রানি ৫৬
- লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা: ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণে নেই কোন অগ্রগতি এবং দোষীদের বিচারেও অনিশ্চয়তা ৫৯
- বিলাইছড়িতে দুই মারমা বোনের শ্লীলতাহানি, ভিকটিম ও পিতা-মাতাকে আইন-বহির্ভূত অন্তরীণ ৬১

সংবাদ প্রবাহ:

- যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৬৬
- সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল ৬৬
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ৬৯
- সংগঠন সংবাদ ৭৯

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ নেই বললেই চলে। সম্প্রতি ১ জানুয়ারি ২০১৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে ১৯৯৭ সালে সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এমপিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাঁর এই নিয়োগকে অনেকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

এছাড়া গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি'কে নিয়োগ ও ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি আনোয়ার-উল হকের মেয়াদ আরো তিন বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে, যদিও এই নিয়োগ সরকারের ধারাবাহিক কার্যক্রমেরই অংশ বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের মেয়াদ বৃদ্ধির পর গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউসে কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় শাখা অফিস স্থাপন করা, জনবল নিয়োগ, তহবিল গঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি। আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিচিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে টাস্কফোর্সের কোন কার্যকর উদ্যোগ এখনো লক্ষ করা যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথা উঠলেই সরকারের তরফ থেকে গতানুগতিকভাবে চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কথা, সেই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়। পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ বা পরিকল্পনার কথা না বলে সরকার কেবল কোটি কোটি টাকার উন্নয়নের কথা বলে থাকেন, যা চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সামিল বলে বিবেচনা করা যায়। বস্তুত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা যথাযথ ও কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা না হলে কেবল উন্নয়ন কার্যক্রম দিয়ে কখনোই পার্বত্যাঞ্চলের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান হতে পারে না। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বশাসনের অধিকার, নিজের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণের অধিকার, বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশের অধিকার যদি না থাকে, বরঞ্চ জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের যাবতীয় কার্যক্রমসহ ফ্যাসীবাদী দমন-পীড়ন যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে উন্নয়নের জোয়ারে মানুষের উন্নয়ন না হয়ে বরং তারা অথৈ জলে ডুবে যাবে বা প্রবল জোয়ারে ভেসে যাবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। বস্তুত সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে আজকে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীকে সেই পরিণতির দিকে ধাবিত হতে হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কথা উঠলেই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ, বিশেষভাবে পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব, বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি, খুন-অপহরণ, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা ইত্যাদি তুলে ধরে থাকে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না করার একটি অজুহাত সৃষ্টি করা এবং বর্তমান সরকারের ৯ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় সরকারের উপর আপামর জনমানুষের চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্র বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। জনমানুষের এই অসন্তোষকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীনউদ্দেশ্যে সেনা-পুলিশ ও স্থানীয় আওয়ামীলীগের যোগসাজশে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কোন ঘটনা ঘটলেই সেই ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের জড়িত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, গ্রেফতার, ঘরবাড়ি তল্লাসী, ক্যাম্পে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে কোণঠাসা করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করা।

তারই অংশ হিসেবে গত নভেম্বর ২০১৭ থেকে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ এবং সেনা-পুলিশের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ গভীর রাতে তিন উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী অভিযান পরিচালনার নামে নিরীহ গ্রামবাসীদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ঘরবাড়ি তল্লাসী, মারধর ও গ্রেফতার করে চলেছে। উক্ত তিন উপজেলায় ১১২ জনের বিরুদ্ধে ৬টি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর থেকে এযাবৎ বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের একজন মেম্বারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ এবং ৩৬ জনকে মারপিট ও হয়রানি করা হয়। কমপক্ষে ১০৩টি ঘরাবাড়ি তল্লাসী ও এসব ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। এতে করে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আলোচনা সভা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি উপলক্ষে গত ২ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল ১০ টায় রাজধানীর ডেইলী স্টার ভবনের এ এস মাহমুদ সেমিনার হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় এবং ঐক্যন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। উক্ত আলোচনা সভায় যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা হলেন-

১. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, *সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি*
২. রোবায়েত ফেরদৌস, *অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
৩. সোহরাব হাসান, *কবি ও সাংবাদিক*
৪. নাজমুল হক প্রধান, *এমপি, সাধারণ সম্পাদক, জাসদ*
৫. রাজেকুজ্জামান রতন, *বাসদ নেতা*
৬. গোলাম মোর্তজা, *সাংবাদিক ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক*
৭. আবু সাইদ খান, *বিশিষ্ট সাংবাদিক*
৮. রাশেদ খান মেনন, *এমপি, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এবং মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়*
৯. অধ্যাপক ড. মিজানুর *রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন*
১০. সৌরভ শিকদার, *অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
১১. ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, *প্রতিষ্ঠাতা, গণস্বাস্থ্য*
১২. মুজাহেদুল ইসলাম সেলিম, *সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি*
১৩. নুরুর রহমান সেলিম, *প্রেসিডিয়াম সদস্য, গণতন্ত্রী পার্টি*
১৪. নুমান আহমেদ খান, *নির্বাহী পরিচালক*, আইইডি
১৫. অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, *ডীন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
১৬. অধ্যাপক ড. নুর মোহাম্মদ তালুকদার, *সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি*
১৭. এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, *সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ*
১৮. শামসুল হুদা, *নির্বাহী পরিচালক*, এএলআরডি
১৯. অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
২০. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও গবেষক*
২১. পঙ্কজ ভট্টাচার্য, *সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ ও আলোচনা সভার সভাপতি।*

উক্ত আলোচনা সভায় আলোচকদের বক্তব্য নিম্নে দেয়া গেল-

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি
আলোচনা সভা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে পাহাড়ে আগুন জ্বলবে

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আজকের আলোচনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আজ ২০তম বর্ষপূর্তি দিবস। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, এই দীর্ঘ সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি আজ এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে, যেখানে বলা যেতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এর সার্বিক অবস্থা আবারও নানা ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়ে অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়নি।

আপনারা জানেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বলতে আমরাও সাধারণভাবে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে, পার্বত্য অঞ্চলে ভিন্ন ভাষাভাষি চৌদ্দটি আদিবাসী জুম্ম জাতি আছে। এই জাতিসমূহের অস্তিত্ব সংরক্ষণ, তাদের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ, তাদের শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব আদায়করণ, রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ তথা পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জুম্ম জনগণের তাদের সামগ্রিক জীবনধারা নিয়ে যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়নি, হতে পারেনি তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়নি, হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের, যাদেরকে সরকারিভাবে উপজাতি বলা হয়, সেই উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হতে পারে নাই। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি, আদিবাসী জুম্ম জনগণ তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। বিগত ৪৬ বছর ধরে পার্বত্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ঘটে চলেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরকারি উদ্যোগে এবং বেসরকারিভাবে সেখানে হাজার হাজার মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সরকারিভাবে, সেখানকার যারা শাসনকর্তা যারা পার্বত্য অঞ্চলের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, সেই সেনা কর্তৃত্বের মাধ্যমে সেখানে ৫ লক্ষাধিক বহিরাগতদেরকে পুনর্বাসন দেয়া হয় এবং সেই পুনর্বাসন জুম্ম জনগণের ভিটেমাটির উপর, জমির উপর দেয়া হয়েছিল। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্য, তার উপজাতীয় অঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়নি, হতে পারছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সংগতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইনগুলোর সংশোধন করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য বহুবিধ আইন এখনও অসংশোধিত অবস্থায় রয়ে গেছে।

আমরা জানি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে সেখানে তিনটি পার্বত্য জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে এবং তার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে। এই আইনগুলো কিন্তু আজ অবধি কার্যকর হতে পারে নাই। এই আইনগুলো কার্যকর করতে গেলে পার্বত্য অঞ্চলে প্রযোজ্য বহুবিধ আইনের সংশোধনী আনতে হবে। কিন্তু বাস্তবে কোন সরকারই সেই আইনগুলো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে আমি উল্লেখ করতে চাই, ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন, ১৯২৭ সালের বন আইন, ইত্যাদি আইনগুলো পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে সংশোধন করা হয়নি। ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন তথা পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইন তথা আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করতে পারেনি। এগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে সরকার চুক্তির আগে প্রযোজ্য সব আইনগুলো কার্যকর করে চলেছে। যে কারণে আমরা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারি নাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয় নাই। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের যে বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেখানে স্বতন্ত্র একটা ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান করা হয় তাও কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে একটা ভোটার তালিকা করে নিতে হবে। সেই ভোটার তালিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলা

পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভবপর নয়। ফলে আজকে আমরা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে সেই নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদ হিসেবে এখনও প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নাই। প্রসঙ্গত বলবো, সরকারের কাছে এই ভোটার তালিকা বিধিমালা ও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন বিধিমালার খসড়া তৈরি করে জমা দিয়েছি, এগুলো প্রণয়নের জন্য বারে বারে সরকারকে লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে, বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার আজ অবধি কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ সারা দেশে যে ভোটার তালিকা আছে সেই ভোটার তালিকা দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের সর্বস্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষা, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয় নাই।

> ১৯৭২ সালে আমাদের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে দাবি দিয়েছেন, সেই দাবির ভিত্তিতে আমরা ৫ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলাম এবং সেই দাবির উপর ভিত্তি করে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আজকে এই চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে পাহাড়ে আগুন জ্বলবে। আগুন জ্বলছে। আমাদের বুকে যে যন্ত্রণা, যে আগুন, তা নিভবে না সহজে। আমরা হয় মরবো, না হয় মাথা উঁচু করে বাঁচবো। আমরা জীবিত অবস্থায় মৃতের মত থাকতে চাই না।

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, আপনারা অবশ্যই জানেন, এই বিষয়গুলো আমাদের পক্ষ থেকে বারে বারে তুলে ধরতে হয় এই কারণে যে, পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে, সেই পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে এই মুহূর্ত থেকে সরকারকে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত সেটা দেখি না। গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের জনগণের সাথে কথা বলেছেন, সেখানকার প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন মহলের সম্মুখে তিনি ভিডিও কনফারেন্স করেছিলেন। আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটা শুনে থাকবেন, দেখে থাকবেন। আমি শুধু এটুকুই বলবো, গতকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন সেখানে অনেক বিষয় ছিলো যেগুলো খুবই বিতর্কিত এবং আমরা মনে করি, সেখানে সত্যের যথেষ্ট অপলাপ করা হয়েছে।

যাহোক, আজকে আমি এখানে যে বিষয়টা তুলে ধরতে চাচ্ছি যে, এই যে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩৩টি বিষয় এবং আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী, সেগুলো আজ অবধি যথাযথভাবে হস্তান্তরিত হয়নি এবং মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা যদি সাধারণ প্রশাসনকে দেখি, সেখানে অপারেশন উত্তরণ-এর বদৌলতে যে সেনাবাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারাই সেখানে শাসক এবং তাদের সাথে যুক্ত আছে তিন জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং তার কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা পর্যায়ে নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যারা আছেন তারা। পুলিশ বাহিনীর একই অবস্থা, সেখানে পুলিশ সুপার আছেন। কিন্তু ডিসি সাহেব, পুলিশ সুপাররা সেই পার্বত্য অঞ্চলে নিযুক্ত সেনা কর্তৃত্বের সাথে সহযোগিতায় ঐ পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিচালনা করে থাকেন।

আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় এই দিবস উদযাপিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা আজকেই সকালে খবর পেয়েছি, সেখানে কোন কোন জায়গায় সেনাবাহিনীও এই দিবস উদযাপন করছেন এবং তাদের অনুষ্ঠানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে যেতে বাধ্য করাচ্ছেন। অথচ অন্যদিকে সেখানে যারা সাধারণ মানুষ এবং আমাদের জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ওখানে এই দিবস উদযাপিত হতে চলেছে, সেখানে যাতে সাধারণ মানুষ, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ না করে থাকে সেধরনের একটা নেতিবাচক বাস্তবতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে যদি আমরা দেখি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব-ক্ষমতার অধিকারী হলো আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে হচ্ছে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ। কার্যত আমরা দেখি সেখানে তিনটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান-সদস্য ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়ন করতে পারেন না, সেই অনুযায়ী তারা দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন না। সেখানে মূল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেখানকার নিযুক্ত সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী এবং তাদের সাথে যুক্ত পুলিশ বাহিনী এবং ডেপুটি কমিশনার এবং তার কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। সেখানকার সাধারণ প্রশাসনে যদি আমরা দেখি, ঐ অঞ্চল একটি বিশেষ শাসিত এলাকা হিসেবে যেটাকে আমরা চুক্তির মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করেছি, সেই বিশেষ শাসিত এলাকা আজ অবধি বাস্তবায়িত হতে পারে নাই। পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশের একটা উপনিবেশ হিসেবে আজকে সেখানে শাসনব্যবস্থা চলছে। এখানে চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি সাহেব আছেন, তিনি হচ্ছেন মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত শাসক, তারই অধীনে সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিগেড আছে, জোন আছে এবং সাব-জোন আছে এবং সেই এলাকার সিভিল প্রশাসন, পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য

গণপ্রতিনিধিত্বশীল সব প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরই নির্দেশে, আদেশে এবং পরামর্শে, তাদেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে, সেই এলাকার শাসন শাসিত হচ্ছে। আজকে সেখানকার যাকিছু উন্নয়ন সবকিছু তাদেরই নিয়ন্ত্রণে।

প্রসঙ্গত আমি বলবো, পর্যটন বিষয়টা। পর্যটন বিষয়টা পার্বত্য জেলা পরিষদের একটি বিষয়, এই বিষয়টি হস্তান্তরে সরকারের সাথে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নামমাত্র একটা চুক্তি করা হয়েছে। সেই চুক্তিতে যা কিছু বলা আছে, যে কেউ যদি চুক্তিটা পড়ে দেখেন, তাহলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে ঐ চুক্তিতে একটা শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। বলা হচ্ছে, এটা পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। গতকালও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যটন বিষয়টি হস্তান্তরিত হয়েছে বলে নিজেই উল্লেখ করেছিলেন। কার্যত এটা হস্তান্তর হয় নাই। বরঞ্চ পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতাকে এই চুক্তির মধ্য দিয়ে হরণ করা হয়েছে। পর্যটন কর্পোরেশনকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেখানে সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পর্যটন পরিচালনা ও নিরাপত্তা দেখাশুনার জন্য, অন্যদিকে পর্যটন মন্ত্রণালয়ও কেন্দ্রীয়ভাবে সেখানে পর্যটন করবেন। পার্বত্য জেলা পরিষদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার যতটুকু সামর্থ আছে সে অনুযায়ী জেলা পরিষদ পর্যটন পরিচালনা করার। তাহলে এই যে প্রতারণামূলক বাস্তবতা, এই বাস্তবতা আমাদের বুঝতে হবে, জানতে হবে।

এখানে সরকারিভাবে বলা হচ্ছে যে, ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। আসলে এটা শুভঙ্করের ফাঁকি। জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে বই আকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে আমরা প্রতিটি ধারা কতটুকু কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে সেটা উল্লেখ করেছি এবং এটা কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যেতে পারে না।

যাহোক, আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এখানে উন্নয়নের নামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হয়, বলা হয়ে থাকে মেডিকেল কলেজের কথা। আজকে যে অঞ্চলে প্রাইমারী শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা যথাযথভাবে চলে না, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমরা কী করবো? আজকে আমাদের সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন কয় জন আছে আমাদের ঘরে ঘরে। আজকে এমনিতর অবস্থায় এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পেছনে সরকারের একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে বিবেচনা করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশে একটা রাজনৈতিক কেন্দ্র। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়াশোনা করবেন? সেখানে কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ বাইরের বাংলা ভাষাভাষিরা ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করবেন। তাহলে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে রাজনীতি চলবে এবং সেখানে বিভিন্ন দলের পক্ষ হয়ে ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন। তার মানে হচ্ছে, দূর বা অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী একটা বিরূপ রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্ম দেবে। সরকার বলতে চাচ্ছে যে, জুম্ম জনগণকে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সেটা না। পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষাকে ভরাডুবি করার জন্য এবং শিক্ষার দোহাই দিয়ে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের জন্য আজকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কমপ্লেক্স এখনও হয় নাই। আজকে সেখানে সরাসরিভাবে সরকার কর্তৃক তহবিল গঠন করে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ ১৭/১৮ বছর ধরে আঞ্চলিক পরিষদের ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর করার জন্য, তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য যে অবকাঠামো সেগুলো অবহেলিত অবস্থায় আছে। আজকে ক'জন জানে যে, এই আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজ ভাড়া করে দীর্ঘ ১৭/১৮ বছর ধরে অফিস করছে। ঐ উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজের যে ডাইনিং হল সেই ডাইনিং হল হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদের কনফারেন্স হল। আজকে এই যে বাস্তবতা, আমাদের দেশের নাগরিক সমাজ, শিক্ষিত সমাজ, যারা নেতৃত্ব দেন বিভিন্ন দলে থেকে, বিভিন্ন সংগঠনে থেকে, এই বাস্তবতা কতজনে জানতে পারেন? আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য অঞ্চলের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, অথচ সেটা আজ একটা ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিসের মত করে রাখা হয়েছে। আজকে এই হচ্ছে বাস্তবতা।

যাহোক, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর হয় নাই। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কর্মচারী বিধিমালা পর্যন্ত এখনও সরকার প্রণয়ন করে নাই। এখানে যে প্রবিধানমালা আমরা করেছিলাম সেই প্রবিধানমালা সরকার অনুমোদন দেয় নাই। যদিও আইনে বলা আছে যে আঞ্চলিক পরিষদ তার অর্পিত বিষয়বস্তুর উপর প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু সরকার বলছে যে, আঞ্চলিক পরিষদ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে না এবং পারবে না। আঞ্চলিক পরিষদের প্রবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও সরকার আজকে জেনেশুনে বিরোধিতা করছে যে আঞ্চলিক পরিষদ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে না। এভাবেই আজকে আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর হয় নাই। একটা ঠুঁটো জগন্নাথের মত আজকে আঞ্চলিক পরিষদকে রাখা হয়েছে সেখানে। ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দারের মত আজকে আঞ্চলিক পরিষদ দাঁড়িয়ে আছে। সারা বিশ্ব জানে, একটা আঞ্চলিক পরিষদ আছে, সেখানে চেয়ারম্যান-সদস্য আছেন, কিন্তু বাস্তবে এই আঞ্চলিক পরিষদের কোন কার্যকর ক্ষমতা নেই। সেখানে ডিসি সাহেব কেন, পার্বত্য অঞ্চলের একজন পুলিশ কনস্টেবল, সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান। আজকে সেই বাস্তবতায় আঞ্চলিক পরিষদ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে সেটেলার বাঙালি, অস্থানীয় ব্যক্তি ও কোম্পানী, সেনাবাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূমি বেদখল বন্ধ হয়নি এবং বেদখলের ফলে উদ্ভূত পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল অব্যাহতভাবে চলছে। হাজার হাজার, লক্ষ

লক্ষ একর জমি আজকে বেদখলে চলে গেছে। সেটেলার বাঙালি, অস্থানীয় ব্যক্তি, কোম্পানীরা, ধনী ব্যক্তিরা ওখানে জমি নানাভাবে লীজের নামে বেদখল করেছেন। পর্যটনের নামে সেনাবাহিনী সেখানে জোর করে জমি দখল করছেন। যেমন সাজেক এলাকায় যে রিসোর্টটা আছে, পাকা বিল্ডিং রয়েছে সেসব করেছে সেনাবাহিনী। আরেক জনের জমি দখল করে সেখানে সেনাবাহিনী রিসোর্ট করেছে। প্রতিদিন সাজেক এলাকায় শত শত গাড়ি আসা-যাওয়া করে। আমরা বুঝি না, সাজেক এলাকায় এমন কী দেখার আছে! জমি বেদখল করে কিছু আয়ের জন্য, কিছু পাওয়ার জন্য, কিছু মুনাফার জন্য আজকে সেখানে যে বাস্তবতা বিরাজ করছে, যার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ আজকে তাদের ভিটেছাড়া, তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার উপর আকাশ নেই। আজকে আলো-বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে পার্বত্য অঞ্চলে। আজকে ভূমি বেদখলের কারণে যে ভূমি বিরোধ দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো এখনো নিষ্পত্তি হতে পারছে না। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধিত হয়েছে দীর্ঘ বছর পরে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত এই সরকার একটি মাত্র ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে, আর চুক্তি বাস্তবায়নের কোন ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখে নাই। যে ভূমিকাগুলো রেখেছিল সেগুলো হচ্ছে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা। আজকে যে কাজটা করেছে সেটা হলো ২০০১ সালে যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণীত হয়েছিল সেই আইনে অনেকগুলো চুক্তির বিরোধাত্মক ধারা ছিল, সেগুলো সংশোধনের জন্য আমরা সরকারের কাছে বারে বারে তুলেছিলাম এবং এক পর্যায়ে গিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর পর ২০১৬ সালে সেই বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধিত করা হয়েছে। এই কাজটি ছাড়া বর্তমান সরকার ২০০৯ হতে ২০১৭ সালের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়নের কোন ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

আজকে ভূমি কমিশনও সেখানেই আটকে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনকে যদি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ভূমিকায় যেতে হয় তাহলে ভূমি কমিশনের একটা বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ভূমি কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বিধিমালার একটা খসড়া সরকারের কাছে দিয়ে দিয়েছে। সেই খসড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ও আইন মন্ত্রণালয়ে চলে গেছে। কিন্তু এই বিধিমালা সরকার প্রণয়ন করবে কি করবে না সেটা আজ অবধি আমাদের জানা নেই। আজকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি কমিশন গঠিত হলেও কিন্তু এই বিধিমালা যেহেতু প্রণীত হয় নাই, সুতরাং ভূমি কমিশন তার বিচারিক কাজ শুরু করতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখনও পর্যন্ত এই ভূমি কমিশনের শাখা অফিস রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে করা হয় নাই। ভূমি কমিশনের প্রধান অফিস খাগড়াছড়িতে। সুতরাং অন্য দুই জেলায় দুইটি শাখা অফিস করার সিদ্ধান্ত আছে।

তার পাশাপাশি আজকে বলা যেতে পারে, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে ভূমি কমিশন, সেই ভূমি কমিশনের তহবিল হচ্ছে একটা নামমাত্র তহবিল। ভূমি কমিশনের যদি একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ভূমি কমিশনের সদস্যদেরকে যে এক বেলা আপ্যায়ন করার মত কোন তহবিল সেখানে নেই। আসা-যাওয়ার জন্য কোন ভাতা প্রদান করার মত টাকা নেই। ভূমি কমিশনের কার্যালয়ে যদিও ভূমি কমিশনের বিভিন্ন স্তরের অনেকগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের কথা রয়েছে, বর্তমানে সেখানে আছেন শুধু একজন রেজিস্ট্রার। একজন সচিব ছিলেন, উনাকে বদলি করে নেয়া হয়েছে। আর দুই/তিন জন অফিস সহকারী আছেন, একজন কম্পিউটার অপারেটর আছেন, তাদেরকে ধার করে আনা হয়েছে খাগড়াছড়ির জজ কোর্ট থেকে। তাহলে আজকে এই হল ভূমি কমিশনের বাস্তবতা। অনেকে বলে থাকেন, যদি সন্তু লারমা বা আঞ্চলিক পরিষদ সহযোগিতা দেয় তাহলে ভূমি কমিশনের কাজ চলতে পারে। এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। আঞ্চলিক পরিষদ সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এখানে যদি-টদির কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। এই বাস্তবতা তুলে না ধরে, সরকার কেন তহবিল দেয় না, সরকার কেন কর্মচারী-কর্মকর্তা নিয়োগ দেয় না, সরকার কেন শাখা অফিস করে না, কারণটা কী? কারণ হচ্ছে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে চায় না। সরকারের সদিচ্ছা নাই। সরকারের আন্তরিকতা নাই। সরকার পুরোপুরিভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে চলেছে।

সুতরাং আজকে যদি বলা হয় যে, এখানে জনসংহতি সমিতি এগিয়ে আসছে না, সহযোগিতা দেয় না, আঞ্চলিক পরিষদ সহযোগিতা দেয় না, গতকালও শুনলাম ভিডিও কনফারেন্সে, যদি আঞ্চলিক পরিষদ সহযোগিতা দেয় তাহলে কাজগুলো এগিয়ে যাবে। এখানে আঞ্চলিক পরিষদ কোনটা দেয় নাই? অথচ আঞ্চলিক পরিষদকে আজকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের নিজস্ব বলতে কিছুই আমরা দাবি করতে পারি না। আজকে সেই বাস্তবতায় যদি বলা হয় সরকারের পক্ষ থেকে যে, আঞ্চলিক পরিষদ যদি সহযোগিতা দেয় তাহলে সরকার এগিয়ে যেতে পারে। এটা বাস্তব ভিত্তিক কথা নয়, এটা একটা কথার কথা। নিজের দুর্বলতাকে, নিজের অজ্ঞতাকে বা নিজের অসামর্থ্যতাকে, নিজের অসদিচ্ছাকে আড়াল করার জন্য একথাগুলো বলা হচ্ছে।

আজকে চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে অপারেশন উত্তরণসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ সেনাশাসনের অবসান হয় নাই। চুক্তি স্বাক্ষরের পর দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সেখানে সেনাশাসন, তারও আগে বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাশাসন অব্যাহত রয়েছে। ছেচল্লিশ বছর ধরে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাশাসন – এ কথা বাংলাদেশের কতজন ব্যক্তি জানেন, কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি বিষয়টা জানেন, কতজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে জানেন? এই চুক্তি একটা জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধানের জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং সরকার বলেছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটা জাতীয় এবং রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান করতে গেলে জাতীয়ভাবে

এবং রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। সে লক্ষ্যে ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আলোচনা, বক্তব্য, মতবিনিময় করতে করতে দীর্ঘ বছর পরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজকে সেই চুক্তি অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং এমন অবস্থায় পড়ে আছে, আজকে মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। আজকে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি এই চুক্তিটা ভুলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে যাতে পার্বত্য অঞ্চল সেই পার্বত্য অঞ্চল থাকুক যে পার্বত্য অঞ্চল পাকিস্তান আমলে উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হয়েছিল। যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মলাভ করেছে সেই বাংলাদেশের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এই এক দশমাংশ ভূখন্ড, যেখানে বহু ভাষাভাষি মানুষ বসবাস করে, আজকে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও সেটা উপনিবেশ হিসেবে শাসন করে আসছে। শুধু শাসন না, সেখানে শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার, অবিচার, কোনটি নেই সেখানে? সেখানে দিন-দুপুরে ওখানকার কর্তৃপক্ষ যদি কাউকে হত্যা করে সেটার কোন মামলা হয় না। সেখানে কিছু করার নাই। ওখানে জীবনের কোন মূল্য নেই। যারা আমরা পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসী বসবাস করি, তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই।

আজকে ওখানে অপারেশন উত্তরণ নামক একটা সেনাশাসন আছে। ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল সেসময়ে অপারেশন দাবানল নামে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাশাসন জারি করা হয়। তিনি বলেছিলেন যে, অপারেশন দাবানল আর এখানে থাকবে না, তার পরিবর্তে আসছে অপারেশন উত্তরণ। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, অপারেশন উত্তরণের অর্থটা কী? এটা কেন দেওয়া হচ্ছে? চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, কেন সেখানে আবার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি? তিনি সেটার যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নাই। সেটার উত্তর দেওয়া তার পক্ষে ছিল খুব কঠিন। কারণ হচ্ছে, এই অপারেশন উত্তরণের মধ্য দিয়ে সেখানে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় থাকবে, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর পার্বত্য অঞ্চল চলতে থাকবে। আজকে সেভাবেই চলছে। আজকে পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিদিন, কোন না কোন এলাকায় এই সেনাশাসনের কারণে সেখানকার মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, এমন কোন অমানবিক ঘটনা নেই যা সেখানে ঘটছে না। সেখানে মানুষের কোন মূল্যই নেই।

আজকে আমি সন্তু লারমা এখানে আছি, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি না যে, আমি এই মুহূর্তে ভাল, পর মুহূর্তে আমার কী হবে আমি জানি না। আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটতে পারে, আমাকে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘ কারাগারে নিক্ষেপ হতে পারে, আমাকে গুলি করে হত্যা করা হতে পারে, আমাকে মারধর করে, শারীরিকভাবে নির্দয় নির্যাতন করে আমাকে পঙ্গু করা হতে পারে, ঠিক সেভাবে পার্বত্য অঞ্চলে আমরা পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী বাসিন্দারা বসবাস করছি, বিশেষ করে পাহাড়িদের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। সেই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমি আজকে চুক্তির বিশ বছরের পূর্তি উপলক্ষে এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, যাঁরা বাংলাদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে একেকজন প্রতিষ্ঠিত এবং দেশে যাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের সামনে, আমরা যারা পার্বত্য অঞ্চলে নিপীড়িত নির্যাতিত, প্রতিদিন দমন-পীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছি, আমরা এভাবে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুরা স্ব স্ব জায়গা-জমি ফিরে পায়নি এবং তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় নাই। সরকার চুক্তি করেছিল যে, ভারত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদেরকে চুক্তি অনুযায়ী পুনর্বাসন দেওয়া হবে, তাদের বসতভিটা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাদের বসতভিটার অধিকাংশ জায়গায় সেটেলার বাঙালিরা এখনো বসবাস করছে। সে বিষয়ে সরকার কিছুই করে নাই। চুক্তি অনুযায়ী টাস্ক ফোর্স একটা আছে, কিন্তু টাস্ক ফোর্সের কোন কার্যক্রম আমি দেখি না। সেখানে কোন তহবিল নাই, টাস্ক ফোর্সকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন, তার পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের অশান্ত পরিস্থিতির কারণে আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের পুনর্বাসনের ব্যাপারে কোন কিছু হয় নাই। এক পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাও হারিয়ে গেছে। ৯০ হাজার পরিবার আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হয়েছে মর্মে একটা প্রতিবেদন আছে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যত টাস্কফোর্স কিছু করতে পারে নাই। কারণ টাস্কফোর্সের হাতে সরকার কোন ক্ষমতাই দেয়নি। সেখানে পর্যাপ্ত তহবিল নাই, সেখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব, অনেক কিছুর অভাব রয়ে গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের যে ব্যবস্থা সেটাও বাস্তবায়িত হয় নাই। পাহাড়িদের জন্য কোটা ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় সেই কোটাও বাঙালিদের হাতে চলে যাচ্ছে। এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ডিসি সাহেবদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তারাও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিতে পারে। আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক এনে চাকরি দেয়া হচ্ছে। ডিসি-এসপি সাহেবদের, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, ও সেনা কম্যান্ডারদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে, বহিরাগতদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে এবং তার বদৌলতে তারা পার্বত্য অঞ্চলে চাকরি নিয়ে নিচ্ছে। কিছু দিন আগেও ডেন্টালে ভর্তি প্রক্রিয়ায় কয়েকজন বাঙালি ছাত্র, বাংলা ভাষাভাষি ছাত্র পাহাড়িদের কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এটা মাত্র কয়েক দিন আগের কথা। এই বিষয়টা সরকারের কাছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে অবশ্য আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আমরা জানি না, সে ব্যাপারে তারা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরিতে, ডিসি-এসপি অফিসের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, সেখানে বাইরের বাংলা ভাষাভাষী চাকরিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখতে পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদেরকে, পাহাড়িদেরকে বঞ্চিত রেখে, তাদের ন্যায্য অধিকারকে হরণ করে বহিরাগতদেরকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন কর

া হয় নাই। আপনারা অনেকেই জানেন, অনেকেই হয়ত নাও জানতে পারেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে দুই ভাগে, একটা ছিল লিখিত চুক্তি, আরেকটা ছিল অলিখিত চুক্তি। অলিখিত চুক্তির মধ্যে আছে যে, ওখানে জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে যে কমপক্ষে ৫ লক্ষ বহিরাগত বাংলা ভাষাভাষিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে সম্মানজনকভাবে পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন তো হয়ইনি, বরঞ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অব্যাহতভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে।

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, আমি আমার বক্তব্য আর বাড়াচ্ছি না। আমি শুধু আজকের আলোচনার সূত্রপাত করে দিচ্ছি এবং সেই সূত্রে আঞ্চলিক পরিষদসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে আমি কিছু কথা, বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আজকে এখানে আপনারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এই প্রসঙ্গে আমি আরো যে কথাটা বলে বক্তব্য শেষ করতে যাচ্ছি সেটা হলো যে, পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও উদ্বেগজনক। এই অবস্থায় পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ, পাহাড়ি জনগণ আজকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তাহীন, অনিশ্চিত এক অন্ধকার বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী হবে, কী না হবে, আমরা কেউ কিছু বলতে পারি না। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষেরা এদেশের নাগরিক, তারা সম্মান নিয়ে, সমঅধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। বাংলাদেশের সংবিধানে আমাদের পরিচিতি লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে যারা বাস করেন, তারা সবাই বাঙালি। কিন্তু আমি, আমরা বাঙালি নই। আমাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচিতি আছে। আমাদের সংস্কৃতি আলাদা আলাদা। আজকে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে আমাদেরকে মুছে দেওয়া হয়েছে। আজকে শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নয়, গোটা বাংলাদেশে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলাসহ সকল ক্ষেত্রে আমাদের আদিবাসীদেরকে মুছে দেওয়া হয়েছে।

আজকে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। অস্তিত্বহীন, ঠিকানা বিহীন এই জনগোষ্ঠীরা আমরা কোথায় যাবো? কী অবস্থায় থাকবো? আজকে পৃথিবী ছোট হয়েছে। আজকে সমস্ত আকাশ, সমস্ত জলরাশি, সমস্ত ভূমি, সব ভাগ ভাগ হয়ে গেছে। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যারা আমরা কোথায় যাবো? আমাদের ঠিকানা কোথায়? কোথায় গিয়ে আমরা আশ্রয় নেবো? সেই ১৯৮৫ থেকে আমরা দেখেছি তখনকার সেনাবাহিনীর অত্যাচার-অবিচারের কারণে, সেটেলারদের অবিচার-অত্যাচারের ফলে হাজার হাজার জুম্ম ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। আজকে আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? আমরা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছি, এখানে রাখঢাক করে কিছু বলার দরকার নেই, আমরা যা বলি বরাবরই খোলামেলা বলি, আজকেও আমি সেটাই বলে যাচ্ছি, বলতে চাচ্ছি। আজকে দেশে যে সরকার বর্তমানে আছে, এই সরকারের আমলেই ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি স্বয়ং অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য আর আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্যের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। আমরা এখানে বঞ্চনা, প্রতারণা, দমন-পীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, সবকিছু খুঁজে পাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে, প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে যারা আজকে নীতি-নির্ধারক, যারা আজকে দেশ পরিচালনা করছেন, তাদের বক্তব্যেও আমরা সেটা দেখি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পাহাড়ের জন্য গঠিত। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জন্য এই মন্ত্রণালয় হলেও– এই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সাথে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে প্রতারণা করে চলেছে প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত। তারা সেই কাজটাই করে চলেছে।

এই অবস্থায় আজকে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের পক্ষে এই লড়াই-সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালিয়ে আসছে। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমরা অনেক লড়াই-সংগ্রাম করেছি এবং দীর্ঘ ২০ বছর ধরে এই পর্যায়ে এসে আমাদেরকে আবারও বলতে হচ্ছে– গত ২০১৫-১৬ সালের যে বাস্তবতা ২০১৭ সালে এসে সেই বাস্তবতা ভিন্নরূপ হয়ে গেছে। সেই কারণে আজকে পার্বত্য অঞ্চলের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য অঞ্চলে আমরা যারা আছি আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। পেছনে যাওয়ার আমাদের আর কোন অবকাশ নেই, এক ইঞ্চি জায়গাও এখানে নেই। আজকে যদি কিছু করতে হয়, সামনে এগিয়ে তা করতে হবে।

আজকে আমরা কী করবো? আমরা কি সরকার যা চায়, এদেশের সরকার-শাসনগোষ্ঠী যা চায় সেটাই মেনে নেবো? যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে আমাদেরকে কী হতে হবে? আজকে গোটা বাংলাদেশে ইসলামীকরণের যে বাস্তবতা বিরাজমান, তাতে আমরা মনে করি, আজকে যদি সরকার যা করছে সেটা যদি আমরা নীরবে-নিভৃতে মেনে নিই তাহলে আমাদের এই পাহাড়িদের, পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের শুধু না, গোটা বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজ, বিভিন্ন জাতি, সেই সাথে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পরিণতি হবে সর্বস্বান্ত হওয়া। আজ হোক কাল হোক আমাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান হিসেবে পরিচিতি দিতে হবে– এটাই বাস্তবতা। সেই বাস্তবতা আমরা মানতে পারি না, পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ আমরা মানি না, কোন অবস্থাতেই মানবো না। সেটা মানি নাই বলে আমরা দীর্ঘ বছর ধরে লড়াই করছি, ব্রিটিশ আমলেও আমরা লড়াই করেছি। মোগল আমলেও আমাদের পূর্ব পুরুষেরা মোগলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আজকে এই সময়ে এসে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আমলেও আজকে আমাদের লড়াই-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আজকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ইসলামী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

এদেশের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এই সংবিধানকে খণ্ডিত করে আমাদের দাবি, আমাদের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে আমাদের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে বক্তব্য দিয়েছেন, যে দাবি দিয়েছেন, সেই দাবির ভিত্তিতে আমরা ৫ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলাম এবং সেই দাবির উপর ভিত্তি করে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। আজকে এই চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয়, তাহলে পাহাড়ে আগুন জ্বলবে। আগুন জ্বলছে। আমাদের বুকে যে যন্ত্রণা, যে আগুন, তা নিভবে না সহজে। আমরা

হয় মরবো, না হয় মাথা উঁচু করে বাঁচবো। আমরা জীবিত অবস্থায় মৃতের মত থাকতে চাই না।

আজকে এই আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সরকার-শাসকগোষ্ঠী প্রত্যেকের কাছে আমি জুম্ম জনগণের পক্ষে এই অনুভুতি খোলামেলাভাবে, অন্তরের মধ্যে কিছু না রেখে, তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে জুম্ম জনগণ আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। দীপঙ্কর তালুকদারের মত, বীর বাহাদুরের মত দালালদের কথা আমি বলছি না। আমরা যারা সত্যিকার অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বাধিকার-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাদের কথাই আমি বলতে চাচ্ছি। কিছু দালাল আছে পার্বত্য অঞ্চলে যারা ক্ষমতাসীন দলে দালালী করে নিজেদের স্বার্থ পূরণ করে, তারা সত্যের অপলাপ করে, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। সেই দীপঙ্কর বাবুদের, সেই বীর বাহাদুর বাবুদের, সেই ক্যশৈহ্লাদের, অন্যান্য যারা জুম্ম আওয়ামীলীগ আছে তাদের কথা আমি বলছি না। সত্যিকারের যারা নিপীড়িত, নির্যাতিত, পদদলিত, শোষণ-বঞ্চনার প্রতিদিন মুখোমুখী, সেই জুম্ম জনগণের কথাই আমি বলছি যে, আজকে তারা চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা ২৯ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করেছি। সেখানে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে, চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষে ২০১৬ সালে গৃহীত-ঘোষিত ১০ দফা ভিত্তিক কর্মসূচি, সেটা অব্যাহত থাকবে, চলতে থাকবে অসহযোগ আন্দোলন। তার বাইরেও এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী, জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য আমরা দৃঢ় থাকবো এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে সেটা ধীরে ধীরে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে ধাবিত হতে পারে, সংগঠিত করতে হতে পারে।

এখানে সর্বশেষ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, সেটা হলো– পার্বত্য অঞ্চলের আজকে যে বাস্তবতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে আমরা যে কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছি, এই কর্মসূচিতে আমরা যখন যাবো তখন দেখা যাবে সেই পার্বত্য অঞ্চলে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আমলা বাহিনী, সেটেলার বাহিনী, জুম্ম দালাল বাহিনী, সব বাহিনী সেই কর্মসূচি প্রতিরোধ করতে থাকবে। সেখানে যদি তারা অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে, তাহলে তখন কী দাঁড়াবে! তাহলে যে জুম্ম জনগণ, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাধিকার-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, নিজেদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সমমর্যাদা, সমঅধিকার নিয়ে মানুষের মত বেঁচে থাকতে চায়, তাতে তাহলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। সরকার যদি অস্ত্রভাষা প্রয়োগ করে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে একজন নিরস্ত্র ব্যক্তি সেই অস্ত্রভাষার উত্তর দিতে পারে না। তাকেও তার অস্ত্র ভাষা দিয়ে উত্তর দিতে হবে।

> পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে ঘোষিত কর্মসূচিতে আমরা যখন যাবো তখন দেখা যাবে সেই পার্বত্য অঞ্চলে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আমলা বাহিনী, সেটেলার বাহিনী, জুম্ম দালাল বাহিনী, সব বাহিনী সেই কর্মসূচি প্রতিরোধ করতে থাকবে। সেখানে যদি তারা অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করবে, তাহলে তখন কী দাঁড়াবে! তাহলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। সরকার যদি অস্ত্রভাষা প্রয়োগ করে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে একজন নিরস্ত্র ব্যক্তি সেই অস্ত্রভাষার উত্তর দিতে পারে না। তাকেও তার অস্ত্র ভাষা দিয়ে উত্তর দিতে হবে।

আমি সবশেষে, আজকে আলোচকবৃন্দদের, যারা সম্মানিত ব্যক্তি, আমাদের খুবই প্রিয়জন, আমাদের অত্যন্ত কাছের লোক, তাদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যাঁরা দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক দল ও সংগঠন আছে, তাদের কাছেও পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর একটা ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানাই। এদেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজের প্রতি আমি জুম্ম জনগণের পক্ষে জনসংহতি সমিতির মুখপাত্র হিসেবে আমি সেই আহ্বান রাখছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির লক্ষে আমরা মানুষের অধিকারের জন্য, পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী মানুষের অধিকারের জন্য আমরা দুই দশক ধরে সশস্ত্রভাবে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছিলাম, চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও আজকে দুই দশক ধরে আন্দোলনে রয়েছি, আজকে বিশ বছর অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখি পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি আমরা যারা স্থায়ী মানুষ রয়েছি, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম অধিকারটুকুও নেই।

সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে আমার এই সূচনা বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। আমি অনেক সময় নিয়ে নিলাম। ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম সামরিক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল

রোবায়েত ফেরদৌস
অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মাননীয় সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং মাননীয় আলোচকবৃন্দ। একজন বিপ্লবীর বক্তব্য আমরা শুনলাম। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনা– আশাকরি তরুণ প্রজন্মের যারা আছে তাদের মধ্যে সংক্রমিত হবে।

আমরা যেটা খোলা মন নিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, আপনারা জানেন যে, এই চুক্তি হওয়ার কথা ছিলো আসলে ৩০ শে নভেম্বর। এটিকে ডিসেম্বরে নেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, আমাদের বিজয়ের মাস। আমাদের যে বিজয় এবং দেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার মধ্যে কি আসলে আদিবাসীদের বিজয় অর্জিত হয়েছে কিনা– এই প্রশ্ন আজকে করতে হবে, যে আশা নিয়ে বিজয়ের মাসে ১৯৯৭ সালে চুক্তি হয়েছিল। তবে এটা খুব দুঃখজনক যে, বাঙালিরা একসময় পাকিস্তানি জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, এই বাঙালিরাই পাকিস্তানি ভাষাগত নিপীড়নের শিকার হয়েছিল এবং এই বাঙালিরাই পাকিস্তানি সামরিক নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। '৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বাঙালিরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে কিনা আদিবাসীদের উপর ভাষাগত নিপীড়ন চালাচ্ছে, জাতিগত নিপীড়ন চালাচ্ছে এবং সামরিক নিপীড়ন চালাচ্ছে। এটা আমরা বুঝবার চেষ্টা করি এক সময়কার নিপীড়িত জনগোষ্ঠী কীভাবে নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়– এটা একটা বড় সমাজবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন আসলে।

আমরা যেটা বুঝতে চাই, যারা একসময়কার কলোনাইজ্‌ড, সেই কলোনাইজ্‌ডরা যখন ক্ষমতা পায় তারা কীভাবে কলোনাইজার হয়। আসলে এই যে কলোনিয়ালিজম, এই ঔপনিবেশিকতা, সন্তুদা বারবার বলেছেন 'উপনিবেশ', এই উপনিবেশিকতাকে তারা আত্মস্থ করে ফেলে। ফলে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যখন ক্ষমতার জায়গায় যায়, তারা কীভাবে নিপীড়কের ভূমিকায় যায়– এটা বোঝার জন্য এই কলোনি এবং কলোনিয়ালিজম– এই জিনিসটি বোঝা খুব দরকার। এর বড় উদাহরণ দেখবেন যে, যে ইহুদীরা হলোকাস্টের শিকার হয়েছিল, ৬০ লক্ষ ইহুদী মারা গিয়েছিলো হিটলারের সময়, সেই ইহুদীরা কিন্তু ফিলিস্তিনে ফিলিস্তিনী নারী এবং শিশুর উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। ইতিহাস খুবই নির্মম।

যে কথা বলা হয়েছে এবং গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম সামরিক ঘনবসতিপূর্ণ সিভিল মিলিটারি বসতি। বাংলাদেশের কোন জেলায় গড়ে দুটো করে ক্যান্টনমেন্ট নেই। একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি জেলায় দুটো করে ছয়টি ক্যান্টনমেন্ট এবং এর বাইরে অসংখ্য সেনা ছাউনি রয়েছে। পুরো বাংলাদেশকে আমরা একটা গণতান্ত্রিক সিভিল শাসনের মধ্যে আনবো আর পার্বত্য চট্টগ্রামকে সামরিক শাসনের মধ্যে রাখবো! আমরা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে না, কিন্তু আমরা অবশ্যই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে– এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। কাজেই ৭২ সাল থেকে সন্তু লারমা যেটা বলেছেন যে, সামরিক শাসন চলছে তার বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই কথা বলবো। যে ডেমোগ্রাফিক পলিটিক্স এখানে শুরু হয়েছে– '৪৭ সালে যেখানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ছিল ৯৮% ও বাঙালি ছিল ২%, এটি এখন ৫৫%-৪৫% হয়ে গেছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে, গতকালকে রাজাবাবু আমার প্রোগ্রামে বলেছেন যে, তারা কিন্তু আউট নাম্বার হয়ে যাবে। তার মানে বাঙালিরা সেখানে হয়ে যাবে মেজরিটি এবং আদিবাসীরা হয়ে যাবে মাইনরিটি।

এই যে ডেমোগ্রাফিক পলিটিক্স, তাহলে চিন্তা করেন– গোপালগঞ্জের লোককে যদি বগুড়ায়, বগুড়ার লোককে যদি গোপালগঞ্জে নিয়ে যায়, খালেদা জিয়া তার আসনে ফেল করবেন, শেখ হাসিনা তার আসনে ফেল করবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেইটাই হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্ত পৌরসভার নির্বাচিত মেয়ররা হচ্ছেন বাঙালি। আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি, যাদের জন্য শাসন সেই শাসন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ থাকছে না! সেকারণে তারা বাঙালি হয়ে যাচ্ছে এবং হেডম্যান-কার্বারী বাঙালি নিয়োগ পাচ্ছে, আপনারা কি জানেন? এরকম চললে চাকমা সার্কেলের চাকমা রাজা হয়ে যাবে একজন বাঙালি! সেই পলিটিক্স কিন্তু এখন সেখানে হচ্ছে।

সাদেকা আপা এখানে আছেন, একটি বিষয় এখানে আমি মনোযোগ আকর্ষণ করছি, সুলতানা আপা এটা বলেছেন, এভাবে চার লক্ষ/পাঁচ লক্ষ বাঙালি যেয়ে তাদেরকে মাইনরিটি করবে– এটা একটা ভীতি তৈরি করছে এবং সুলতানা আপা একটা নারীকে খুঁজে পেয়েছেন ভাইবোন ছড়াতে– চাকমাদের বা আদিবাসীদের সাধারণত বাচ্চা এত হয় না, কিন্তু উনাকে পেয়েছেন ৭টা বাচ্চা। কেন? এই যে একটা ভীতি কাজ করছে যে, বাঙালি জনগণের কারণে তারা মাইনরিটি হয়ে যাবে, তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেই চাপটা পড়ছে নারীর উপরে। নারী হচ্ছে যন্ত্র– তাকে বেবি

বানাতে হবে এবং তার প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। তাই এমন হাড় জিরজিরে একটা মহিলার ৭টি সন্তান! তাই, এই যে ডেমোগ্রাফিক পলিটিক্সের শিকার কীভাবে জেন্ডার পারস্পেকটিভ তৈরি করে এবং নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে– এটা আমাদেরকে ভাবতে হবে।

> আমরা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে না, কিন্তু আমরা অবশ্যই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে– এটি আমাদের মনে রাখতে হবে। কাজেই ৭২ সাল থেকে সন্তু লারমা যেটা বলেছেন যে, সামরিক শাসন চলছে তার বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই কথা বলবো। যে ডেমোগ্রাফিক পলিটিক্স এখানে শুরু হয়েছে– ’৪৭ সালে যেখানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ছিল ৯৮% ও বাঙালি ছিল ২%, এটি এখন ৫৫%-৪৫% হয়ে গেছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে, গতকালকে রাজাবাবু আমার প্রোগ্রামে বলেছেন যে, তারা কিন্তু আউট নাম্বার হয়ে যাবে। তার মানে বাঙালিরা সেখানে হয়ে যাবে মেজরিটি এবং আদিবাসীরা হয়ে যাবে মাইনরিটি।

অনেক বক্তা আছেন, আমি বেশি কথা বলবো না। দীপায়ন বলেছে মাত্র পাঁচ মিনিট। শেষ করি এভাবে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কালকে বলেছেন, নববিক্রম ত্রিপুরা যিনি বারবার বলেছেন, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তারা কী মনে করেন? রেজা ভাই কালকে পয়েন্ট আউট করেছেন, পাঁচ বছর থেকে বলছেন যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ৪৮টি থেকে ৪৯টি কেন হচ্ছে না? ৪৮-এ কেন আটকে থাকছে? এই প্রশ্ন আমাদেরকে করতে হবে। আর যাদের সঙ্গে চুক্তি বাস্তবায়ন তারা কী বলেন? তারা তো বলছেন যে, চুক্তির ২৫টি ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে। তাহলে যাদের সঙ্গে চুক্তি বাস্তবায়ন তারা যদি এটা মনে না করে, একতরফাভাবে সরকারের তরফ থেকে দাবি করলেই কিন্তু ব্যাপারটি আসলে সঠিক হবে না।

কাজেই আমি শেষ করবো এই বলে যে, আসলে বাংলাদেশ, এটি একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু ধর্মের, বহু সংস্কৃতির রাষ্ট্র। রাষ্ট্র পরিচালনার এই যে বহুত্ববাদী নীতি, এটি হচ্ছে আসলে প্লুরালিজম, বহুত্ববাদ–এটি হচ্ছে বিউটি অব ডেমোক্রেসি, এটি হচ্ছে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। এঙ্গেলস একবার বলেছেন, যখন ঔপনিবেশিক শাসন চলছে ভারতবর্ষে, ইংলন্ডের শ্রমিকদেরকে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলতে হবে, ভারতীয় জনগণ স্বাধীন না হলে ইংলন্ডের শ্রমিকরা স্বাধীন হবে না। কাজেই একইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদেরকে আদিবাসীদের এই যে স্বায়ত্তশাসন, তাদের অধিকারের পক্ষে কথা বলতে হবে। এই আদিবাসীরা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা যদি তাদের স্বায়ত্তশাসন, অধিকার না পায়, তাহলে বাঙালি, আপামর ১৬ কোটি বাঙালির মুক্তি কিন্তু সম্ভব নয়। যে কারণে একজন বাঙালি হয়ে আজকের এই আলোচনায় আমরা থাকি এবং এই নিপীড়িত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে সবসময় কথা বলি। আমাকে শোনবার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিক দেশ হতো, পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া হতো না

সোহরাব হাসান, কবি ও সাংবাদিক

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সুধীমণ্ডলী এবং আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ২০ বছর পূর্তির এই অনুষ্ঠানে যাঁরা এসেছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে, এখানে যাঁরা আছেন, যাঁরা চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন তাঁদের কেউ এখানে নেই। সুতরাং আমরা যাই বলি না কেন সেটি যাঁরা চুক্তি বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখেন তাঁদের কাছে পৌঁছুবে কিনা বা তাঁরা আমলে নিবেন কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতির বক্তব্যে মনে হতে পারে যে, এই নিপীড়ন, অবিচার, অন্যায় শুধু বোধ হয় পার্বত্য চট্টগ্রামেই আছে। বস্তুত পুরো বাংলাদেশেই এই নিপীড়ন, অন্যায়, অবিচার, শোষণ বহাল আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে হয়তো অনেকটা বেশি। কিন্তু সারা বাংলাদেশে আমরা যদি একটা গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, সত্যিকারভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ না

তৈরি করতে পারি পার্বত্য চট্টগ্রামে আলাদাভাবে সেখানে ন্যায়, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমাদের লড়াইটা কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক লড়াইকে একত্রিত করতে হবে।

> ”
>
> বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিক হতো তাহলে গোবিন্দগঞ্জের মত ঘটনা ঘটতো না। বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিক দেশ হতো তাহলে নাসিরনগরের, রামুর মত ঘটনা ঘটতো না। কিছুদিন আগেও পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়িদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে, বাড়ি-ঘর লুটপাট করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? সেখানে সাংসদরা গেছেন, কিছু লোক গেছেন, তারপর কী হয়েছে? তারা কি পুনর্বাসিত হয়েছেন? তাদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে? যারা লুটপাট করেছে তাদের কি বিচার করা হয়েছে? এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। যদি অন্যায়ের বিচার না হয়, তাহলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

চুক্তি কতভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে, কতভাগ হয়নি– এই বিতর্কে যেতে চাই না। যাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র-সরকার যাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তাদেরকে পক্ষ হিসেবে তাঁরা যদি মনে করেন চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি সেটি মেনে নিতে হবে। চুক্তির দুটি পক্ষ। একপক্ষ বলবেন যে, সবকিছু হয়ে গেছে; কিন্তু অন্যপক্ষের কথাও শুনতে হবে। যেটি তারা শুনতে, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল। সন্তু লারমার বক্তব্যে সেটি আছে। পুনরায় যাতে তাদের বাধ্য হতে না হয়, এরকম পরিস্থিতি পাহাড়ে তৈরি না হয়, তার আগে চুক্তির ধারাগুলো বাস্তবায়ন করুন, সেখানকার মৌলিক যে সমস্যা সে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে।

আর যেটি আছে ইসলামাইজেশন, বাঙালিয়াইজেশন– একটি অদ্ভুত সমাজে আমরা বাস করি! যখন আমরা সমতলে থাকি তখন সেখানে পরিচয় হয়ে যাই যে এখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্টের দেশ, সুতরাং মুসলমানিত্বই বড় হতে হবে। আবার যখন পাহাড়ে যাওয়া হয় যখন পার্বত্য বা অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী আছে দেখি, কিন্তু সংবিধানে আদিবাসী নেই, সুতরাং এই সংবিধান তো অগণতান্ত্রিক! এই অগণতান্ত্রিক সংবিধানের উপর, একটি বৈষম্যমূলক সংবিধানের উপর ভিত্তি করে কীভাবে আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবো, কীভাবে অন্য প্রান্তিক মানুষের দাবি-দাওয়া পূরণ করবো! যখন সেই পাহাড়ে বা অন্য আদিবাসী এলাকায় যাওয়া হয় তখন তারা সবাই বাঙালি হয়ে যায়। ১৯৯৭ সালে যখন এই চুক্তি হয় তখন ইসলামী দলগুলো রাস্তায় মিছিল করেছে যে, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, পার্বত্য চুক্তি রোধ করো। এই ধরনের অদ্ভুত মানসিকতা নিয়ে আমাদের এই সমাজ এবং সরকার। তাকে বেশির ভাগ সময় সেই অন্যায়কে, সেই আধিপত্যবাদকে, সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। কিন্তু তাতে শুধু পাহাড়ি মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে না, সেখানে চুক্তির আগের যে অবস্থা সেই অবস্থায় রয়ে গেছে। সেই ভয়ভীতি, সেই সেনা আধিপত্য, সেখানকার বাঙালি সেটেলারদের আধিপত্য, সেই বাঙালিদের অনুপ্রবেশ যদি চলতেই থাকে তাহলে চুক্তির সার্থকতা কী?

এ কারণে চুক্তির কোন ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে তা না, সেখানে এই যে শান্তির পরিবেশ তৈরি করা, অভয়ের পরিবেশ তৈরি করা, সেখানে বাঙালি-পাহাড়ি সবাই যাতে অনুভব করে যে, না এই দেশটি সবার, সেটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেটি পাহাড়ের জন্য যেমন সত্য, বাংলাদেশের অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলের জন্যও সত্য। বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিক হতো তাহলে গোবিন্দগঞ্জের মত ঘটনা ঘটতো না। বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিক দেশ হতো তাহলে নাসিরনগরের, রামুর মত ঘটনা ঘটতো না। কিছুদিন আগেও পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়িদের বাড়ি-ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে, বাড়ি-ঘর লুটপাট করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? সেখানে সাংসদরা গেছেন, কিছু লোক গেছেন, তারপর কী হয়েছে? তারা কি পুনর্বাসিত হয়েছেন? তাদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে? যারা লুটপাট করেছে তাদের কি বিচার করা হয়েছে? এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। যদি অন্যায়ের বিচার না হয়, তাহলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সুতরাং এই রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে হবে, এই সরকারকে বাধ্য করতে হবে যে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে হবে, ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সবার অধিকার মেনে নিতে হবে।

পার্বত্য চুক্তিতে সেটিই ছিল মূল শর্ত। সুতরাং চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে– এটি মুখে বললে হবে না। চুক্তির অপর পক্ষকে সমমর্যাদায়, সমঅধিকারে নিয়ে তারপর সেই চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলতে হবে এবং এখানে অসম আচরণ বা কোন কিছু চাপিয়ে দিলে চলবে না। মেনে নিতে হবে যে, এই দেশটি সবার। সেটি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, সবার দেশ, পাহাড়ি-বাঙালি সবার দেশ। যদি রাষ্ট্র এটা মেনে না নেয় তাহলে পাকিস্তানের পরিণতি হতে পারে। আমরা কেউ চাই না পাকিস্তানের পরিণতি হোক। তারপরও আমরা আশা করতে চাই, বিশ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনেক কিছুই পূরণ হয়নি, অর্থাৎ মৌলিক ধারাগুলোই পূরণ হয়নি, সেখানকার ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি– আশা করতে চাই, সেই সমস্যার সমাধান হবে। যদি সহজে না হয়, তাহলে বাধ্য করতে হবে এবং সে কারণে অবশ্যই এই সংগ্রামটি শুধু পাহাড়িদের একার সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রামটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী, মুক্তিকামী সকল মানুষের সংগ্রাম। তার সঙ্গে আমাদের সংহতি থাকবে, তার সঙ্গে তাদের লড়াইকে আমাদের লড়াইয়ে পরিণত করতে হবে। না হলে নিজেদের অপরাধবোধে ভুগতে হবে এবং আমরা সেই শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণের শরীক হবো। আমরা কেউ সেই শরীক হতে চাই না। ধন্যবাদ সকলকে।

চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কেবল সমস্বরে চিৎকার নয়, প্রয়োজন দুর্বার আন্দোলন

নাজমুল হক প্রধান এমপি, সাধারণ সম্পাদক, জাসদ

এখানে যাদেরকে দেখছি, আপনারা যারা আছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন জাতীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ যারা আছেন, সবাই আগে থেকে, শুরু থেকে আমরা পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম, সক্রিয় ছিলাম। হত্যাকাণ্ড হয়েছে, সেসময় আমরাও গিয়েছি। আমরা খুশি ছিলাম, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর যখন চুক্তিটা হয়, বোধ হয় সমস্যার একটা যৌক্তিক সমাধান হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ২০ বছর পর আমরা যখন উৎসব করবো তখন আমাদের পুনরায় ঐ আগের কথাগুলোই ব্যক্ত করতে হচ্ছে। আমি একটি কথাই সরকার প্রধানের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, জানি না আমার কথা পৌঁছাবে কিনা, আমাদের যখন জন্ম হয় নাই, বাপ-দাদারা একটা স্বপ্ন দেখেছিল। কী? মুসলমানরা গোলাপ ফুলের সমতুল্য, গোলাপ ফুলের বাগান হবে পাকিস্তান, বাকি সব ফুলগুলি ভাগো–গেন্ডা, জুই, চামেলি সব ভেগে যাও– শুধু মুসলমান থাকবে! মুসলমানদের মধ্যে আবার উচ্চ শ্রেণির–আশরাফ, তাদের ভাষা-সংস্কৃতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হলো। যার কারণে এখানটায় নতুন একটা চেতনা তৈরি হলো সেই সময়ে যে, আমরা একটা ফুলের বাগান চাই এবং একটা ফুলের বাগানে যেমন সব ফুল থাকে, ঠিক একটা দেশে সব ধর্ম-মতের মানুষ থাকবে, জনগোষ্ঠী থাকবে, সবাই মিলে একটা দেশ হবে। সেই সংগ্রামে আমরা জানি, আমাদের সবাইকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদেরকে কাউকে এটা শিখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, আমরা এখনটাই হঠাৎ করে হয়ে গেছি।

সেখানকার একটা জনগোষ্ঠীর উপর নির্মমতা আমরা দেখেছি। লোগাং হত্যাকাণ্ডের সময় আমরা গেছি। আমাদের উপরও আর্মিদের কড়া চেক। আমাদের গাড়ির উপর সেসময় দুটো বাচ্চা তুলে দেওয়া হয়েছে, আমরা কী আলাপ করি তা বের করার জন্য। আমাদেরকেও সন্দেহ করা হয়েছে। আমরা যারা এখানে কথা বলছি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে তাদেরকেও সন্দেহ করা হচ্ছে। আমি সরকার প্রধানের কাছে এইটুকুই বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে বাঙালিয়ানা না, ইসলামাইজেশন না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে সব ধর্মমতের মানুষ– একটা ফুলের বাগানে যেমন সব ফুল থাকে ঠিক সেভাবে একটা দেশে সব জনগোষ্ঠী তার স্বাধীন স্বকীয়তা নিয়ে বসবাস করবে। আমরা চাই, আমরা অবশ্যই চাই, জোর দিয়ে চাই, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর যে চুক্তি বাস্তবায়ন হয় নাই, সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সবাই মিলে কেবল সমস্বরে চিৎকার নয়, প্রয়োজনে যৌক্তিক কোন আন্দোলনের পথ তৈরি করতে পারলে, আমার বিশ্বাস, আমরা সবাই সেসময় থাকবো এবং এই দাবির বাস্তবায়ন হবে।

আমি আজকে এই ২০ বছর পূর্তিতে যারা এসেছেন, আমি মনেকরি এখান থেকে একটা কর্মপদ্ধতি ঠিক করা হোক, যাতে করে তার সূত্র ধরে এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য আমরা কথা বলতে পারি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে সব ধর্মমতের মানুষ– একটা ফুলের বাগানে যেমন সব ফুল থাকে ঠিক সেভাবে একটা দেশে সব জনগোষ্ঠী তার স্বাধীন স্বকীয়তা নিয়ে বসবাস করবে। আমরা অবশ্যই চাই, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর যে চুক্তি বাস্তবায়ন হয় নাই, সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সবাই মিলে কেবল সমস্বরে চিৎকার নয়, প্রয়োজনে যৌক্তিক কোন আন্দোলনের পথ তৈরি করতে পারলে, আমার বিশ্বাস, এই দাবির বাস্তবায়ন হবে।

‘অপারেশন উত্তরণ’ পরিস্থিতির উত্তরণ তো ঘটায়নি বরং অবনমন ঘটিয়েছে

রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ নেতা

আমি এই সমস্ত আলোচনা সভায় আসলে প্রথমত গায়ের রঙ এবং ভাষার জন্য কখনো কখনো নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। চেতনায় গণতান্ত্রিক হওয়ার সংগ্রাম করছি, অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছি, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এমন একটা গায়ের রঙ পেয়েছি এবং সামাজিকভাবে এমন একটা ভাষা পেয়েছি যখনই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সামনে দাঁড়াই তখন অপরাধী মনে হয় যে, শুধু এই গায়ের রঙ এবং ভাষা দিয়ে আমরা কি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচারটা চালিয়ে যাচ্ছি? সেই অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আজকে আপনাদের সামনে দু'একটা কথা বলতে চাই। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আয়োজিত এই আলোচনা সভার সভাপতি, উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এবং সুধীমণ্ডলী।

> একটা যদি বলি ‘ভূমি’, তাহলে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকারের বিষয়টা কী হবে? দুই ছিল ‘ভোট’, মানে স্থায়ী ভোটার কীভাবে চিহ্নিত হবেন? তিন হচ্ছে ‘ভাত’, মানে তাদের অর্থনৈতিক অধিকারটা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আর চতুর্থ ছিল ‘ভয়ের সংস্কৃতি’, মানে সেনাশাসন, এখান থেকে তারা কীভাবে মুক্তি পাবেন?

আমরা এখানে একটা ছবি দেখছি, সেখানে চুক্তি স্বাক্ষর করছেন যারা তাদের দুই জনের মধ্যে একজন এখানে আছেন। তাদের দুই জনেরই চুলের রঙ তখন কালো ছিলো। এই বিশ বছরে চুলের রঙ যেমন হারিয়েছে, বিশ্বাসের ভিত্তিটাও অনেকখানি হারিয়ে গেলো। আজকে দুই দশক পরে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিলো। আমরা কিন্তু আলোচনার মধ্যে একটা হাহাকার শুনছি এবং কখনো কখনো এখান থেকে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার একটা আতঙ্কও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা চারটা বিষয় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলাম, চারটাই ‘ভ’ দিয়ে লিখতে হয় বাংলা ভাষায়। একটা যদি বলি ‘ভূমি’, তাহলে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকারের বিষয়টা কী হবে? দুই ছিল ‘ভোট’, মানে স্থায়ী ভোটার কীভাবে চিহ্নিত হবেন? তিন হচ্ছে ‘ভাত’, মানে তাদের অর্থনৈতিক অধিকারটা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আর চতুর্থ ছিল ‘ভয়ের সংস্কৃতি’, মানে সেনাশাসন, এখান থেকে তারা কীভাবে মুক্তি পাবেন? এই চারটা ‘ভ’ এর বিষয় ছিলো এখানে। কিন্তু এই চারটার কোনকিছুই তো হয়নি, বরঞ্চ ‘অপারেশন উত্তরণ’ পরিস্থিতির উত্তরণ তো ঘটায়নি, বরং পরিস্থিতির অবনমন ঘটিয়ে দিয়েছে। একসময় আমরা শুনেছিলাম, আমাদের পূর্ব পুরুষরা বলেছিলেন যে, পাকিস্তানে নাকি ৯৮% ভাগ স্বায়ত্তশাসন হয়েছে। তাকে চ্যালেঞ্জ করে মাওলানা ভাসানী যেমন লড়াই করেছিলেন, আজকেও আপনারা লড়াই করছেন ‘চুক্তির ৪৮টি ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে’- এই ধরনের প্রতারণামূলক কথার বিরুদ্ধে।

একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছেন যে, একটা ভয়ের সংস্কৃতি গোটা দেশকে কীভাবে গ্রাস করেছে? একটা আস্থার ঘাটতি এবং ভয়ের বিস্তার কীভাবে দেশে হয়েছে? এখানে অনেকে আছেন অনেক কথা বলতে কিন্তু ভয় পাবেন। এই যে ভয়ের সংস্কৃতির মধ্যে কি গণতন্ত্র থাকে? আজকে পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠী যেমন একটা আতঙ্ক এবং চাপের মধ্যে আছেন, গোটা দেশ কি তা থেকে মুক্ত আছে? ফলে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছাড়া গোটা দেশের গণতান্ত্রিক অধিকারটাও কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এটাকে একসূত্রে গেঁথে ফেলতে হবে আমাদের। আমরা যেটা বলেছিলাম, আমাদের দল বাসদের পক্ষ থেকে, ১৯৯৭ সালে যখন পার্বত্য শান্তি চুক্তি বলে সরকার বলেছিলেন, আপনাদের খেয়াল আছে, আমরা একটা বই প্রকাশ করেছিলাম যে, ‘পার্বত্য শান্তি চুক্তি’ নয়, এটা ‘পার্বত্য চুক্তি’। আমরা বলেছিলাম, পার্বত্য জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে শাসকশ্রেণি কিন্তু এই চুক্তিটা করে নাই।

আমাদের এই ডিসেম্বর মাস কিন্তু একটা খুবই ট্র্যাজিক মাস। একদিকে এটা যেমন আমাদের উচ্ছাস-আনন্দের মাস, আরেকদিকে খুব ট্র্যাজিক। ১৬ ডিসেম্বর আমরা পরাজিত করেছিলাম পাকিস্তানিদেরকে, বিজয় অর্জন করেছিলাম, কিন্তু বিজয় আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম তারা এখন বিভিন্নভাবে ক্ষমতার বিভিন্ন শরিক হয়ে যাচ্ছে। এই ডিসেম্বর মাসের

৬ তারিখে আমরা এরশাদকে পরাজিত করেছিলাম। তাকে আমরা আবার ক্ষমতার অংশীদার হতে দেখেছি। এই ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখে আমরা একটা চুক্তি করেছিলাম, এখন আমরা দুই দশক পরে হাহাকার করছি– যা চুক্তি করেছিলাম তার কিছুই তো বাস্তবায়ন হলো না। ফলে এই ডিসেম্বর একদিকে আমাদের জয়ের মাস, আবার এই ডিসেম্বর একদিকে আমাদের হারানোর মাস।

সেই মাসে আমি শুধু এইটুকু বলে কথাটা শেষ করতে চাই, কোন একটা ঘটনা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটা নির্ভর করে আমাদের সরকার, রাষ্ট্র এবং আমরা জনগণ কতখানি গণতন্ত্রের চর্চা করছি। নাসিরনগরের ঘটনার পর প্রতিক্রিয়াটা কেমন ছিল? গোবিন্দগঞ্জের ঘটনার পর প্রতিক্রিয়াটা কেমন ছিল? কিংবা আজকে রংপুরের পাগলা পীরের ঘটনার পরে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াটা কেমন ছিল? এটা থেকে বোঝা যায় যে, কীভাবে তারা জনগণকে দেখে? ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নিপীড়নটা চলে, যে নির্যাতনটা চলে, মানুষের অসহায়ত্ব যেভাবে তৈরি হয়েছে তার বিপরীতে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিক্রিয়াটা কী– এ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্র কতখানি গণতান্ত্রিক আচরণ করতে চায় এখানে। ফলে এক্ষেত্রে আমরা মনে করি, আমাদের যারা বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে রাজনীতি করছি তাদেরও বিরাট একটা দায় আছে, পার্বত্য অঞ্চলের জনগণ এবং সমতলের জনগণ– দু'জনেরই অবস্থানের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে আমাদের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য না থাকে, সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের একত্রিতভাবে লড়াই করতে হবে। সেই লড়াইয়ে আমরা আমাদের দিক থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এবং আমি মনেকরি, লড়াইয়ের কোন বিকল্প নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন সমস্যাকে আমাদের গোটা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে আমাদের রাজপথে থাকবো–এইটুকু বলে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অখণ্ড বাংলাদেশের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চাই

গোলাম মোর্তজা, সাংবাদিক ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক

ধন্যবাদ সবাইকে, যারা এখানে উপস্থিত আছেন। ভূমিকা না দিয়ে সরাসরি কথা বলি। সময় কম। আরো অনেকের কথা আমরা শুনবো। যে আলোচনা হয়ে গেছে সে আলোচনাগুলোর দিকে না গিয়ে খুব সাধারণভাবে দু'একটি কথা বলতে চাই।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'– এই চুক্তির কোথাও কিন্তু 'শান্তি' শব্দটি নেই। কিন্তু পরিচিতি পেয়ে গেছে 'শান্তিচুক্তি' হিসেবে। 'শান্তিবাহিনী' পাহাড়িদের যে সশস্ত্র সংগঠন একসময় যারা অধিকারের দাবিতে যুদ্ধ করেছে, এই বাহিনীটির কখনোই কোন জায়গাতে নাম 'শান্তিবাহিনী' ছিল না। কিন্তু নাম হয়ে গেছে 'শান্তিবাহিনী'। অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেহেতু তারা কাজ করেছেন সেকারণে পরিচিতি পেয়েছেন 'শান্তিবাহিনী'। এই চুক্তিটিও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, কিন্তু 'শান্তিচুক্তি' হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেলো এটা খুবই আশাবাদের একটা কথা ছিলো যদি সত্যি সত্যি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো। কিন্তু সেটা হয়নি।

শুরুতেই আমি অভিনন্দন জানাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯৯৬ সালে যিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই প্রধানমন্ত্রীকে। সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী, সেই সময়ের আওয়ামীলীগের চরিত্রে, সেই সময়ের সরকারের চরিত্রে একটা গণতান্ত্রিক আবহ ছিলো, গণতান্ত্রিক আবরণ ছিলো। সেই সময়ের আওয়ামীলীগের ভেতরে একধরনের গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ছিলো। সেই কারণে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে অনেক শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা সাহসিকতার সঙ্গে চুক্তিটি করতে পেরেছিলেন। সেই চুক্তি করে তার জন্যে তিনি অভিনন্দনও পেয়েছিলেন, ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন, আরো অনেক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো যদি এই চুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হতো। দুর্ভাগ্যজনক, আজকে যখন আমরা আলোচনা করছি তখন সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জায়গা থেকে অনেক দূরে–এই আলোচনাগুলো অনেকখানি হয়ে গেছে।

আমি সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জায়গায় না গিয়ে সাধারণভাবে যে বিষয়গুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে আলোচনা হয় সেই দুয়েকটি কথা যদি বলি। চুক্তির পরপর বলা হয়েছিলো– ফেনী পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে যাবে, যারা বলেছিলেন বিএনপি-জামায়াত এবং পরবর্তীতে দেখা গেলো যে সেটি কিন্তু ফেনী পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে যায়নি। এখন চুক্তি বাস্তবায়ন না করে আমরা বলছি বাস্তবায়ন করে ফেলছি এবং এর জন্যে নেপথ্যে আমরা অনেক রকমের প্রচারণার আশ্রয় নিচ্ছি। যারা 'বাস্তবায়ন করবো' বলে কথা বলছেন সেই সরকারেরই একটি অংশ নেপথ্যে বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে একটি কথা বার বার করে বলা হয়, যতগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিলো সেই ধারাগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এখন যেগুলো আছে সেগুলো

আসলে আর বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই এগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বিষয়টি কি আসলে তাই?

> একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি অখন্ড বাংলাদেশের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চাই। আপনি যখন চুক্তি করেছেন তখন সেই আশঙ্কাটি কমে গেছে। আপনি এখন চুক্তি বাস্তবায়ন করছেন না, আবার একসময় গিয়ে সেই আশঙ্কাটি তৈরি হলেও হতে পারে। বাঙালি হিসেবে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার উপলব্ধিতে এই বিষয়টি আসতে হবে।

এই চুক্তির যে জায়গাগুলো বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়, সরলভাবে যে কথাটি বলা হয়, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়– আপনি বাংলাদেশের মানুষ, আপনি কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে জমি কিনতে পারবেন না, আপনি কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন না, করতে পারবেন না– এই একটি কথা, খুব শিক্ষিত মানুষ, সচেতন মানুষ কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের ভেতরে এই কথাটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন এই কথার বাইরে যে কথা আছে, পৃথিবীতে বিশেষ শাসিত অঞ্চল বলে যে একটা অঞ্চল আছে, আদিবাসী বা আপনি আদিবাসী যদি নাও বলেন, নাও বলেনটাকে আমি মানি না, তবুও বিশেষ শাসিত অঞ্চল বলে যে একটা অঞ্চল আছে সেটাতো পৃথিবীতে বাংলাদেশই একমাত্র জায়গা নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামই একমাত্র জায়গা নয় যে, এই ক্ষেত্রে এই রকম একমাত্র বাংলাদেশে করা হয়েছে।

ভারতের অনেকগুলো জায়গা আছে, দার্জিলিং, ত্রিপুরাসহ অনেকগুলো জায়গা আছে সেখানে যে কোন একজন ভারতীয় ইচ্ছে করলেই গিয়ে জায়গা-জমি কিনে বাড়ি বানাতে পারেন না। ইউরোপের অনেক দেশ আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আছে, অস্ট্রেলিয়া আছে, ইচ্ছে করলেই আপনি সেই জায়গাতে জায়গা-জমি কিনে বাড়ি বানাতে পারেন না। ‘বোলজানো’ ইতালির একটি অঞ্চল। অস্ট্রিয়া-জার্মানির সীমান্ত এলাকা। বোলজানোবাসী এক সময় ইতালিয়ান শাসকদের উপর খুশি ছিল না। ইতালির অত্যাচারে তারা জার্মানির সঙ্গে চলে যেতে চায়। তারপর ইতালিয়ান শাসকরা তাদের ভুল বুঝতে পারে। অনেক বছর ধরে বোলজানো ইতালির সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চল। ট্রেন স্টেশনসহ সব জায়গায় ইতালিয়ানের পাশাপাশি জার্মান ডয়েচ ভাষায় সাইন বোর্ড লেখা থাকে। তাদেরকে শান্ত করে জার্মানি ভাষা ডয়েচকে দ্বিতীয় ভাষা দিয়ে স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে। একজন ইতালিয়ান ইচ্ছে করলেই সেখানে গিয়ে জায়গা-জমি কিনে বাড়ি করতে পারেন না, ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারেন না।

এখন আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে চুক্তি করেছেন, আপনি বরিশালের সঙ্গে চুক্তি করেন নাই, আপনি ফেনীর সঙ্গে চুক্তি করেন নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল। যারা বলেন যে, আমি কেন পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে পারবো না– যেটা রোবায়েত ফেরদৌস একটু বলেছেন, ধরে নেন বরিশাল একটি শহর, ধরি বরিশাল শহরের লোক দশ লক্ষ, সেখানে যদি তার পাশের জেলা থেকে এনে আরো দশ লক্ষ লোক প্রবেশ করানো হয় এবং সেখানকার খাস জমি, নদী, আপনার বাড়ির আঙিনা, বাড়ির উঠান, আপনার একটি ঘর, যেখানে পতিত জায়গা ছিলো সেখানের সব জায়গা যদি দখল করে নেয়া হয়, তো বরিশালের মানুষ আপনি তা কি চুপ করে সহ্য করবেন, নাকি প্রতিবাদ করবেন, না প্রতিরোধ করবেন?

অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি জায়গা নিয়ে দেখতে হবে। বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সঙ্গে থাকবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সঙ্গে থাকবে না এরকম একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিলো ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত এরকম একটা অবস্থা ছিলো, এরকম একটা শঙ্কা ছিলো। আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চাই, চুক্তির বাস্তবায়ন চাই শুধুমাত্র পাহাড়িদের প্রতি আমার সমবেদনা থেকে নয়, আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমি অখন্ড বাংলাদেশের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চাই। আপনি যখন চুক্তি করেছেন তখন সেই আশঙ্কাটি কমে গেছে। আপনি এখন চুক্তি বাস্তবায়ন করছেন না, আবার একসময় গিয়ে সেই আশঙ্কাটি তৈরি হলেও হতে পারে। বাঙালি হিসেবে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার উপলব্ধিতে এই বিষয়টি আসতে হবে।

আমরা মেডিকেল কলেজ চাই, বিশ্ববিদ্যালয় চাই। প্রচারণা চালানো হচ্ছে– পাহাড়িরা শিক্ষা চায় না, সন্তু লারমা শিক্ষা চায় না, উচ্চ শিক্ষা চায় না। ডিম আগে না মুরগি আগে– আপনি এই বিতর্ক তুলে দিচ্ছেন কেন? কোন শিক্ষারই সেখানে বিরোধিতা করা হবে না। মেডিকেল কলেজ আপনি একটি কেন, দশটি করেন। আগে চুক্তি বাস্তবায়ন করেন। আপনি মেডিকেল কলেজ করার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য, ক্যান্টনমেন্ট করার জন্য, অবকাঠামো নির্মাণের জন্য আপনি তিন দিনের মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করে ফেলতে পারছেন। আপনি বিশ বছরে আঞ্চলিক পরিষদের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে পারছেন না? তার মানে কী, চুক্তি বাস্তবায়নে আপনার আন্তরিকতা নাই।

এখন যে কোন সরকার ইচ্ছে করলে নিপীড়ন করতে পারে, নির্যাতন করতে পারে, দমন করতে পারে। তার হাতে পুলিশ আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে, সামরিক বাহিনী আছে এবং সেই কাজটি পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ সময় ধরে করা হচ্ছে। এর পরিণতি কী হয় ১৯৭১ সালে একবার খুব বড়ভাবে প্রমাণ হয়েছে। ২৫ বছর সেখানে আমরা যুদ্ধ করেছি। বাংলাদেশী সামরিক বাহিনী

শান্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। ২৫ বছর যুদ্ধ করে তো আমরা তাদের পরাজিত করতে পারি নাই। আমরা চুক্তি করে একটি রাজনৈতিক সমাধানের জায়গাতে আসতে বাধ্য হয়েছি। তারপরেও আমরা কেন আবার সেই জায়গাতে ফিরে যাচ্ছি?

একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাঙালিদেরকে সমতল ভূমি থেকে সেখানে নিয়ে আশ্রয় দেয়া হয়েছে তাদের অন্যত্র পুনর্বাসন করা সম্ভব কি সম্ভব নয়। আমাদের সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখতে হবে, যে বাঙালিদের সেখানে আশ্রয় দেয়া হয়েছে রেশন নির্ভর জীবন যাপন করতে দেয়া হয়েছে, অমানবিক জীবন যাপন করছে, মানবেতর জীবনযাপন করছে, অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদেরকে যদি একটু বুঝিয়ে উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়া যায়, যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে তার বড় একটি অংশ সেখান থেকে চলে আসতে চাইবে। রোহিঙ্গারা ভিনদেশী নাগরিক, মিয়ানমারের নাগরিক, তাদেরকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাদের জনসংখ্যা দশ লক্ষ, বার লক্ষ, চৌদ্দ লক্ষকে আমরা পুনর্বাসন করার উদ্যোগ নিচ্ছি, আমরা বলছি আমরা করে ফেলতে পারবো। দশ লক্ষ, বার লক্ষ রোহিঙ্গাকে আপনি পুনর্বাসন করতে পারবেন, আপনি চার লক্ষ, পাঁচ লক্ষ বাঙালিকে পুনর্বাসন করতে পারবেন না? এটি কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আপনার আন্তরিকতা নেই বলেই আপনি পারবেন না, আপনি উদ্যোগ নিচ্ছেন না। সমভাবে দেখতে হবে, বাংলাদেশের নাগরিক যারা তাদের প্রতি সংবেদনশীল থাকতে হবে।

আমি একটি পত্রিকায় দেখলাম, একজন রোহিঙ্গা শিশু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পানি নিয়ে আসছে, তার প্রতি সমবেদনা তৈরি করছি, লিখছি রোহিঙ্গা শিশুরা কত নিপীড়িত, নির্যাতিত। তারা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের থেকে পানি নিয়ে উপরের দিকে উঠছে। দীর্ঘ বছর ধরে পাহাড়ি শিশুরা, পাহাড়ি জনগণ যে এর চেয়ে করুণ জীবনযাপন করছে তার প্রতি আমরা সংবেদনশীল নই, সেই বিষয়টি আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় না। রোহিঙ্গাদের প্রতি আমাদের যে সমবেদনা থাকুক, ভালো কথা, আমি এর বিরুদ্ধে না। আমারও সমবেদনা আছে। কিন্তু আপনি পাহাড়িদের প্রতি সমবেদনা দেখাবেন না! সাঁওতালদের প্রতি সমবেদনা দেখাবেন না! নাসিরনগরে যাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, দিনাজপুর-রংপুরে যাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছেন তাদের প্রতি আপনি সমবেদনা দেখাবেন না এটা কোন ধরনের মানবতা। তারা বাংলাদেশের নাগরিক না? আপনি যেখানে প্রশংসা পাবেন বিশ্বব্যাপী, বাংলাদেশের নাগরিকের চেয়ে তাদের প্রতি এক ধরনের লোক দেখানো সমবেদনা দেখাবেন আর বাংলাদেশের নাগরিকদের নিপীড়ন, নির্যাতন করবেন–এটাতো একটা রাষ্ট্রের চরিত্র হতে পারে না।

আপনি রোহিঙ্গাদের জন্য যে পরিমাণ মনোবেদনা, দরদ দেখাচ্ছেন, লংগদুর যে আড়াইশ পরিবারের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হলো তাদের পুনর্বাসন আপনি করলেন কিনা একবারও কি আমরা খোঁজ নিয়েছি? আমাদের নাগরিক সমাজ খুব ছোটভাবে খোঁজ নিয়েছে। আমাদের সরকারি-বেসরকারি এত সংস্থা, কয়জন খবর নিয়েছে সেই আড়াইশ পরিবার এখন কীভাবে আছে, কোথায় আছে? আমরা কেউ কোনদিন খবর নিইনি। সুতরাং রাষ্ট্রের চরিত্র যদি গণতান্ত্রিক না হয়, রাষ্ট্র যদি একটি স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করে এবং আমরা কেউ কেউ কথা বলার সময় যদি সেই স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের ঐ আচরণটিকে সমর্থন করে শুধু পাহাড়ের সমস্যার সমাধান করাটাকে আমরা যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তাহলে আমরা ভুল করবো। এখানে আমাদের সবার সমান দায়িত্ব আছে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের চরিত্র দেখার এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের চরিত্র ঠিক করার। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের চরিত্র যদি দমন, নিপীড়ন এবং স্বৈরতান্ত্রিক হয় তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে একটি জায়গার প্রতি সংবেদনশীল করা যাবে না, বিচ্ছিন্নভাবে একটি জায়গা, একটি অঞ্চলের মানুষের প্রতি সমবেদনা তৈরি করা যাবে না, তাদের সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

> ”
>
> নাসিরনগরে যাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, দিনাজপুর-রংপুরে যাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছেন তাদের প্রতি আপনি সমবেদনা দেখাবেন না এটা কোন ধরনের মানবতা। ...আপনি যেখানে প্রশংসা পাবেন বিশ্বব্যাপী, বাংলাদেশের নাগরিকের চেয়ে তাদের প্রতি এক ধরনের লোক দেখানো সমবেদনা দেখাবেন আর বাংলাদেশের নাগরিকদের নিপীড়ন, নির্যাতন করবেন– এটা তো একটা রাষ্ট্রের চরিত্র হতে পারে না।

সামগ্রিকভাবে যে যেখানে আছি, যার যতটুকু দায়িত্ব, হয় দায় স্বীকার করতে হবে, দায় স্বীকার করে সেখান থেকে সরে আসতে হবে অথবা আমি একটি জায়গার আলোচনায় গিয়ে একরকম কথা বলবো, আরেক জায়গার আলোচনায় গিয়ে আরেক রকম কথা বলবো, একই মানুষ, এই দ্বিচারিতার জায়গা থেকে আমরা যদি বের হয়ে না আসি, আমরা যদি কঠোরভাবে অবস্থান না নিই, আলোচনা না করি, কথা না বলি, তাহলে এই আলোচনা আমাদের বছরের পর বছর করে যেতে হবে এবং সেটা বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে, সেটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমানুষের স্বার্থ পরিপন্থী নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমস্যায় জর্জরিত রেখে দেশের উন্নতি ও অগ্রযাত্রা হতে পারে না

আবু সাইদ খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, নেতৃবৃন্দ, সমবেত বন্ধুগণ। আজ থেকে ২০ বছর আগে যখন চুক্তি হয়েছিল তখন আমরা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখেছি। কিন্তু আজকে তিনি ক্ষুব্ধ। সেদিন আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, আজকে সমালোচনা করছি–এর কারণ কী? কারণ অনুসন্ধানে আমার মনে হয় একটু গভীরে যাওয়া দরকার। একাত্তরে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে দেশটা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এই দেশটা কিন্তু বাঙালি প্রজাতন্ত্র ছিল না, এই দেশটা কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ছিল না। দেশটার নাম ছিল গণপ্রজাতন্ত্র, বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্র। কিন্তু এই গণপ্রজাতন্ত্রের সংবিধানের মধ্যে এখানে বাঙালিত্ব এবং ইসলামিত্বের ছাপ পড়েছে। আমার মনে হয়, সমস্যাটা এখানেই এবং এই সমস্যাটা শুধুমাত্র সংবিধানে বন্দী নেই। শাসকগোষ্ঠী, এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মজ্জাগতও হয়ে গেছে। এখানে ধারণা করা হচ্ছে, কখনো কখনো এটাকে বাঙালি রাষ্ট্র, কখনো কখনো এটাকে কৌশলে ইসলামী রাষ্ট্র ভাবা হচ্ছে। আমার মনে হয়, এখান থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। এখান থেকে মুক্ত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে দেখা দরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্র যদি দেখতে হয়, তাহলে এখানে বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র কিংবা মুসলমানের রাষ্ট্র– এই ধারণা আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি তাদেরকে খানিকটা উদার হতে হবে। কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠরা উদার না হলে সেখানে সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার আমরা যারা ধর্মীয়ভাবে সংখ্যাগুরু মুসলমান তাদেরকেও একটু উদার হতে হবে। তা না হলে এখানে সংখ্যালঘু ধর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এই জায়গাগুলো মনে হয় একটা মজ্জাগত সমস্যা এবং এখান থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া দরকার। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন হয়নি বলেই যারা ওখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন তারা বাঙালি মুসলমান, যে কারণে তারা পাহাড়িদেরকে সেভাবে সমমর্যাদার নাগরিক, সম্মানিত নাগরিক হিসেবে দেখছেন না। সমস্যাটা কিন্তু সেখানেই সৃষ্টি হচ্ছে। যে কারণে সেখানে ভূমি সমস্যা দীর্ঘ দিন ধরে জিইয়ে আছে। কেন জিইয়ে আছে? যারা ভূমি কর্মকর্তা যাচ্ছেন তারা এই সমস্যাটাকে গভীরভাবে দেখছেন না এবং তারা মনে করছেন না যে, ওটা একটা বিশেষায়িত অঞ্চল এবং এখানে তাদের আলাদা সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারটাকে ভাবতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যার কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছে না।

তারা মনে করছেন যে, ওখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বোধ হয় বাঙালি পুলিশ দরকার। কেন? পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় তো কম্যুনিটি পুলিশ আছে এবং আমরাও তো কয়েকদিন আগে কম্যুনিটি পুলিশ সপ্তাহ পালন করেছি। এর মানে, সেই এলাকার লোকেরাই সেই এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। কম্যুনিটি পুলিশের ধারণা অনুসারে, আমরা অন্য কিছু বাদই দিলাম, পাহাড়িরা তাদের এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিবেন তাতে ক্ষতিটা কী! আর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করলে এখানে সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হবে, না সার্বভৌমত্ব আরো জোরদার হবে– এটা আমি বুঝতে পারি না। একটা এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে তো বাংলাদেশে সেখানে শান্তি এবং সার্বভৌমত্ব এবং বাংলাদেশের নামটা উজ্জ্বল হবে!

আরেকটা আমাদেরকে ভাবতে হবে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্ধকারে রেখে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে সমস্যায় জর্জরিত রেখে, বাংলাদেশের উন্নতি এবং অগ্রযাত্রা হবে না। অতএব বাংলাদেশকে আলোকিত করতে হলে, বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে আমার মনে হয় সব এলাকার সব অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এখানে একটা সমতা ও ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। আর সেখানে যদি বিশেষায়িত অঞ্চল থাকে, যেখানে আদিবাসীরা তারা ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী। আবার আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের অনেক মিলও আছে, আবার অমিলও আছে। এই যে স্বাতন্ত্র্যতা, এটাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা, এই যে বহুত্ববাদী ধারণা–এই ধারণাকে আমাদের ধারণ করতে হবে। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ কেবলমাত্র বাঙালির রাষ্ট্র নয়, বাংলাদেশ বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, সবার রাষ্ট্র। বাংলাদেশ কেবলমাত্র মুসলমানের রাষ্ট্র নয়, বাংলাদেশ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সবার রাষ্ট্র। এই জায়গা থেকে যদি আমরা ভাবতে না পারি, তাহলে সমস্যা আরো ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে যাবে।

সমস্যার কিছু কিছু দিক অগ্রগতি ঘটেছে, কিন্তু মূল বিষয়গুলো যেমন ভূমি সমস্যা, স্থানীয় শাসন গড়ে তোলার সমস্যা, অর্থাৎ এখানে আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদকে ক্ষমতায়ন করার

ব্যাপারে তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি এর আগেও বলেছি, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে এই চুক্তি পড়েছি, আমার মনে হয় তাদেরকে যে অধিকারটা দেয়া হয়েছে সেটা ব্রিটেনের কাউন্টিও এই অধিকারটা ভোগ করে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকারগুলো এই অধিকার ভোগ করে। তাদেরকে যে অধিকারটুকু দেয়া হয়েছে এই অধিকার যদি বাংলাদেশের সব জেলায় দিয়ে দেয়া হয় বাংলাদেশের কোন ক্ষতি নেই। কেননা গণতন্ত্রের বড় কথা হলো ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতন্ত্রকে উপর থেকে নীচের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, যাতে মানুষ প্রশাসনকে নাগালের ভেতর পায়, জবাবদিহিতা করতে হয়। যদি ক্ষমতাটা নীচের দিকে চলে যায়, অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের কাছে চলে যায় তাহলে তাদেরকে সহজেই নাগালের ভিতর ধরা যায়। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা হলো বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিশেষত যেখানে আদিবাসীদের বসবাস, যেটা দীর্ঘ দিন ধরে বিশেষায়িত অঞ্চল সেখানে আরেকটু বেশি অধিকার দিতে হবে, এতে লজ্জার কিছু নাই, এতে গ্লানির কিছু নাই। বরং এটা উদারতার বিষয় এবং সেই উদার মানবিক জায়গা থেকে ব্যাপারটাকে ভাবা দরকার।

> আমরা যারা ধর্মীয়ভাবে সংখ্যাগুরু মুসলমান তাদেরকেও একটু উদার হতে হবে। তা না হলে এখানে সংখ্যালঘু ধর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এই জায়গাগুলো মনে হয় একটা মজ্জাগত সমস্যা এবং এখান থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া দরকার। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন হয়নি বলেই যারা ওখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন তারা বাঙালি মুসলমান, যে কারণে তারা পাহাড়িদেরকে সেভাবে সমমর্যাদার নাগরিক, সম্মানিত নাগরিক হিসেবে দেখছেন না। সমস্যাটা কিন্তু সেখানেই সৃষ্টি হচ্ছে। যে কারণে সেখানে ভূমি সমস্যা দীর্ঘ দিন ধরে জিইয়ে আছে।

আমাদেরকে মনে রাখা দরকার যে, তারা উপজাতি নয়, বাঙালি জাতির তারা উপজাতি নয়। তারাও একটা জাতি। সংখ্যায় কম হতে পারে, সংখ্যালঘু হতে পারে, কিন্তু তারাও বাংলাদেশের সমমর্যাদার নাগরিক–এই হিসাবেই আমাদেরকে বিবেচনা করা দরকার। আমি জানি না, আমাদের বাংলা ভাষার সবচেয়ে একটা ত্রুটি যে, ট্রাইবের বাংলাটা আমরা কেন উপজাতি করলাম। এই ট্রাইবের বাংলাটা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, নেপালে 'জনজাতি'। এই 'জনজাতি' শব্দের মধ্য দিয়ে কিন্তু সেখানে একটা সম্মানবোধের ব্যাপার আছে। আমি জানি না, এই যে বাঙালির অনুদারতা কিংবা এক ধরনের কমপ্লেক্স থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা বোধ হয় 'উপজাতি' করেছিলেন। এই শব্দটাকে পরিহার করা দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা আবার সংবিধানে ঢুকে গেছে। ওখান থেকে ঝেঁটিয়ে বের করাটা জরুরি বলে আমি মনে করি। সংবিধানে যা কিছু ঢুকে গেছে, সেসব কিছু তো আর পবিত্র হয়ে যায়নি! সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ঢুকে গেছে। এটা কি বৈধ? এটা কি মানতে চান? এমনি করে সংবিধানে অনেক কিছু ঢুকে গেছে। সেগুলোকে আমার মনে হয় বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বার্থে সমস্ত নাগরিককে সমমর্যাদার দৃষ্টিতে দেখাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সমস্যা যেখানে রয়ে গেছে, যেমন মঙ্গা এলাকা, এখন মঙ্গা আছে কিনা জানি না, ধরুন মঙ্গা এলাকার জন্য বিশেষ বাজেট লাগবে। যেমন হাওরের জন্য বিশেষ বাজেট দরকার এবং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। আমার মনে হয় ঠিক তেমনিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যও বিশেষ বাজেট, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কেবলমাত্র পাহাড়িদের সমস্যা নয়, কেবলমাত্র পার্বত্যবাসীর সমস্যা নয়, এটা বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা– সেভাবেই আমাদেরকে দেখতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে। আর আমাদের জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির জন্য লজ্জার ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যে এই লড়াইটা কেবলমাত্র পাহাড়িরা করছেন, কেবলমাত্র সন্তুদা করছেন। এটা আমাদের জন্য লজ্জার। আর আমি মনে করি যে, তারা বাংলাদেশের অংশ, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের লড়াইয়ে এখানে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা যে লড়াইটা করছেন সেই লড়াইটা হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির লড়াইয়েরেই অংশ, সামগ্রিক মুক্তির লড়াইয়েরেই অংশ। সেই হিসেবে আমি সন্তু লারমাকে কেবলমাত্র পাহাড়ের নেতা বলতে চাই না, উনি বাংলাদেশের জাতীয় নেতা। সেই হিসেবে সম্মান করতে চাই। আমার মনে হয়, এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি যে সংগ্রাম করছেন এটা বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামকে, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে, বাংলাদেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম।

আমরা আবারও বলতে চাই, আমাদের উন্নয়ন যতটুকু হয়েছে এটাকে ধরে রাখতে হলে, টেকসই করতে হলে সব মানুষের মধ্যে সংহতির বাতাবরণ তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশের সংহতিকে বিনষ্ট করে, সম্প্রীতির জায়গাকে নষ্ট করে আমার মনে হয় এটা সম্ভব হবে না। তাই আজকে আমাদের এই দিনে চুক্তির বিশ বছর পরে আমাদের যতটুকু অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিলো হয়নি এবং আমার মনে হয়, এই সংগ্রাম এটা আমাদের সংগ্রাম, এই সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি এবং এই লড়াইটাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং বাংলাদেশে যেখানে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অন্ধকার আছে সেই অন্ধকার ঝেঁটিয়ে বাংলাদেশকে আলোকিত করার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং সেই আলোটা পার্বত্য চট্টগ্রামেও ছড়িয়ে দিতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিকীকরণের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সোচ্চার হতে হবে

রাশেদ খান মেনন
সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এবং মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ধন্যবাদ। আজকের সভার সভাপতি এবং আজকে উপস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং আমাদের জাতীয় নেতা, পাহাড়ি মানুষ কেবল নয়, পাহাড়ি-বাঙালির সকলের নেতা শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এবং আজকে বিশিষ্টজনরা যারা এখানে উপস্থিত তাদের সকলকে শুভেচ্ছা। আমি প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করছি যে, আমার একটা জরুরি কাজে আটকে যাওয়ার কারণে এখানে আসতে দেরি হয়েছে, আবার যেহেতু মেয়র আনিসুল হকের লাশ আসছে, আমাকে এখনি উঠে এয়ারপোর্টে যেতে হবে।

আমার আজকের দিনে এসে কিছুটা নস্টালজিক হয়ে যেতে হয় এই কারণে যে, আমার সৌভাগ্য হয়েছে যে পার্বত্য মানুষের সংগ্রামের সাথে সেই সত্তর দশক থেকে সংযুক্ত থাকার কারণে। তৃতীয় পার্লামেন্টে যখন নির্বাচিত হয়ে আসি ১৯৭৯ সালে, তারপরেই আমরা একটা সার্কুলার পাই গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যে, তোমার এলাকার যারা চরভাঙা মানুষ আছে তাদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে জায়গা দেওয়া হবে, তাদের জন্য দেড় বিঘা জমি এবং বোধ হয় দুটো গরু, আমার এখন আর স্পষ্টভাবে সার্কুলারটা মনে নেই। প্রত্যেক এমপিকে এই সার্কুলারটা দেওয়া হয়েছিলো। আমার এখনও মনে আছে, তখন সেই তরুণ সাংসদ হিসেবে আমরা যারা ছিলাম, আমরা এর প্রতিবাদ করেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম যে, এটি হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট করার জন্য, এটা সামরিক শাসকদের পরিকল্পনা। জিয়াউর রহমান খুবই পরিকল্পিতভাবে একদিকে যেমন সামরিকীকরণ করেছিলো, একই সঙ্গে এভাবে জাতিগত বা ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন আনার জন্য এই উদ্যোগটা তখনকার সময়ে নেয়া হয়েছিলো এবং আমরা ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও তার প্রতিবাদ সেসময়ে করেছিলাম।

সেই সময়ে আপনাদের যদি খেয়াল থাকে, নাগরিকদের নিয়ে ঢাকাতে অন্ততপক্ষে আমরা কিছু কথা বলতাম মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কমিটির নামে যে সভাগুলি হতো সেখানে আমরা এই কথাগুলো তুলে ধরতাম। এর পরবর্তী যে ঘটনাটা ছিলো সেটা কাউখালী হত্যাকাণ্ড, একটা প্রচণ্ড ধরনের গণহত্যা ছিলো সেটা। আমি এবং পরবর্তীকালে তখন জাসদের নেতা শাজাহান সিরাজ এবং উপেন্দ্র লাল চাকমা, আমরা তিনজন একটি পার্লামেন্টারি দল নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম এবং আমরা সেখানে বলেছিলাম যে, আমার এখনও মনে আছে, পার্লামেন্টে ফিরে এসে বলেছিলাম, এই ব্যাপারে এখনই পার্লামেন্টারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, যেটা সবক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, তাদেরকে নিয়েই সেই পার্লামেন্টারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো, যার আহ্বায়ক হলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। আমরা কেউ নেই আরকি। অবশ্য সেই পার্লামেন্ট আর টেকেনি। সুতরাং পার্লামেন্টারি কমিটিও আর কাজ করেনি।

পরবর্তীকালে আমার সৌভাগ্য হয়েছে, যখন '৯১ সালের পার্লামেন্টে আসি, তখন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনেই আমরা বিষয়টিকে তুলে নিয়ে আসি এবং সেই সময় যে গণতান্ত্রিক আবহ ও আবহাওয়াটা ছিলো এবং কমিটমেন্ট ছিলো তার ভিত্তিতে সমস্ত দলগুলোর, যদিও বিএনপি সরকার তখন ক্ষমতাসীন, একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য, যার একজন সদস্য হিসেবে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একদিকে সেই পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে আজকের যিনি, তখনও তিনি নেতা, সেই সন্তু লারমাসহ অন্যদের সাথে আলোচনার জন্য এবং বাইরে এমনকি ভারতে যে শরণার্থী শিবিরগুলো ছিলো সেই শিবিরগুলোতেও আলোচনা করার। আমরা ভালো অগ্রসর হয়েছিলাম এবং একটা পর্যায়ে সেখান থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন শুরু হয়েছিলো, আবার সেটা বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে যে মূল প্রশ্নটি ছিলো সেটা ছিলো– বহিরাগত যারা অর্থাৎ সেখানে যারা নতুন করে জায়গা নিয়েছেন তাদেরকে কিভাবে পুনর্বাসন করা যেতে পারে–এই প্রশ্নটি। আমাদের কমিটির তরফ থেকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং সেই সময়ে কিছু কিছু বিদেশী রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন তারা সহযোগিতা করবেন। কিন্তু বেগম জিয়ার নেতৃত্বে যে ন্যাশনাল কাউন্সিল ছিলো যার মধ্যে আমাদের কোন প্রবেশাধিকার ছিলো না, ছিল সিনিয়র মন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর চীফ, তারাই তখন এটা অস্বীকার করেন এবং বেগম জিয়া স্পষ্টই বলেন যে, মুজিব যেটা করে যায়নি আমি কেন সেটা করতে যাবো। আমার এখনও তা মনে আছে।

যা হোক, পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালে যখন পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয় তখন আমরা সবাই আশ্বস্ত হয়েছিলাম। অবশ্য আমার সৌভাগ্য হয়নি এই প্রক্রিয়ার সর্বশেষ পর্যায়ের সাথে যুক্ত থাকতে। তবে আমরা তখনি প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলাম, এখানে দুটি প্রশ্ন রয়ে গেলো। একটি হলো– যারা বহিরাগত তাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়টি, এটি কিন্তু চুক্তির কোথাও সেভাবে উল্লেখ হয়নি, যেটা পরবর্তীকালে যে কারণে, আজকেও মনে করি, সেখানে অভিবাসন ঘটছে, বাইরে থেকে যারা যাচ্ছেন তারা এখনও সেখানে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় যে প্রধান বিষয় ছিলো সেটি ছিলো ভূমি বিরোধের বিষয়টি। কথা হয়েছিলো যে ভূমি কমিশন গঠন করে এই ভূমি বিরোধের বিষয়টি সমাধান করা হবে। আপনারা জানেন যে, চুক্তির পরবর্তী মেয়াদে যে সরকার ক্ষমতায় আসে সেটা বিএনপি সরকার, তারা প্রথমেই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলো এবং যেটা মোর্তোজা উল্লেখ করেছিলেন যে, ফেনী পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে এবং তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত লংমার্চ করার কথা বলেছিলো। সেই বিএনপির আমলে চুক্তির কোন বাস্তবায়ন হয়নি। এর মধ্যে কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন অনেক ঘটে গেছে।

সেই পরিস্থিতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে বাস্তবতাগুলো এসেছে সেটা হলো– এই পরিস্থিতি শুধু সেখানকার ক্ষেত্রে না, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা প্রযোজ্য– সেটা হচ্ছে যে, আমাদের সমাজে একধরনের সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটেছে এবং এর প্রভাব সর্বত্র বিদ্যমান। ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন আমাদের আদিবাসী ককাসের তরফ থেকে গিয়েছিলাম, তখন আমাদেরকে যেতে না দেয়ার জন্য হরতাল করা হলো। যদিও আমি এমপি এবং অন্যান্যরা ছিলেন, আমাদেরকে যেতে না দেওয়ার জন্য তারা হরতাল করলেন। অবশ্য আমরা গিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ইতিমধ্যে যে শক্তিগুলো সেখানে ছিল তারা কিন্তু সংগঠিত হয়ে গেছে। এই বিষয়টি বাদ দিয়ে এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আমাদের জাতীয় ঐক্যমতের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেকরি। এটি কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে এসেছিল সেটি হচ্ছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন। সন্তুদা জানেন এবং পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সবাই জানেন যে, কী ধরনের বিরোধিতার মুখে এই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের সংশোধনী আনা গেছে। নবম পার্লামেন্টে এটা দুইবার উঠেছে এবং দুইবার আমরা এটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। মানে রীতিমত যুদ্ধ করে ফেরত পাঠিয়েছি। যতবার ফেরত পাঠিয়েছি একটি ঐক্যমতে পৌঁছেছি, ততবারই এটা মন্ত্রণালয়ে আমলা যারা আছেন, যারা এটাকে তৈরি করেন তারা এটাকে পাল্টে দিয়েছেন প্রতিবারই। এব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত সমাধানের জায়গায় আসা গেছে। কিন্তু যেটা আমার কাছে এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে সমস্যা রয়ে গেছে, সেটা হলো যে, এই ভূমি কমিশনটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এর একটি কারণ বলা হচ্ছে যে– কারণটি খুবই যৌক্তিক কারণ– সেটি হলো যে, এর বিধিমালা এখনও পর্যন্ত প্রণীত হয়নি এবং এই বিধিমালা ইতোমধ্যে, আমি যতটুকু শুনেছি, মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু এই বিধিমালা তৈরির ব্যাপারটি এখন পর্যন্ত সেই জায়গা থেকে আসেনি। এর কারণটাও আমরা জানি, কেন আসে না।

সেখানে ডিসি সাহেবরা যারা যান, তারা যখন সেখানে বই লেখেন, বই লিখতে গিয়ে পার্বত্যবাসীদেরকে তারা যেভাবে উল্লেখ করেন, এটা আমরা এর আগেও প্রতিবাদ করেছি বিভিন্ন সময়। সরকারের তরফ থেকে আদিবাসী দিবসের প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা হয়– এটাও আমরা জানি। এবারেও আদিবাসী দিবসের প্রোগ্রাম যখন হচ্ছে তখন আমাকে আগের রাতে ফোন করে বলা হয়েছে যে, এরা তো আদিবাসী বলছে আপনি কীভাবে যাবেন। আমি বলেছি যে, সংবিধানের এই প্রশ্নটি নিয়ে যখন আমি পার্লামেন্টে যদি নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকতে পারি তাহলে আমার অধিকার রয়েছে এই কথাটি বলার। সুতরাং আমি আদিবাসীদের জায়গায় যাবো। যে জায়গাটায় আমি এখনও মনে করছি, পার্বত্য সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নটির দিকে আমাদের নজরটা বিশেষ করে দিতে হবে এবং এই লড়াইটা একদিনে ক্ষান্ত হবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

”

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা প্রযোজ্য– সেটা হচ্ছে যে, আমাদের সমাজে একধরনের সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটেছে এবং এর প্রভাব সর্বত্র বিদ্যমান। ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন আমাদের আদিবাসী ককাসের তরফ থেকে গিয়েছিলাম, তখন আমাদেরকে যেতে না দেয়ার জন্য হরতাল করা হলো। যদিও আমি এমপি এবং অন্যান্যরা ছিলেন, আমাদেরকে যেতে না দেওয়ার জন্য তারা হরতাল করলেন। অবশ্য আমরা গিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ইতিমধ্যে যে শক্তিগুলো সেখানে ছিল তারা কিন্তু সংগঠিত হয়ে গেছে। এই বিষয়টি বাদ দিয়ে এই শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আমাদের জাতীয় ঐক্যমতের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনেকরি। এটি কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়।

আমি আগেই বলেছি, দুটি ঘটনা সেখানে ঘটে গেছে। একটি হচ্ছে সামরিকীকরণ সেখানে ঘটে গেছে, যেটা জিয়াউর রহমানের আমল থেকে শুরু হয়ে গেছে এবং যদিও শান্তিচুক্তির পরে কিছু ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে, কিন্তু বাকিগুলো প্রত্যাহার করা হয়নি, এটা সন্তু লারমা গতকালও সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন। এই সামরিকীকরণের যে ঘটনা ঘটে গেছে এব্যাপারে আমাদেরকে স্পষ্ট

জায়গায় নিয়ে আসার জন্য সরকারকে বলতে হবে এবং এব্যাপারে আমাদের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে সোচ্চার হতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে যারা সেখানে অভিবাসন করেছেন, বাঙালি হিসেবে যারা সেখানে গেছেন, তাদের বিষয়টি সমাধান কীভাবে করবো আমরা, এই বিষয়টিও দেখা প্রয়োজন। না হলে পরে এখন যেটা ঘটে যাচ্ছে সেটা হলো, এক ধরনের সাম্প্রদায়িক সংকট। তা সেখানে কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। লংগদুর ঘটনা যার প্রমাণ। অথবা রাঙামাটিতে এর আগেও যে ঘটনাগুলো ঘটেছে। তার প্রমাণ আমরা এর আগেও বারবার পেয়েছি। কিন্তু এটা নিয়ে একটা সামগ্রিক কাজ আমরা এগিয়ে নিতে পারিনি। এই হলো দ্বিতীয় প্রশ্ন।

আমি এখনও মনে করি যে, ভূমি কমিশনকে কার্যকর করা খুবই জরুরি। আমি ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান সাহেবকে বলেছিলাম, এটা করছেন না কেন আপনারা? উনি বললেন যে, আমরা মিটিং ডাকছি, কিন্তু উনারা তো বিধিমালার কথা বলে আসছেন। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটির একটা সমাধান করা দরকার। আমি মনেকরি, ভূমি কমিশনকে কার্যকর করা খুবই জরুরি, এটা হলে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের অন্ততপক্ষে অনেকখানি জায়গা অগ্রগতি হতো।

তৃতীয় যে বিষয়টি আমি বলতে চাই, আমি সবসময় যে কথা বলে আসছি যে, এখনও পর্যন্ত এটা পাহাড়ি বা জনসংহতি সমিতির সমস্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা হলো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক দলগুলোর, রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের এবং আমাদের সাধারণ যে মানুষ তাদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি এখনও পর্যন্ত সেভাবে আমরা করতে পারিনি। আমার এখনও মনে আছে, আমরা যখন সত্তরের দশকে এভাবে শুরু করেছিলাম, তখন কিন্তু এব্যাপারে অনেক বেশি আন্তরিকভাবে এ ব্যাপারটি আনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আজকে বাংলাদেশে যে হট্টগোল, তার কারণও অনেক আছে, সেগুলো নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। আমি মনেকরি যে, পাহাড়ি জনগণের সমস্যার সমাধান করতে গেলে এটা পাহাড়িদের সমস্যা নয়, এটা সমগ্র জাতির সমস্যা, এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগুতে হবে। তবুও আমি মনেকরি যে, আজকে আমাদের যদি সমবেত প্রচেষ্টা থাকে এবং পাহাড়ি জনগণের যে সংগ্রাম আছে তার সাথে যদি আমাদের সেই ঐক্যমত থাকে, তাহলে এই সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব কোন ব্যাপার বলে আমি মনে করি না। এজন্য দরকার, ঐক্যমতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক লড়াই, সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকীকরণের যে বিকার ঘটে গেছে এর বিরুদ্ধেও একইভাবে লড়াইটা করা। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান

সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সুধীবৃন্দ, আমি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা আমি এখানে বলতে চাইছি।

প্রথমেই আমি একটি ব্যাপারে আজকের আয়োজকদের অভিনন্দন জানাতে চাই, আমি যতদিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বে ছিলাম, যখনই আমরা পার্বত্য চুক্তি নিয়ে কথা বলতাম বা আদিবাসী অধিকার নিয়ে সেমিনার হতো, সকল সময়ে আমি আয়োজক এবং বিশেষ করে সঞ্জীব দ্রংকে সবসময় বলতাম যে, এরকম সেমিনারে শুধুমাত্র পাহাড়িদের কেন দেখি, বাঙালিদের কেন দেখি না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙালিদের আধিক্য না হবে ততদিন পর্যন্ত এসমস্ত সংগ্রাম এবং আন্দোলন খুব একটা কিন্তু ফল দেবে না। আজকে ভালো লাগছে যে, অন্যান্য অনেক সময়ের তুলনায় আজকে এই সেমিনারে বাঙালিদের উপস্থিতি যথেষ্ট দৃশ্যমান এবং এটি সকল হতাশার ভেতরেও আমাকে আশান্বিত করছে। সুতরাং আয়োজকদের অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ।

আমি এই পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে অন্য কোন আঙ্গিকে কথা না বলে কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না সে ব্যাপারে আমি কয়েকটা ফ্যাক্টর উল্লেখ করবো এবং আশা করি এর ভেতর দিয়েই আমাদের উত্তরণের পথ কী সেটার এক ধরনের নির্দেশক হয়ত আমরা অনুমান করে নিতে পারবো। প্রথমত কেন এখনও বাস্তবায়িত হচ্ছে না বা হয় না? প্রধান কারণ হচ্ছে, আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে কথাটি

বলছি, আমরা দেখেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ভেতরে এক ধরনের মানসিকতা রয়েছে যখন জনগণকে 'আমরা' এবং 'তোমরা' এই দুটো দলে বিভক্ত করে ফেলি। আমরা বাঙালি, তোমরা পাহাড়ি এবং যখন 'আমরা' এবং 'তোমরা' এই বিভক্তিটা চলে আছে তখনই কিন্তু বৈষম্য শুরু হয়, তখনই মানবাধিকার লংঘন শুরু হয়। সুতরাং আমাদের এই মানসিকতাকে আমরা যদি পরিত্যাগ করতে না পারি, আমরা সকলেই বাংলাদেশের জনগণ, সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক–এই সত্যটি যতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, আমাদের মন-মানসিকতায়, প্রশাসনে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এর যে বাড়তি সমস্যাগুলো সৃষ্টি হতেই থাকবে।

দুই. কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না? আমার মনে হয়েছে, আমাদের প্রশাসনকে, আমাদের সরকারকে সকল সময় ভুল বোঝানো হয় একটি ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে– আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা। নিরাপত্তা বলতে আমরা কী বুঝি? এই নিরাপত্তা যে শক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র ভৌগলিক অখণ্ডতাই নিশ্চিত করাটা যে রাষ্ট্র এবং জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়– এই সত্যটি সকল সময় বলা হয় না। কিন্তু নিরাপত্তার সবচেয়ে ধারক এবং বাহক যে নাগরিকগণ এবং জনগণ, তারা যখন রাষ্ট্রকে ভালোবাসে এর চাইতে বড় নিরাপত্তা যে আর কোন কিছু দিতে পারে না– এই সত্যটি কিন্তু আমরা সকল সময় গ্রহণ করতে পারি না, এভাবে বোধ হয় এই সরকারকে উপদেশও দেয়া হয় না।

তিন. কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না? কারণ পার্বত্য চুক্তি কিন্তু সামরিক চুক্তি নয়, এটি একটি রাজনৈতিক চুক্তি, এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। ক'দিন আগে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঘটনা ঘটলো আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে, সেটি হচ্ছে ইনভয়েস কনফারেন্স। বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রদূতদের ডেকে নিয়ে আনা হয়েছিলো এবং সেটি ছিলো তিন দিনব্যাপী এক কনফারেন্স। সেখানে উদ্বোধনীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে অনেকক্ষণ বক্তব্য রেখেছেন এবং ওখানে উনি একটি কথা বললেন যে, 'আমি ক্ষমতা নেবার সময়–আমি আগেই বলেছি–এটি আমার বিশ্বাস ছিলো যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা কোন সামরিক সমস্যা নয়, এটি হচ্ছে একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং তার রাজনৈতিক সমাধানই এই সমস্যার সমাধান দিতে পারবে–রাজনৈতিকভাবেই এটা আমাকে হ্যান্ডল করতে হবে।' তা-ই উনি করবার চেষ্টা করেছেন। এখন যেটি মনে হচ্ছে, রাজনৈতিক যে দিকটি রয়েছে এটি উপেক্ষিত থাকছে এবং অন্যান্য দিক এখানে যেন তাদের আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এই দিকটি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, 'This is a political problem and political resolution can be the only solution to the problem (এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে রাজনৈতিকভাবে)।'

কী করতে হবে? এটি উত্তরণে একটি পথ, আমরা চা খাবার সময় রোবায়েত ফেরদৌসের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো, অন্য একটি প্রসঙ্গে উনি বলছিলেন যে, সূত্র N+1, অর্থাৎ অনেকগুলো হয়তো আমাদের আছে, আসুন প্লাসের সঙ্গে একটা শর্ত আমরা নতুন যুগিয়ে দিতে পারি। আমি এই সূত্রটুকু উল্টিয়ে দিতে চাই এখানে– 1+N, এই 1টা হচ্ছে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি। ভূমি সমস্যার যদি সমাধান হয়ে যায়, তাহলে ঐ ৪৮টা বাস্তবায়ন হলো, না ৬০টা বাস্তবায়ন হলো, এগুলো কিন্তু এই বাড়তি প্রশ্ন করবারও কোন প্রয়োজন পড়বে না। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গেলে অন্য সকল সমস্যা আপনাআপনি ওখানে নিষ্পত্তি হতে বাধ্য–এটি হচ্ছে একমাত্র সত্য। এই সত্যটিকে আমাদের অনুধাবন এবং উপলব্ধি করতে হবে। আর যেটি দরকার সেটি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একটা মিনিংফুল ডায়ালগ (meaningful dialogue) এবং কো-অপারেশন, কোলাবোরেশন (cooperation, collaboration) সকল সময়ের জন্য অব্যাহত রাখতে হবে। আমি কিন্তু এই শব্দটির উপর জোর দিতে চাই, সেটি হচ্ছে মিনিংফুল ডায়ালগ। It has to be meaningful. লোক দেখানো নয়, এটি কিন্তু সত্যিকার অর্থেই কার্যকর একটি সংলাপ, তাদের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে কার্যকর সহযোগিতা এবং তাদেরকে আস্থায় নিয়ে তাদের মাধ্যমেই কিন্তু এই কাজটি আমাদের করতে হবে–ওটি প্রশাসনের জন্য একান্তই জরুরি।

> আমরা দেখেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ভেতরে এক ধরনের মানসিকতা রয়েছে যখন জনগণকে 'আমরা' এবং 'তোমরা' এই দুটো দলে বিভক্ত করে ফেলি। আমরা বাঙালি, তোমরা পাহাড়ি এবং যখন 'আমরা' এবং 'তোমরা' এই বিভক্তিটা চলে আছে তখনই কিন্তু বৈষম্য শুরু হয়, তখনই মানবাধিকার লংঘন শুরু হয়। সুতরাং আমাদের এই মানসিকতাকে আমরা যদি পরিত্যাগ করতে না পারি, আমরা সকলেই বাংলাদেশের জনগণ, সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক–এই সত্যটি যতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, আমাদের মন-মানসিকতায়, প্রশাসনে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এর যে বাড়তি সমস্যাগুলো সৃষ্টি হতেই থাকবে।

এখানে অধ্যাপক রোবায়েত এবং আরো অনেকেই, এমনকি সন্তুদাও, তাঁদের বক্তব্যে বলেছেন যে, ধীরে ধীরে আদিবাসী জনগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলে সংখ্যালঘুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন এবং বাংলা ভাষাভাষিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছেন– এটা বাস্তবতা। এটার হয়ত নানা মাত্রা থাকতে পারে। আমি কিন্তু এটা একটু উদ্বেগের

হলেও খুব হতাশার কিছু নয়, কেননা আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পাহাড়ি জনগোষ্ঠী যদি পার্বত্য অঞ্চলে সংখ্যালঘিষ্ঠও হয়ে যান, তবুও আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই যে, আন্তর্জাতিক আইন শুধুমাত্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নয়, যারা মাইনরিটি জনগোষ্ঠী তাদের সকল ধরনের অধিকার রক্ষার জন্যে বিশেষ কিছু প্রতিবিধান করে রেখেছেন এবং আইনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এই সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা উপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং সেদিক থেকেও আমাদের কিন্তু নজর দিতে হবে।

পরিশেষে আমি শুধু একটি কথা বলবো, আজকে সন্তুদার বক্তৃতার পরে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, যে আশা নিয়ে, যে উচ্ছাস নিয়ে, যে আনন্দ নিয়ে, আমরা বিশ বছর আগে হয়ত পালন করেছিলাম দিনটিকে, আজকে সেই সন্তুদার মুখে যখন হতাশার বাণী শুনি এবং যখন উনি বলতে বাধ্য হন যে, যদি অস্ত্রের ভাষায় কথা বলতে হয় তাহলে অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়া হবে, তখন আমি আতঙ্কিত হই, আমি শঙ্কিত হই, আমি দুঃখিত হই এই প্রজাতন্ত্রের জন্যে, যে প্রজাতন্ত্র এখনও মানুষকে সঠিক মর্যাদা দিতে শিখলো না। আমরা শুধুমাত্র প্রত্যাশা করতে পারি, অস্ত্রের ভাষার প্রয়োজন পড়বে না, তার আগেই এই প্রজাতন্ত্রের এই রাষ্ট্রের বোধোদয় হবে, উপলব্ধি আসবে যে, প্রত্যেক মানুষকে তাদের স্ব স্ব মহিমায় মহিমান্বিত করে তাদের অধিকারের জায়গাটিকে পুনরুদ্ধার করে, পাকাপোক্ত করে, সুরক্ষিত করে শুধু তাহলেই এই বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, অন্যথায় নয়। সেই বাংলাদেশের প্রত্যাশা রেখে, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে পাহাড়িদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়া হচ্ছে

সৌরভ শিকদার, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

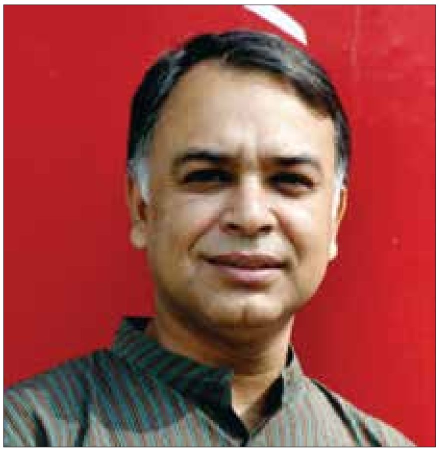

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্তির আজকের এই আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি এবং সুধীবৃন্দ। আসলে আমরা আশা থেকে হতাশায় যে জায়গায় পৌঁছে গেছি সেটা নিয়ে অনেক কথা, অনেক বক্তব্য, কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি মনে হচ্ছে, আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন, যার প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে যে, সরকারের আন্তরিকতার কথা। আমরা বার বার শুনে আসছি, ২০ বছর ধরে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আমরা এই আন্তরিকতার কতটুকু দেখতে পাচ্ছি? বলা হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতার প্রশ্ন–এটিও আমার মনে হয় যে, আন্তরিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি আমরা আন্তরিকই থাকি তাহলে আমাদের আমলাতন্ত্র কেন নিষ্ক্রিয় থাকবে, আমাদের আমলাতন্ত্র কেন বাধা হয়ে থাকবে? অনেকে বলে থাকেন যে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চান, তিনি অনেক আন্তরিক এবং তাঁর চারপাশে হয়ত অনেকেই চান না। কিন্তু আমাদের সবকিছু যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্য দিয়ে আসতে হয় এবং তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে তাঁকেই সেই নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করতে হবে যে, ‘না, আমি দেখতে চাই আগামী দুই বছরে বা তিন বছরের মধ্যে শান্তিচুক্তির পুরোটা বাস্তবায়ন হয়েছে।’

আজকে আমাদের সামনে প্রশ্ন, পাহাড়ের আদিবাসীদের চেয়ে সেখানে বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন, সেনাশাসন কি আদৌ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে? যদি উঠিয়ে নেয়া হয়ে থাকতো তাহলে নতুন করে বান্দরবানে কেন আবার সেনানিবাস তৈরি করা হচ্ছে? আজকে আমাদের সাজেক ভেলীতে দেখা যাচ্ছে, সেখানে যাতায়াত করতে পারে না আদিবাসীরা-বাঙালিরা কেউ স্বাধীনভাবে। সেখানে যাতায়াত করতে হয় সেনাবাহিনীর নির্ধারিত সময়ে, সকাল সাড়ে দশটায় রওনা দিয়ে তাদেরকে যেতে হয়। কেন সাড়ে তিনটায় রওনা দিয়ে আসতে হবে? এরকম প্রশ্নগুলো চলে আসে।

সন্তুদা আমাদেরকে বলেছেন বিশেষ করে অপারেশন উত্তরণের কথা। ৫৭০টি সামরিক ছাউনি বলা হয় বোধ হয়, ৫৭০টি চৌকি ছিলো, তার মধ্যে ২০০ চৌকি উঠিয়ে নিয়ে আবার দেখা গেলো ১৫০ চৌকি অতিরিক্ত বসানো হয়েছে, তাহলে কী হলো? আমরা বলছি ধীরে ধীরে সেনাশাসন প্রত্যাহার করবো, কিন্তু তার বাস্তবায়নটা আসলে কী হচ্ছে? আমার মনে হয় যে, উপরিতলার অনেক উন্নয়ন হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলে সেটা দেখা যায়– বাইরের রাস্তা-ঘাট, দালান-কোটা, স্কুল-কলেজ, অনেক। কিন্তু আসলে যে জিনিসটি দরকার ছিলো, শান্তিচুক্তির মূল জায়গা– পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ–এর সবকিছুর একটা সমন্বয় করে প্রশাসনটি স্থানীয়দের হাতে, আদিবাসীদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া।

সেটা আজও হয়নি, বিশ বছর ধরে আমরা সেটার প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আমাদের সেই প্রতীক্ষা এখন হতাশায় রূপান্তরিত হয়েছে।

> ৫৭০টি সামরিক ছাউনি বলা হয় বোধ হয়, ৫৭০টি চৌকি ছিলো, তার মধ্যে ২০০ চৌকি উঠিয়ে নিয়ে আবার দেখা গেলো ১৫০ চৌকি অতিরিক্ত বসানো হয়েছে, তাহলে কী হলো? আমরা বলছি ধীরে ধীরে সেনাশাসন প্রত্যাহার করবো, কিন্তু তার বাস্তবায়নটা আসলে কী হচ্ছে? আমার মনে হয় যে, উপরিতলার অনেক উন্নয়ন হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলে সেটা দেখা যায়– বাইরের রাস্তা-ঘাট, দালান-কোটা, স্কুল-কলেজ, অনেক। কিন্তু আসলে যে জিনিসটি দরকার ছিলো, শান্তিচুক্তির মূল জায়গা– পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ–এর সবকিছুর একটা সমন্বয় করে প্রশাসনটি স্থানীয়দের হাতে, আদিবাসীদের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া। সেটা আজও হয়নি, বিশ বছর ধরে আমরা সেটার প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আমাদের সেই প্রতীক্ষা এখন হতাশায় রূপান্তরিত হয়েছে।

ভূমি সমস্যার কথা বারবার এসেছে, সেখানে নতুন কিছু বলব না। আমরা বলছি যে, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন হয়ে গেছে প্রায় সিংহভাগ। সেটা যে বাস্তবায়ন হয়নি তার একটা উদাহরণ আমি দিই। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি তৈরি করা হয়। সেই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার কথা। পার্বত্য চুক্তির ৩৩(খ) ধারায় মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার কথা আছে। সরকার তারই লক্ষে একটি কমিটি গঠন করে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৩ থেকে শুরু করে ২০১৭-তে এসে প্রথম পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হলো। এখন পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার পরে বলা হলো যে, এটা কে পড়াবে? প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় বললো যে, এটা আমাদের দায়িত্ব না। এটা পড়ানোর জন্য যারা শিক্ষক নেবে তারা তাদের আলাদা ট্রেনিং করবে। টেক্সটবুক বোর্ড বললো, আমরা পাঠ্যপুস্তক তৈরি করে দিয়েছি। এরপর মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, এটা বাস্তবায়ন করতে হবে। দু'বছর ধরে জরীপ করে দেখা হয়নি কতজন শিক্ষক আছেন আদিবাসীদের, কতজন ভাষা জানেন, কতটা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত ২০১৭ সালে বই গেলো যেখানে চাকমা জনগোষ্ঠী সেখানে মারমা ভাষার বই গেলো, যেখানে মারমা জনগোষ্ঠী সেখানে ত্রিপুরা ভাষার বই গেলো। এভাবে দেখা গেলো যে, ২০১৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১৭ সাল, ২০১৮ সাল চলে আসছে, কিন্তু আমাদের এই একটা ছোট্ট জিনিস যেটা চাইলেই সরকার দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারতো সেটা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

এখন যদি দাবি করা হয় যে, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন হয়েছে! আমি এই কমিটির সঙ্গে কাজ করতে যেয়ে দেখেছি, আগামী তিন বছরেও, চার বছরেও এটা বাস্তবায়ন হবে কিনা সন্দেহ আছে। কারণ একটা চুক্তি বাস্তবায়ন করতে গেলে তার অনেকগুলো ধাপ, অনেকগুলো পর্যায় থাকে। একটি পর্যায় বাস্তবায়ন করার পরে অবশিষ্টগুলো বাস্তবায়ন না করে আমি বললাম বাস্তবায়ন হয়েছে–সেটা কখনও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নয়।

সবশেষে যে কথাটা বলতে চাই, আমাদের আজকের যে বৃহত্তর বাঙালি সমাজ, সেই বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে আদিবাসীদেরকে বিশেষ করে পাহাড়িদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে। ভীতির একটা সংস্কৃতি চালু করা হয়েছে পাহাড়িদের মধ্যে আর বাঙালিদের মধ্যে চালু করা হয়েছে আধিপত্যের সংস্কৃতি–যে আমরা বড়, তোমরা ছোট। এই মানসিকতা থেকে যদি বেরিয়ে আসা না যায় তাহলে আসলে বৃহত্তর বাঙালি যেমন ভুল বুঝবে, সেই একইভাবে রাষ্ট্র বা সরকারও শান্তিচুক্তি বা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার জালে আরো জড়িয়ে পড়বে। আর শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রিয় সন্তুদা যে কথাটা বলেছেন, 'আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।' আমরা হয়তো বা আবার কি সেই পুরনো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখবো? আমরা বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ, আমরা সেই সংঘর্ষ দেখতে চাই না। আমরা চাই সরকার আন্তরিক হোক। এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করুক এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করুক। আর যতদিন পর্যন্ত না এই চুক্তি বাস্তবায়ন হবে আমরা বাংলাদেশের আদিবাসীদের, পাহাড়িদের পক্ষে আছি, থাকবো। ধন্যবাদ সবাইকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীকেই উদ্যোগী হতে হবে

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা, গণস্বাস্থ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটার সাথে বহু বছর ধরে আমি একটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছি। তারা যখন জীবনের মায়া ছেড়ে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়েছিল আমি সেখানে যেয়েও তাদের সাথে দেখা করেছিলাম। এটা হয়ত জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার মনে আছে। তাদের সংগ্রামকালেও তাদের সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলাম। অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। তাই খুব সংক্ষেপে তিনটি কথাই বলতে চাই।

প্রথমত আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, উনি একটা উদ্যোগ নিয়ে ১৯৯৭ সালে চুক্তিটা করেছিলেন। যেদিন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেদিন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিলাম। সেই আনন্দ, উল্লাস, ভয়-ভীতি পর্যবেক্ষণ করেছি। আজকে দুঃখের বিষয়, দুই দশক পরেও আমরা যে কথা দিয়েছি সে কথাগুলি পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় নাই। এটাকে পূর্ণতা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরই। যেহেতু আজকে দু'দশকে এই অবস্থা! আজকে আমি সন্তু লারমার বক্তব্য শুনছিলাম, তাঁর দুঃখ, বেদনা, তাঁর চেহারায় ক্ষোভ, সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছি। নতুন করে এটা সহমর্মিতা নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এর একটি কারণ হলো, হয়তোবা সবার পছন্দ হবে না সেই যুক্তিটা আনতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে যেসব বাঙালি আজকে সেখানে অবস্থান নিয়েছে তারা ভাগ্যের অন্বেষণে গিয়েছে, তারা খুব উন্নত বা সুখে ছিলেন এমন বাঙালি নয়, তারাও এক হিসেবে অনুন্নত সম্প্রদায়। তবে এই বলে তারা যে আবার পাহাড়িদের উপরে আরেকটা শাসক বা নিপীড়কের ভূমিকায় বা তার সহায়ক শক্তি হবে সেটা কোন মতে কাম্য হতে পারে না।

এজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে দুটি–এই পুনর্মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলিতে সুষ্ঠু নির্বাচন প্রয়োজন এবং যাদের রক্ষার জন্য এই চুক্তি, তাদের লোকেরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আসতে পারে, অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা দরকার। সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। দ্বিতীয়ত যে কথাটা জ্যোতিরিন্দ্র লারমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন– আমরা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ সৃষ্টি করছি, অথচ এখানে যারা পড়তে আসবে তাদের ব্যবস্থা নেই। আমি বহু বছর আগে থানচিতে একটা হোস্টেল তৈরি করছিলাম। বলা হলো– তুমি তো হোস্টেলের বিরুদ্ধে। আমি বললাম, দেখ, একটি প্রাইমারী স্কুলের বাচ্চাকে দুই/তিন কিলোমিটার হাঁটতে হয়, আমাদের সমতলের মত না। সুতরাং এদের জন্য যদি আজকে হোস্টেলের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে এরা উচ্চদিকে যেতে পারবে না। ঠিক একইভাবে তাদের ক্ষেত্রেও শিক্ষার কোটা দিলে হবে না। এই কোটা প্রথাটারও আবার পুনর্মূল্যায়ন দরকার। আজকে সেখানে বার/তেরোটা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী আছেন তাদের সবার উন্নয়ন এক মাত্রায় নয়। আজকে চাকমাদের যে অবস্থা, ত্রিপুরার যে অবস্থা, তা চাক বা বমদের একই অবস্থা নয়। আমি কোটা প্রথাটাকে পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমার মতে, প্রথম তিনটা বাদ দিলে অর্থাৎ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরারা ছাড়া বাকি যে দশটি আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে কোটা দরকার। তাদের কোটার মানদন্ড হবে সেই জিপিএ ফাইভ পাওয়া না, তারা পাশ হলেই তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে-কলেজে আসার সুযোগ করে দিতে হবে, তাকে মেডিকেল কলেজে আসার সুযোগ করে দিতে হবে। সে কী ডিভিশন পেয়েছে সেটা বড় কথা হবে না। তার লক্ষ্য হবে সে পড়তে চায় কি না। তাকে উৎসাহিত করা যায় কি না। তা নাহলে এটা শুধু এই কোটা প্রথা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে খুব বেশি লাভ হচ্ছে না।

সন্তু লারমাও একটা জায়গায় বলেছেন যে, অনেক জায়গা বাঙালিরাই নিয়ে নিচ্ছে। আজকে এই ভূমি বিষয়ের উপর যদি নজর দেওয়া যায়। আজকে আমার শেষ আবেদন থাকবে, প্রধানমন্ত্রীকেই আবার উদ্যোগী হতে হবে এবং এটাকে নিয়ে আর আমাদের অস্ত্রের ঝনঝনানির প্রয়োজন নাই। আবার পুনরায় পাহাড়ি বন্ধুদের কষ্ট

> আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, উনি একটা উদ্যোগ নিয়ে ১৯৯৭ সালে চুক্তিটা করেছিলেন। যেদিন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেদিন আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিলাম। সেই আনন্দ, উল্লাস, ভয়-ভীতি পর্যবেক্ষণ করেছি। আজকে দুঃখের বিষয়, দুই দশক পরেও আমরা যে কথা দিয়েছি সে কথাগুলি পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় নাই। এটাকে পূর্ণতা দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরই।

দেওয়ারও কোন দরকার নেই। আমরা নতুনভাবে একত্রিত থাকতে চাই। তারপর ধর্মীয় প্রভাবটা আমাকে ব্যথিত করে। এখানে আমরা যেমন অতীতে পাদ্রীদেরকে চাইনি, ঠিক একইভাবে অনুচিত হবে মুসলমান ধর্মযাজকরা সেখানে ধর্ম প্রচার করুক। যার যার ধর্ম তাকে স্বাধীনভাবে পালনের সুযোগ-সুবিধাটা নিশ্চিত করাই সরকারের দায়িত্ব।

শেষ কথাটা বলতে চাই, অবশ্যই সামরিক ছাউনির সংখ্যাটা কমাতে হবে। ক্যান্টনমেন্ট কমবে কিনা সেটা আমি জানি না। কেননা আজকে আমরা আন্তর্জাতিক সমস্যা যেভাবে দেখছি, মায়ানমার, চীনও আমাদের সাথে পুরোপুরি বন্ধুর কাজ করে নাই। স্বার্থের সন্ধানে মানুষ ভিন্ন চরিত্র ধারণ করে। এজন্য আমি জানি না, এসব জাতীয়ভাবে ব্যাপক আলোচনা প্রয়োজন, খোলামনে আলোচনা প্রয়োজন। তবে একটা জিনিস আবার বলতে চাই, নিশ্চিত করতে হবে পাহাড়ি আর আমরা পাশাপাশি একই দেশের নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার। কেবল সমানাধিকার দিলে হবে না, আমি আবারও বলতে চাই, তাদেরকে একটা অগ্রাধিকারের সুযোগ না করে দিলে সমতা অর্জন হবে না। সবাইকে ধন্যবাদ।

কেবল আদিবাসীরাই অধিকার বঞ্চিত নয়, মুক্তিযুদ্ধের ধারা ও চেতনাও ভূলুণ্ঠিত

মুজাহেদুল ইসলাম সেলিম, সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

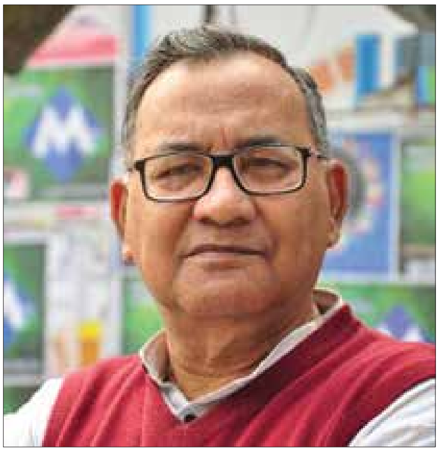

ধন্যবাদ, শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং আমাদের সকলের অতি প্রিয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, আমাদের সন্তু লারমা, আলোচকবৃন্দ, সুধীমণ্ডলী এবং বন্ধুগণ। আমি প্রত্যেক বছরই এই দিনটায় জেএসএস আয়োজিত অনুষ্ঠানে থাকার চেষ্টা করি। আজকে সবটা একটা অখণ্ড আলোচনা উপস্থাপন না করে বিক্ষিপ্তভাবে দুয়েকটা প্রসঙ্গ বলবো। এখানে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে আমাদের সকলের কাছে পরিষ্কার যে, পরিস্থিতি গুরুতর এবং সমস্ত বাঙালি জনগণের জন্য একটা আতঙ্কজনক, ক্ষোভের পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আমরা অতিবাহিত করছি। পার্বত্য সমস্যা, আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা দেখানো হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে। যখন নাকি আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান রচনা করা হয় তখন কমিউনিস্ট পার্টি এই খসড়া সংবিধানের কয়েকটা বিধানের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল, আমি নিজেও মিছিল করেছিলাম এবং তার ভেতরে নারী আসনের সরাসরি ভোটের প্রসঙ্গ ছিলো।

আরেকটা ছিলো যে, আমরা বাংলাদেশের নাগরিককে কেবল বাঙালি বলে যে পরিচয় দেওয়া হয়েছিল– সেই জায়গাটা আমরা আপত্তি করেছিলাম। বাঙালি এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী নিয়েই আমাদের দেশ গঠিত। আমাদের কথা তখন শোনা হয়নি। এমনকি বঙ্গবন্ধুও সম্ভবত রাঙ্গামাটিতে যেয়ে একটা সভায় বলেছিলেন, সবাই বাঙালি হয়ে যাও, তা না হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হবে। পরে অবশ্য তিনি মৃত্যুর আগে অবস্থাটা একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন, সেরকম লক্ষণও দেখা যায়। সুতরাং এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা নীতিগত-আদর্শগত প্রশ্ন হিসেবে সবসময় আমরা দেখে এসেছি।

কমপিটিশন করে বুর্জোয়া দলের নেতারা বলে যে, পার্বত্য এলাকার লোকদেরকে, আদিবাসীদেরকে আমরা বেশি অধিকার দিয়েছি। তার জবাবে আমি সবসময় বলে এসেছি যে, আদিবাসীদের অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে আপনার কী অধিকার আছে? বরঞ্চ আদিবাসীরা বলতে পারে যে, আমরা আমাদের সম্মিলিত যৌথ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে কতটুকু অধিকার দিলাম? সুতরাং এটা দেওয়া, না দেওয়া, দান-খয়রাতের বিষয় নয়। এইটা হলো একটা অধিকারের বিষয়, যেটা আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে যদি একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষমতার কাঠামোর ভেতরে আপনি একটা দেশকে পরিচালনা করতে চান।

দ্বিতীয়ত কথাগুলো একটু অন্যরকম শোনাতে পারে, তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে, সহজ বাংলায় বললে মানুষ বোঝে যে ভাষা–নিয়তের সমস্যা। পার্বত্য চুক্তি করা হয়েছে, আজকেও বিজ্ঞাপনে দেখলাম, ‘পার্বত্য শান্তিচুক্তি’ বলা হয়েছে। শান্তিচুক্তি বলার অনেকগুলো কারণের ভেতরে অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে যে, এরকম একটা চুক্তি কয়েকদিন আগে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারেও কিন্তু মায়ানমারের সঙ্গে করা হলো এবং রোহিঙ্গাদের জন্য অসাধারণ একটা বদান্যতা সরকারের পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এইবার যখন এই সমস্যাটা শুরু হয়, তখন কুড়ি দিন পরে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, ‘আমরা একটা

]

রেহিঙ্গাকেও ঢুকতে দেবো না' এবং আমাদের সেনাবাহিনী ২০০ জন রোহিঙ্গাকে পুশব্যাক করতে সক্ষম হয়েছে। সেই টোনটা হঠাৎ চেঞ্জ হয়ে গেলো। পার্বত্য চুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, 'শান্তি' শব্দটি যোগ করা এবং এটার আগে-পরে যে প্রচারণা তা থেকে অনেক মানুষের মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, আদিবাসীদের প্রতি সহানুভূতির কারণে বা রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভুতির কারণে এইসব চুক্তি করা হয় না, এইসব চুক্তি করা হয় নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায় কিনা–এইটার প্রয়োজনে। সেরকম প্রচার-প্রচারণা আপনারা কিন্তু শুনে থাকবেন নিশ্চয়ই।

এখন এখান থেকে যদি ঘটনাবলীর সূত্রপাত হয়, তাহলে পরে গুরুতর বিপদজনক পরিস্থিতি হবে। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আমি বলতে চাই, এটা প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে যে, আপনি চুক্তি করে আসলেন, বললেন যে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিয়ে যাবে। যদি ফেরতই নিয়ে যায় তাহলে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে নোয়াখালীর চরে নূতন করে পুসর্বাসনের কেন আপনি ব্যবস্থা করছেন? এই টাকা তো অপচয় হয়ে যাবে। রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার জন্য চুক্তি করেছেন। সুতরাং যে চুক্তি করেছেন রোহিঙ্গাদের নিশ্চয়ই সবাইকে অতিশীঘ্রই ফেরত নেয়া হবে না এবং তাদেরকে থাকার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে আপনার নোয়াখালীর চরে একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। আমি এখানে বলতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারকে, আপনারা রোহিঙ্গাদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, দরকার হলে দ্বিপাক্ষিক শুধু না, বহুপাক্ষিক পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করে এই ব্যাপারে একটা সমাধানের চেষ্টা করেন। আর নোয়াখালীতে যদি রোহিঙ্গ্যাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করার মত সামর্থ আমাদের থাকে তাহলে পার্বত্য এলাকায় যেসব বাঙালি সেটেলারদেরকে জিয়াউর রহমান পাঠিয়েছিলো তাদেরকেও খুব আরামের সঙ্গে ঐখানে নিয়ে রিসেটল করার ব্যবস্থা করেন, তাহলে পরে একটা সমস্যার সমাধান হবে।

সমস্যার উৎপত্তির আরেকটা গোড়া হচ্ছে, এখানে কমরেড সন্তু লারমা বলেছেন যে, চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রয়োজনের কথা, আমি সাড়ে ষোলো আনা তাঁর সঙ্গে একমত এবং এটার জন্য সহযোগিতা চেয়েছেন, আমরা পরিপূর্ণভাবে সেই সহযোগিতা দেবো। সমস্যার গোড়াটা হলো কোন জায়গায়? সমস্যার গোড়াটা হলো এই জায়গায়– আন্দোলন যদি করতে হয় এবারের আন্দোলন কেবল আদিবাসী-পাহাড়িদের আন্দোলন হবে না, আমি ঘোষণা করছি– এবারের আন্দোলন সমস্ত বাঙালি-পাহাড়ি-আদিবাসী জাতির সম্মিলিত আন্দোলন হবে। যাই করতে হয়, আপনারা অসহযোগ করেন বা অন্য যেসব শব্দ এখানে উচ্চারিত হয়েছে, আমাদের সবাই মিলে করতে হবে। কেননা কেবল আদিবাসীরাই আজকে অধিকার বঞ্চিত নয়, আজকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ধারা ও চেতনা আক্রান্ত, পরিত্যক্ত এবং ধুলায় ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ছিল না, এটা ছিল জাতীয় মুক্তির আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূলনীতি হলো প্রত্যেকটা জাতির স্বাধীন বিকাশের অধিকার এবং তার ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রগঠন হতে তারা কীভাবে থাকবে সেই ব্যাপারটা নির্ধারণ করার তার পরিপূর্ণ অধিকার।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হলো একটা ধারা, একটা চিন্তাধারা। আর ঔপনিবেশিক চিন্তা ও ব্যবস্থা হলো সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, কেবলমাত্র চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিত্যক্ত হয়েছে সেই কারণে নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, গণতন্ত্রের জায়গায় বলে শেষ করা যাবে না এবং সরকারই স্বীকার করছে যে, আগে উন্নয়ন তারপরে গণতন্ত্র। এমন উন্নয়ন যেখানে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, অল্প কিছু লোক টাকা বানায় এবং বৈষম্য দিনের পর দিন বাড়ছে। বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে আমাদের দেশ জিম্মী হয়ে আছে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য পরিত্যাগ করে এখন একটা মুক্তবাজার অর্থনীতির ভেতরে চলছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভেতরে আমাদের দেশকে নিয়ে আসা হয়েছে–সেইটার বিরুদ্ধে লড়াই, সমস্ত জনগণের বৃহত্তর লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের সঙ্গে আদিবাসীদের লড়াইকে সম্পৃক্ত করে একটা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে আমরা কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে পারবো না।

আর নোয়াখালীতে যদি রোহিঙ্গ্যাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করার মত সামর্থ্য আমাদের থাকে তাহলে পার্বত্য এলাকায় যেসব বাঙালি সেটেলারদেরকে জিয়াউর রহমান পাঠিয়েছিলো তাদেরকেও খুব আরামের সঙ্গে ঐখানে নিয়ে রিসেটল করার ব্যবস্থা করেন, তাহলে পরে একটা সমস্যার সমাধান হবে।

আমি একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাই। কথাগুলো কারো কাছে একটু অন্যভাবে লাগতে পারে। তারপরও আমি বলবো, এটা খালি ওনার ব্যক্তিগত ত্রুটির ব্যাপার না, এটা হলো শাসকদলের শ্রেণি-চরিত্রের ব্যাপার। একসময় আওয়ামীলীগ ছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দল, স্কুল মাস্টার, উকিল সাহেব, তারাই জেলা পর্যায়ে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ছিল নেতৃত্ব এবং কন্ট্রোলে। এখন তার শ্রেণি চরিত্র বদলে গেছে। এখন এটা হয়ে গেছে, লুটেরা-ধনিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দল এবং রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী হয়েছে, ব্যবসায়ীরা আওয়ামীলীগে যোগদান করে আওয়ামীলীগের শীর্ষ আসন এবং আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষায় পার্লামেন্টে শতকরা আশি জন যদি ব্যবসায়ী হয় তাহলে পরে জনগণের স্বার্থে আইন হবে কীভাবে! এগুলো তো তাদেরই কথা। সুতরাং আমাদের এখানে হলো মৌলিক সমস্যা।

জাতিসমস্যা সমাধান করার জন্য রুশ বিপ্লব হয়েছে। এই বছর সেই রুশ বিপ্লব, মহান অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষ পালন করা হয়েছে, সেটা কিন্তু আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে। লেনিনের বলশেভিকরা

ক্ষমতা দখল করার পর সবচেয়ে প্রথম দিকের যে ডিক্রীগুলো জারী করা হয়েছিলো তার ভেতরে অন্যতম একটা ডিক্রী ছিলো সমস্ত জাতির তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান করা হয়েছিল জার শাসিত রাশিয়ার সমস্ত জাতিগুলোর ক্ষেত্রে। এটাই হল একমাত্র সমাধানের সঠিক পথ। আজকে আমাদের ক্ষেত্রেও আমাদের আন্দোলনটাকে মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় মুক্তির ধারায় আবার ফিরিয়ে এনে আমাদের অগ্রগতি যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে পরে সেটার মাধ্যমে সমস্ত বাঙালি জাতি এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসীসহ তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সেই বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। সুতরাং আমি এখানে যুক্ত করে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরে আমরা করেছিলাম, সেই মুক্তিযুদ্ধ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধের নবপর্বের নূতন ধারা আবার রচনা করার সময় এসে গেছে। সমস্ত বাঙালি জাতিকে এবং আদিবাসীদেরকে আমি সেই আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

প্রশাসনের ভেতরে কিছু লোক আছেন যারা চুক্তি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছেন

নুরুর রহমান সেলিম, প্রেসিডিয়াম সদস্য, গণতন্ত্রী পার্টি

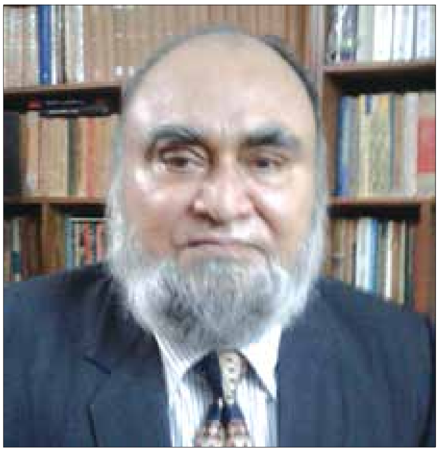

ধন্যবাদ, আজকের এই আলোচনা সভার শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য, উপস্থিত আমাদের প্রিয় সন্তু লারমা দাদাসহ সুধীবৃন্দ।

আজকে একটি আনন্দের দিন। বিশ বছর আগে পাহাড়ি জনগণের পক্ষে আমাদের দাদা সন্তু লারমা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে চুক্তির মাধ্যমে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন সেজন্যে প্রথমেই তাদেরকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। কিন্তু বিশ বছর পর আমরা যখন সেই চুক্তি বাস্তবায়নের একটি পাঠ শুনলাম, আদিবাসীদের পক্ষে শুরুতে যে সূচনা বক্তব্য উনি রাখলেন, সেটা আমাদের জন্য একটা দুঃখজনক। আমরা মনে করি, যারা চুক্তি করেছিলেন তাদেরই দায়িত্ব এই চুক্তিটাকে বাস্তবায়ন করার। কোন জায়গায় এসে ঠেকেছে এবং কেন– সেই বিষয়গুলোও আমরা যার যার মত করে বললাম। সত্যিকার অর্থে যে একটি সংকট সেটা একটু আগে মিজানুর রহমান সাহেব বললেন যে, প্রশাসনের ভেতরে কিছু লোক আছে যারা কোনভাবেই এই চুক্তিকে বাস্তবায়ন করতে দিতে চায় না এবং বাধাগ্রস্ত করছে। বহু ভাষাভাষি আদিবাসীদের ভূমি, শিক্ষা, কৃষি, সংস্কৃতিসহ জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে এই শান্তিচুক্তি হয়েছিল।

আজকে যে শিশুটি ভূমিষ্ট হচ্ছে তার জ্ঞান হওয়ার পরবর্তী সে দেখতে পাচ্ছে যে, একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি সেখানে। সেখানে সেনাবাহিনীর ড্রেস দেখলেই তারা আতঙ্কিত হয়, সেটেলারদের দেখলেই আতঙ্কিত হয়। তারা নিজ মাতৃভাষায় লেখাপড়া করতে পারছে না। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, সরকার একটা নীতি গ্রহণ করলেও মাতৃভাষায় লেখাপড়া করার জন্য আজ পর্যন্ত সেই নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আজও সেই নারী-শিশু নির্যাতনের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই মাঝে মধ্যে, পত্রিকায় দেখি, আমরা দুঃখ পাই সেইসব নিউজে। আমরা মনে করি যে, সেটা শুধু পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না, সারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই চিত্র। আমরা সাতক্ষীরায় একটি নাটককে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় বা চিরির বন্দরে ঘটে। বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রতিনিয়ত আমরা পত্রিকা খুললে দেখতে পাই যে, মন্দির অথবা প্রতিমা ভাঙছে, সে ব্যাপারে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিলেও আজ পর্যন্ত সেগুলোর বিচার হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সন্তু দাদা বললেন। আর সকলেই বললেন যে, একটা প্রধান বিষয় হল ভূমি। ভূমি অধিকার যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবায়িত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে আমরা ধরতে পারব না। সে কারণে সকলেরই প্রধান কাজই হবে এই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সরকারের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছে তাদেরকে নিয়ে, সংসদে যারা আছেন তাদের কাছে এই দাবিটা পৌঁছিয়ে দেয়া, তাদেরকে জানানো। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা। সেই সাথে নারী-শিশুদের যে নিরাপত্তার কথা আমাদের সংবিধানে আছে, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, জাতীয়, রাজনৈতিক অধিকারের কথা আছে তা রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

অতএব রাষ্ট্রকে এগুলোর দায়িত্ব নিতে হবে এবং সেখানে যাতে আর নারী-শিশু নির্যাতিত না হয়, তারা যাতে নির্বিঘ্নে বড় হতে পারে এবং তারা শিক্ষায়-দীক্ষায় যাতে আরো সমৃদ্ধ হতে পারে সেই বিষয় দেখতে হবে।

আর কৃষি বিষয়ে আমি একটু বলতে চাই। সেটা হলো যাতে সেখানকার উৎপাদিত ফসল বা ফল, সেই আনারসই হোক বা ধানই হোক, সেটা বাজারজাত করার সরকারি ব্যবস্থাপনা সেখানে নাই, সেকারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বাজারজাত করারও একটা উদ্যোগ নেয়া দরকার। আমার মনে হয়, জনসংহতি সমিতির নেতারা ভাববেন, কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, সংস্কার ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে। এভাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যারা যুক্ত তাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করার বিষয়টিকেও তারা সামনে আনবেন। একই সাথে পার্বত্য চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হয় সেই দাবি জানাচ্ছি এবং আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

> ”
>
> সেটা শুধু পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না, সারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই চিত্র। আমরা সাতক্ষীরায় একটি নাটককে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় বা চিরির বন্দরে ঘটে। বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রতিনিয়ত আমরা পত্রিকা খুললে দেখতে পাই যে, মন্দির অথবা প্রতিমা ভাঙছে, সে ব্যাপারে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নিলেও আজ পর্যন্ত সেগুলোর বিচার হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

যারা রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করেন, তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার

নুমান আহমেদ খান, নির্বাহী পরিচালক, আইইডি

উপস্থিত সুধীজন, আলোচকবৃন্দ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ। আজকে আসলে আনন্দের দিন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আলোচনার সূচনা পর্বেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে চুক্তি হয়েছিলো দুই পক্ষের মধ্যে, রাষ্ট্র বনাম পাহাড়ি জনগণের পক্ষে সন্তু লারমা, সেই সন্তু লারমা কিন্তু আজকে হতাশায়, ক্ষুব্ধতায় কথা বলেছেন এবং এমন কিছু ভাষা ব্যবহার করেছেন, যে ভাষা যন্ত্রণার ভাষা, যে ভাষা ১৯৭১ সালে আমাদেরকেও ব্যবহার করতে হয়েছিলো।

অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেছেন, রাষ্ট্রে যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী অবস্থা তা তিনি তুলে ধরেছেন। আমরা সন্তু লারমার বক্তব্যে বুঝতে পেরেছি, শঠতা কী রকমভাবে আজকে শুধু পাহাড়ে না, বাংলাদেশের রাজনীতিকে গ্রাস করেছে। আজকে সরকার-রাষ্ট্র যখন চায় তখন এক মাসের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধ্যাদেশ বা আইন জারী হয়, বিধিমালা প্রণয়ন হয়, এক বছরের মধ্যে সব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অথচ আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ১৭/১৮ বছর ধরে এখনও একটা ভাড়া বাসায় আছে, যেটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়েও দুর্বল অবস্থায় আছে। রাষ্ট্র যদি চায় তাহলে কী হতে পারে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি। কিন্তু আজকে এই যে মিথ্যার রাজনীতি, শঠতার রাজনীতি রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকেছে সেটা রাষ্ট্র পরিচালনায়, আমার সমাজব্যবস্থায়, আমার পরিবারেও আসছে।

এখানে বিভিন্ন বক্তারা বলেছেন, পাহাড়ের আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন না, আমি একমত। আমি আরো উল্লেখ করতে চাই, সেটার সমাধান করতে হলে আমাদের শঠতার রাজনীতি, মিথ্যার রাজনীতি পরিহার করতে হবে। সেটা করতে হলে আমার শিক্ষা ব্যবস্থায়, আমার রাজনীতিতে, আমার সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে, তার জন্য রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যারা নাগরিক সমাজ আছি তাদের

পাঠ্যক্রমেও আমরা দেখতে পাই সাম্প্রদায়িকীকরণ, সামরিকীকরণ, একদলীয়করণ।

> যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন, যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন আমাদের সুধী সমাজের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা বলতে চাই, শঠতার রাজনীতি কিন্তু আইয়ুব খানও করেছিলেন, ইয়াহিয়া খানও করেছিলেন, তাদের পরিণতি কিন্তু খুব ভালো হয়নাই। সেই পরিণতি আপনাদের জন্য ভালো না, আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য ভালো না। ভুট্টো শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভুট্টোর পরিণতি কিন্তু আমরা জানি। কাজেই সেই শঠতার রাজনীতি থেকে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিলো– সকল মানুষের, সকল ধর্মের, সকল ভাষার এবং সকল লিঙ্গের সমমর্যাদার ভিত্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় আছেন, যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন আমাদের সুধী সমাজের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা বলতে চাই, শঠতার রাজনীতি কিন্তু আইয়ুব খানও করেছিলেন, ইয়াহিয়া খানও করেছিলেন, তাদের পরিণতি কিন্তু খুব ভালো হয়নাই। সেই পরিণতি আপনাদের জন্য ভালো না, আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য ভালো না। ভুট্টো শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভুট্টোর পরিণতি কিন্তু আমরা জানি। কাজেই সেই শঠতার রাজনীতি থেকে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিলো– সকল মানুষের, সকল ধর্মের, সকল ভাষার এবং সকল লিঙ্গের সমমর্যাদার ভিত্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। এখানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ আছেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আছেন, আলোচনা শুনেছেন। আমি এটুকুই বলতে চাই, আমাদের সমাজের যেরকম দায়িত্ব আছে, নাগরিক সমাজের যেমন দায়িত্ব আছে, গণমাধ্যমের যেমন বিশেষ ভূমিকা আছে, এখানে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে রোবায়েত ফেরদৌস এবং মোর্তজাসহ অন্যরা সেই শঠতার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এবং মিথ্যা প্রচারণা যে কীভাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আচ্ছন্ন করে আছে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। কাজেই গণমাধ্যমকে আমি আহ্বান জানাবো, এই শঠতার রাজনীতিটাকে পরিহার করে সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধারায় ফিরে আসার একটা প্রক্রিয়ায় আপনারা উদ্যোগী ভূমিকা অতীতে যেমনি রেখেছিলেন, এখনও ভূমিকা রাখবেন।

পরিশেষে নাগরিক সমাজকে আমি এইটুকু আহ্বান জানাবো যে, পাহাড়ের জনগণের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখবেন না। এখানে যারা আছেন তারা বৈষম্যের শিকার ভাষার দিকে, ধর্মের দিকে, অধিকারের দিকে, সেই দিক লক্ষ্য রেখে সকলেরই দায়িত্ব আছে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করা। আর যারা প্রশাসনে আছেন, নিরাপত্তা বাহিনীতে আছেন, যারা রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করেন তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার। প্রফেসর মিজানুর রহমানের ভাষায় 'আমরা-তোমরা' পরিহার করে মানুষের সমাজ সৃষ্টিতে সকলের উদ্যোগ গ্রহণ করা, সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে এবং পাহাড়ের জনগণের, শোষিত মানুষের জনগণের অধিকার আদায়ে সবার সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি
আলোচনা সভা
২ ডিসেম্বর ২০১৭, শনিবার
এ এস মাহমুদ সেমিনার হল, ডেইলী স্টার ভবন, ঢাকা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমি

পার্বত্য এলাকার ভূমি বেদখলে এজেন্সীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, ডীন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধন্যবাদ সঞ্চালককে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভায় আজকে উপস্থিত আমাদের জনসংহতি সমিতির শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং এই আলোচনা সভার সভাপতি জনাব পংকজ ভট্টাচার্য এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমার প্রিয় আদিবাসী বোনেরা এবং ভাইয়েরা, আমি সবাইকে চুক্তির এই বিশ বছরে পদার্পণে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমরা অনেক ধরনের কথাবার্তা বলে ফেলেছি, আমি সেই বিষয়গুলিতে খুব বিশদ আলোচনায় যেতে চাই না। তবে এটা বলতে চাই যে, একটা চুক্তি হয়েছিলো বিশ বছর আগে, এখন আমার চুলেও পাক ধরেছে, তখন আমি যদিও খুব ছোট ছিলাম, সহকারী অধ্যাপক ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কথাটা হচ্ছে যে, চুক্তি যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিলো অর্থাৎ চুক্তি যেভাবে করা হয়েছিলো সেই চুক্তির ভিত্তি ছিলো, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা খুব সুন্দর করে সূচনা বক্তব্যে বলেছেন, আমাদের ১৯০০ সালের সিএইচটি রেগুলেশন আছে, চুক্তির অন্যতম ভিত্তি ছিল এই রেগুলেশন অর্থাৎ চুক্তিতে স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকার করে নেয়া হয়। আর চুক্তির সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ ছাড়া চুক্তি করা। আন্তর্জাতিকভাবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে যখন কোন ধরনের চুক্তি হয়, বিশেষ করে যখন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার চুক্তি করা হয় তখন কিন্তু একটা তৃতীয় পক্ষ থাকে। কিন্তু সেই সময়কার সরকার অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে বলতে পারি আওয়ামীলীগের সরকার এবং জনসংহতি সমিতি একসাথে এই চুক্তিটা করেছিলো, কোন তৃতীয় পক্ষ এখানে ছিল না।

সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে, ৭২টি বিষয়ের মধ্যে ৪৮টি বাস্তবায়িত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কথা হচ্ছে, কতগুলি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে কি হয় নাই তার থেকে বড় বিষয় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে গেছে, অর্থাৎ যে মৌলিক বিষয়গুলি বাস্তবায়িত না হওয়া। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন, সেগুলি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চুক্তির বাস্তবায়নের মূলে রয়েছে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে ভূমি সমস্যা এবং ২০০১ সালে ভূমি কমিশন আইন করা হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ভূমি কমিশন গঠন করা হয় বা অবকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এই ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো অনেক ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে। একজন সমাজ বিজ্ঞানের গবেষক হিসেবে বলবো যে, আইনটি বেশ আদিবাসীবান্ধব। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, যেটা আমাদের জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বক্তব্যেও পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে খাগড়াছড়িতে একটি মাত্র অফিস, বান্দরবানে কোন অফিস নেই, রাঙ্গামাটিতেও নেই, কমিশনের বাজেটের খুবই সীমাবদ্ধতা আছে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে।

আমরা জানি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনেক সদিচ্ছা আছে এবং আপনারা জানেন যে, বেইলী রোডের কাছাকাছি, অফিসার্স ক্লাবের পাশে পার্বত্য কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদের লারমা স্যারও ছিলেন। সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এই কমপ্লেক্সের জায়গাটি আমলারা দিতে চাননি অর্থাৎ এরকম একটি প্রাইম লোকেশনে পার্বত্য কমপ্লেক্স হতে পারে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সবসময় সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে, চুক্তির মধ্যে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা ছিলো। সেটা প্রত্যাহার করে আবার নতুন নতুন জায়গায় স্থাপনা, প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে যে ভূমি আছে সেনাক্যাম্পের নামে সেই ভূমির দখল, শুধু সেনাবাহিনী করছে তা না, তাদের সাথে এখন বিজিবিও যোগ দিয়েছে, তাদের সাথে এখন পুলিশও আছে, তাদের সাথে অন্যান্য এজেন্সীগুলো আছে, একটা খুব সুন্দর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যে কীভাবে আমরা পার্বত্য এলাকার ভূমিগুলো দখল করবো। একাধারে আমরা দেখছি যে, রাষ্ট্রের একটি অংশ যিনি কিনা সাংবিধানিক প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদিচ্ছা ব্যক্ত করছেন, তিনি সুন্দর একটি কমপ্লেক্স দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁরই রাষ্ট্রের অংশ কতগুলি জায়গায় বিপরীতভাবে তৎপর রয়েছেন। আমরা বলতে পারি, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এই যে অংশগুলি আছে তারা কিন্তু খুবই তৎপর থাকে। একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল অর্থাৎ এদের সাথে একটি ব্যবসায়িক শ্রেণি, ভূমি দখলকারী শ্রেণি ইত্যাদি শ্রেণির মধ্যে একটা আনহোলি এলায়েন্স (অনৈতিক আতাঁত) হয়। সেটি খুবই প্রকটভাবে তিন পার্বত্য জেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এখানে একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন আমার কলিগ ড. রোবায়েত ফেরদৌস যে, আমরা দেখছি সেখানে বহুত্ববাদ, বহুমাত্রিকতার একটা প্রতিফলন। অর্থাৎ আমরা যখনি বলছি যে, বাংলাদেশে বহুত্ববাদ নেই, তখনই আমরা অঙ্গুলী নির্দেশ করছি পার্বত্য

চট্টগ্রামের দিকে। সেখানে একটি সিভিল প্রশাসন আছে, সেখানে আদিবাসীদের নেতৃত্ব আছে, আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে, সেখানে তিনটি সার্কেল চীফ আছে, সেখানে আবার সেনাবাহিনীও আছে। অর্থাৎ কার নির্দেশে কীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে কথা। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা যেগুলি আন্তর্জাতিকভাবে আমরা দেখি, সেখানে একটা strong surveilance থাকে। আমরা যদি সেভেন সিস্টার্সের দিকে তাকাই, সেখানে তারা যতটুকু গণতন্ত্র চর্চা করতে পারে, অর্থাৎ সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে যে পার্লামেন্টগুলো আছে সেখানে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব থাকে। কিন্তু দুঃখজনক যে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কী পরিমাণ আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব করছেন তা আমরা দেখছি।

মোট কথা, চুক্তি বাস্তবায়ন কঠিন জায়গায় চলে গেছে। তার একটি বড় জায়গা হচ্ছে 'ট্যুরিজম'। আমি সম্প্রতি একটি থিসিস সুপারভাইজ করেছি। সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, পার্বত্য এলাকায় কোথায় ট্যুরিজম হবে, কীভাবে, কী পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হবে, কোন প্রক্রিয়ায় কাকে নিয়োগ দেওয়া হবে, সেটার সম্মুখভাবে থাকছে সেনাবাহিনী। আমরা যদি অন্যান্য জেলাগুলোতে দেখি, যেখানে ট্যুরিজম হচ্ছে সেখানে সার্কিট হাউস Renovate করার জন্য আমি সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছি না। গাছের তলায় সাদা, লাল রং করে ট্যুরিজম করছি না। কিন্তু পার্বত্য এলাকার ট্যুরিজমটা সেরকম হয়ে যাচ্ছে। সাজেক এলাকায় কখন কে ঢুকতে পারবে, বেরুতে পারবে তা সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। এটি আমাকে কেপ টাউনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। আমরা বলছি যে, ম্যান্ডেলা একটা খুব সুন্দর চুক্তি করেছেন। সেখানে মাইনরিটি শাসন করছে মেজরিটিকে। মেজরিটিরা এখনও কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। তারা যদি রাতে ঘরে না ফিরতে পারে তাহলে লোকাল থানায় রিপোর্ট করে বিশেষ করে ট্যুরিষ্টিক এলাকায় থেকে যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ধরনের মডেলই কি আমরা পার্বত্য এলাকায় নিয়ে আসছি কিনা ট্যুরিজমের নামে? পার্বত্য এলাকায় ভূমি কেন আমি নিতে পারবো না, আমি কেন ক্রয় করতে পারবো না, আমি কেন থাকতে পারবো না– এই মিথ আমাদের নীতি নির্ধারকরা তৈরি করে দিয়েছে এবং ক্লাসরুম পর্যন্ত চলে এসেছে। আমরা যখন এগুলো ক্লাসরুমে পড়াই, তখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন করে– কেন আমরা যেতে পারছি না, কেন আমরা থাকতে পারবো না। অর্থাৎ আমি আমার এডুকেশনের কারিকুলামের মধ্যে সেগুলো আনি নাই।

এখন আমি বড় দুটি জায়গার কথা বলতে চাই। একটি হচ্ছে শিক্ষার জায়গা। যেহেতু আমি এখন একটা দায়িত্ব পালন করছি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে। আমি বলতে চাই, পার্বত্য এলাকা থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট আসছে। Insignificantly, significant number of students getting chances to get in rolled in some of the leading universities. আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্যভাবে নিবেন না, একটি জাতিগোষ্ঠী থেকে বেশি আসছে, সেটা হচ্ছে চাকমা। তাহলে অন্যদের কী অবস্থা? ওখানে ১৩ থেকে ১৪টি জাতি আছে। বাঙালি বাদ দিলাম। তাহলে বাকিরা কোথায়? কোথায়

মোট কথা, চুক্তি বাস্তবায়ন কঠিন জায়গায় চলে গেছে। তার একটি বড় জায়গা হচ্ছে 'ট্যুরিজম'। আমি সম্প্রতি একটি থিসিস সুপারভাইজ করেছি। সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, পার্বত্য এলাকায় কোথায় ট্যুরিজম হবে, কীভাবে, কী পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হবে, কোন প্রক্রিয়ায় কাকে নিয়োগ দেওয়া হবে, সেটার সম্মুখভাবে থাকছে সেনাবাহিনী। আমরা যদি অন্যান্য জেলাগুলোতে দেখি, যেখানে ট্যুরিজম হচ্ছে সেখানে সার্কিট হাউস Renovate করার জন্য আমি সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছি না। গাছের তলায় সাদা, লাল রং করে ট্যুরিজম করছি না। কিন্তু পার্বত্য এলাকার ট্যুরিজমটা সেরকম হয়ে যাচ্ছে। সাজেক এলাকায় কখন কে ঢুকতে পারবে, বেরুতে পারবে তা সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। এটি আমাকে কেপ টাউনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। আমরা বলছি যে, ম্যান্ডেলা একটা খুব সুন্দর চুক্তি করেছেন। সেখানে মাইনরিটি শাসন করছে মেজরিটিকে। মেজরিটিরা এখনও কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। তারা যদি রাতে ঘরে না ফিরতে পারে তাহলে লোকাল থানায় রিপোর্ট করে বিশেষ করে ট্যুরিষ্টিক এলাকায় থেকে যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ সেই ধরনের মডেলই কি আমরা পার্বত্য এলাকায় নিয়ে আসছি কিনা ট্যুরিজমের নামে? পার্বত্য এলাকায় ভূমি কেন আমি নিতে পারবো না, আমি কেন ক্রয় করতে পারবো না, আমি কেন থাকতে পারবো না– এই মিথ আমাদের নীতি নির্ধারকরা তৈরি করে দিয়েছে এবং ক্লাসরুম পর্যন্ত চলে এসেছে। আমরা যখন এগুলো ক্লাসরুমে পড়াই, তখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন করে– কেন আমরা যেতে পারছি না, কেন আমরা থাকতে পারবো না। অর্থাৎ আমি আমার এডুকেশনের কারিকুলামের মধ্যে সেগুলো আনি নাই।

লুসাই, কোথায় পাংখো, কোথায় চাক, কোথায় মারমা? আমরা দেখছি, চাকমা, তারপরে মারমা, তারপরে ত্রিপুরা। আমি যে কয়টি অনুষদ আছে সেখানে আমরা দেখছি যে, ক্রমশই অন্যান্যরা হারিয়ে যাচ্ছে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ফাঁকে আপনারা নিজেদের ভেতরে যে কাজগুলি করা উচিত যেখানে স্কুল নেই, যেখানে কলেজ নেই, সেখানে কাজ করা। আমি একমত যে, উচ্চ শিক্ষার যে ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে, আমি মেডিকেল কলেজ বলছি, বিশ্ববিদ্যালয় বলছি– আমি যদি নীচের দিকে প্রাইমারি স্কুল-কলেজ ঠিক না করি তাহলে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র কারা হবে? সেখানে আমি অনেক বেশি বাঙালি স্টুডেন্টদের নিয়ে যাচ্ছি, আমি তাদেরকে রাজনীতিকরণ করছি। আমরা দেখছি যে, অনেক ধরনের বেসরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থারাও কাজ করছে। সেখানে একটি মধ্যবিত্তের বিকাশ হয়েছে। সেখান থেকেও আমরা দেখব যে, যদি কেউ গবেষণা করেন এই জিনিসটি চলে আসছে যে, একটি বা দুটি জাতিগোষ্ঠী প্রাধান্য পাচ্ছে, বাকিরা পাচ্ছে না। যেমন সমতলে, সঞ্জীব দ্রং রাগ করতে পারে, আমরা দেখছি যে, গারো স্টুডেন্টরা অনেক বেশি আসছে। বাকিরা কোথায়? সেখানে জনগোষ্ঠীর মধ্যকার যে সমস্যাটা, এটা আমি মনেকরি এই চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

আরেকটা বিষয় হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনে নারীরা যে ভূমিকা রেখেছিলো, তাদের কথা কিন্তু আমরা বলছি না। তাদের অবস্থা যে ক্রমশই প্রান্তিকীকরণের দিকে যাচ্ছে, ভূমি হারানোর ফলে যে উচ্ছেদ হয়ে তারা পার্লারে কাজ করতে চলে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক আদিবাসী নারী এখন চিটাগং-এর ইপিজেড বা চট্টগ্রামে গার্মেন্টসে কাজ করছে, ঢাকা পর্যন্ত তারা চলে আসছে, তাদের কথা বলছি না। এগুলো কিন্তু সব গবেষণারই ফলাফল। সেই যে তারা শহরে চলে আসছে, তাদের নিরাপত্তা, তাদের মজুরী, সেগুলোও কিন্তু দেখার বিষয়। এগুলো একটা বড় Broader Canvass-এ দেখার বিষয়।

আমরা রোহিঙ্গাদের বিষয়ে প্রচুর কথা বলেছি, এটা অবশ্যই যে রোহিঙ্গারা আমাদের Demographic, Political, Religious, সব ধরনের অবস্থার উপর একটা বিরূপ প্রভাব রাখবে। আমরা নাইক্ষ্যংছড়িতে দেখছি, সেখানে পাড়ার পর পাড়া রোহিঙ্গা অধ্যুষিত হয়ে গেছে, বান্দরবানে তারা চলে আসছে। চেহারার সাথে তাদের মিল আছে, কিন্তু যখন তারা কথা বলছে তখন বুঝা যাচ্ছে। এই জায়গাগুলো অত্যন্ত জটিল বলে আমি মনেকরি যে, প্রফেসর মিজান বলেছেন, এর সাথে অনেক বাঙালি সম্পৃক্ত হয়েছে।

আমরা প্রতি বছরই এখানে এসে বসি। আমি মনে করি, বড় আকারে এই ধরনের অনুষ্ঠান পার্বত্য এলাকায় করা উচিত। সরকারের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে করা উচিত, তারা শুনবেন, জানবেন আমরা কী বলছি। আমরা বছরে একবার দু'বার আসি, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়, আমরা কিছু লিখি, চলে যাই, তারপর হারিয়ে যায়। কীভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে আমরা ভূমিকা রাখতে পারি, আমরা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এখন আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। সবাইকে ধন্যবাদ, ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটির উপর সব বাহিনীর নজর পড়েছে

অধ্যাপক ড. নুর মোহাম্মদ তালুকদার

সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আমাদের সবার শ্রদ্ধাভাজন সন্তু লারমা, উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ। অনেক কথা হয়েছে, আমরা সন্তুদার কাছ থেকে তাঁর যে হতাশার কথাগুলো শুনেছি, তার পেছনে আশারও ব্যাপার আছে যে, শান্তিচুক্তি হয়েছিলো, এটাতো সরকার স্বীকার করে নিয়েছে। যে সমস্যা আছে, সেই সমস্যার কিছু সমাধানও হয়েছে। ১৯৯৭ সালে চুক্তি হয়েছে, আজকে ২০১৭ সাল, ২০ বছর। এই বিশ বছরে কিন্তু অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে।

আমি ভিন্ন আলোকে আলোচনাটা করতে চাই। আমি একজন কৃষিবিদ, সেই হিসেবে আমি জিনিসটাকে দেখি। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি অত্যন্ত উর্বর। কাজেই আজকে এই মাটির উপর দেশের সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সব বাহিনীর লোকেরই নজর পড়ে গেছে। কেউ বনায়ন করতে যেয়ে পাহাড় কিনছেন, ২৫ বিঘা কিনেন, সরকারের কাছ থেকে লীজ নেন, ৫০০ বিঘা দখল করে নেন। তারা দখল করেন কাদের জমি? ওখানে যারা আদিবাসী আছেন তাদের জমি ওনারা নিয়ে নেন। তাদের জমির উপর সকলের নজর পড়েছে। এই আদিবাসীরা কোথায় যাবে– সেটার চিন্তা নাই। এখন এই জমিগুলো যারা দখল করছেন, কিনছেন তারা কারা? তারা শাসকদলের আছেন, বিরোধী দলের আছেন, ডান দলের আছেন, বাম দলেরও আছেন। এই বাম দলও কিন্তু এর থেকে বাইরে নেই। কাজেই

রাজনীতিটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাজনীতিটাই চলে গেছে অন্যদের হাতে। ধনী লোকদের হাতে চলে গেছে। সেই আগের মত ত্যাগী লোক কেউ রাজনীতিতে নাই। ’৯৭ সালে যারা সরকারে ছিলেন সেই লোকরা হয়ত রাজনীতিতে এখন মরে গেছেন অনেকে, আর যারা আসছেন রাজনীতিতে, তারা হলেন সব ব্যবসায়ী, তারা সবাই হলেন কীভাবে রাতারাতি ধনী হওয়া যায়– এই ধান্ধায় আছেন।

> কাজেই আজকে এই মাটির উপর দেশের সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে সব বাহিনীর লোকেরই নজর পড়ে গেছে। কেউ বনায়ন করতে যেয়ে পাহাড় কিনছেন, ২৫ বিঘা কিনেন, সরকারের কাছ থেকে লীজ নেন, ৫০০ বিঘা দখল করে নেন। তারা দখল করেন কাদের জমি? ওখানে যারা আদিবাসী আছেন তাদের জমি ওনারা নিয়ে নেন। তাদের জমির উপর সকলের নজর পড়েছে। এই আদিবাসীরা কোথায় যাবে– সেটার চিন্তা নাই। এখন এই জমিগুলো যারা দখল করছেন, কিনছেন তারা কারা? তারা শাসকদলের আছেন, বিরোধী দলের আছেন, ডান দলের আছেন, বাম দলেরও আছেন। এই বাম দলও কিন্তু এর থেকে বাইরে নেই। কাজেইরাজনীতিটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাজনীতিটাই চলে গেছে অন্যদের হাতে। ধনী লোকদের হাতে চলে গেছে। সেই আগের মত ত্যাগী লোক কেউ রাজনীতিতে নাই। ’৯৭ সালে যারা সরকারে ছিলেন সেই লোকরা হয়ত রাজনীতিতে এখন মরে গেছেন অনেকে, আর যারা আসছেন রাজনীতিতে, তারা হলেন সব ব্যবসায়ী, তারা সবাই হলেন কীভাবে রাতারাতি ধনী হওয়া যায়– এই ধান্ধায় আছেন।

৪০ বছর আগে আমি গেয়েছিলাম ফরাসি এ্যামবেসিতে, সেখানে ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে আমার একটু কাজ ছিলো। ওখানে আমার কথা বলার সময় এক ছাত্র গেছে, সে ট্যুরিস্ট হিসেবে ফ্রান্সে যাবে। ভদ্রলোক ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন, তুমি কি তোমার দেশ দেখেছ? ছেলেটা থতমত খেয়ে গেছে। তখন উনি বললেন, তুমি পার্বত্য চট্টগ্রাম গেছ? রাঙ্গামাটি গেছ? বান্দরবান গেছ? ছেলেটা বললো যে, না। বলেন, আগে যেয়ে দেখে এস। তোমার দেশে যে সৌন্দর্য আছে, এই সৌন্দর্য্যের চেয়ে ফ্রান্স বেশি না। আমি ফ্রান্সে বহুদিন ঘুরেছি, ছিলাম। আমার ফ্রান্স সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে। সত্যি কথা, ফ্রান্সও এত সুন্দর নয়।

অতএব আমাদের যারা সেনাবাহিনী বলেন তারা এই জিনিসটা বুঝছেন, সেজন্য তারা ওখানে ট্যুরিস্ট স্পট তৈরি করছেন। এখানে বড় বড় ব্যবসায়ীরা রিসোর্ট করছেন। সেই একেকটা রিসোর্টের ভাড়া কত? এক রাত্রি থাকবেন, ৫ থেকে ১০ হাজার, ১৫ হাজার টাকা ভাড়া। কাজেই তারা তাদের টাকাটা কোথায় লাগাবেন জায়গাটা খুঁজছেন। সেই জন্য ঐ জায়গায় যাচ্ছেন। ঐ জায়গার লোকদের, আদিবাসীদের বড় সমস্যা হলো ভূমি সমস্যা। তাদের কাগজপত্র নাই, বংশানুক্রমে তারা ওখানে থেকে বসবাস করে আসছেন। এখন সরকার থেকে বলে যে, এই জমি সরকারের। অতএব স্থানীয়দের তো জায়গা-জমি নাই। তারা কোথায় যাবে না যাবে এটা সরকারের আমলাদেরও চিন্তা নাই, সরকারের লোকদেরও চিন্তা নাই। রাজনীতিবিদরাও এটা চিন্তা করেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। এই বিষয়টা দেখা দরকার।

আমার মনে হয়, আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের বিষয়ে যদি আমাদের রাজনীতিবিদরা সচেতন হন, তারা যদি একাত্ম হন তাহলে এগিয়ে যাবে। সবাই বলেন একাত্ম হওয়ার কথা, ঐক্যের কথা, কিন্তু কেউ ঐক্যবদ্ধ হন না। ইদানিংকালে বোধ হয় বামদেরকে দেখছি কিছু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মূল গণতান্ত্রিক শক্তি তারা কিন্তু ঐক্য চান না। এইটা হলো বাস্তবতা। অতএব এজন্য আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে হবে। আদিবাসী, পাহাড়ি, বঞ্চিত মানুষের অধিকারের আন্দোলন আরো জোরদার করতে হবে। এখান থেকে আমি আহ্বান জানাবো, যারা রাজনীতিবিদ আছেন, যারা গণতন্ত্রীমনা আছেন, যারা সংস্কৃতিমনা আছেন তাদেরকে আরো সংহত হয়ে আন্দোলন করা এবং আন্দোলন আরো জোরদার করতে হবে। এই আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

নির্বাচনের আগেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করুন

এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ

সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত বন্ধুগণ, ভাই ও বোনেরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আজকের এই আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিজয়ের মাসেই। ৪৬ বছর পর আজকের এই আলোচনা সভায় ইতিমধ্যে আলোচকরা যা ব্যক্ত করেছেন তার থেকে একটি প্রশ্ন এসে যায় যে, গোটা জাতি প্রকৃত অর্থে কি বিজয়ী হয়েছে? অস্বীকার করার উপায় নেই, পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙে আমরা বাংলাদেশ করেছি, জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন হয়েছে, জাতীয় পতাকাও পরিবর্তিত হয়েছে, সরকারেরও পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পাকিস্তানের মনন এবং মানসিকতা থেকে আমরা আজও বেরিয়ে আসতে পারিনি। পাকিস্তানের যে লেগেসি বা উত্তরাধিকার স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরেও তা আমরা বহন করে চলেছি।

> যে নতুন সংকট দেখা দিয়েছে পাহাড়ে সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। আজকে আমি একথাটি বলতে চাই, সাম্প্রদায়িকতা শুধু পাহাড়ে নয়, সাম্প্রদায়িকতা সমতলেও আমার গণতন্ত্রকে গ্রাস করতে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং মৌলবাদিতার কাছে আজকে অনেক রাজনৈতিক দল, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো এবং যারা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলো, যারা এখনও গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, সাম্প্রদায়িকতার কাছে তাদের যখন আত্মসমর্পণ করতে দেখি তখন আমরা ভাবি, এদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের যে লড়াই বাঙালি পাকিস্তানের ২৫ বছর করেছিলো সেই লড়াইটি কবে শুরু হবে এবং কীভাবে তার শেষ হবে?

প্রকৃত অর্থে আজকের দিনে এসে বিশ্বাস করতে চাই, ১৬ই ডিসেম্বরে আমরা শুধুমাত্র সামরিক বিজয়টি অর্জন করেছিলাম। যদি জাতীয় বিজয় হতো, তাহলে পরে আমাদের দেশে শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, প্রগতির পথে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতো। এ সময়ের মধ্যে এসে আজকে আমাদের এই যন্ত্রণাটি উপলব্ধি করতে হতো না, যখন শান্তিচুক্তির স্বাক্ষরকারী একটি পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার মুখে আমাদের শুনতে হয়েছে, আমরা প্রতারিত হয়েছি। সরকার বলছে, গতকালও প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভিডিও ভাষণে বলেছেন, শান্তিচুক্তি আওয়ামীলীগ করেছে এবং এই চুক্তির বাস্তবায়নটি আওয়ামীলীগই করবে, তবে পর্যায়ক্রমিকভাবে করবে। আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই আহ্বানটুকু কি জানাতে পারি, আপনি যখন শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আপনি কি সুস্পষ্টভাবে একটি রোডম্যান ঘোষণা করবেন? পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নে একটি রোডম্যাপ আপনি নির্বাচনের আগেই জাতির সামনে ঘোষণা করেন। যাতে গোটা জাতি এতে আশা ও স্বস্তি পেতে পারে।

দুঃখের সাথে বলতে চাই, আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি আজও মেলেনি। অথচ এটা না মেলার কারণেই ১৯৭৩ সালের পরে, বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের পরে যে সংকটে আমরা পড়েছিলাম, গোটা জাতি তা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে। আমরা আশা করেছিলাম, সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে নতুন সংযোজনী ঘটবে যেখানে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি মেলবে। কিন্তু আমরা জানি, সংবিধানে একটি সংযোজন ঘটেছে, যেখানে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় না দিয়ে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতি পরিচয়ে পরিচিত করানো হয়েছে। আজকের দিনেও আমরা বলতে চাই, সংবিধানে এই যে ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ এবং ‘উপজাতি’ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতিটি দেওয়া প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থে।

আজকে মেনন ভাই বলেছেন, যে নতুন সংকট দেখা দিয়েছে পাহাড়ে সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা। আজকে আমি একথাটি বলতে চাই, সাম্প্রদায়িকতা শুধু পাহাড়ে নয়, সাম্প্রদায়িকতা সমতলেও আমার গণতন্ত্রকে গ্রাস করতে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা

এবং মৌলবাদিতার কাছে আজকে অনেক রাজনৈতিক দল, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো এবং যারা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলো, যারা এখনও গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, সাম্প্রদায়িকতার কাছে তাদের যখন আত্মসমর্পণ করতে দেখি তখন আমরা ভাবি, এদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের যে লড়াই বাঙালি পাকিস্তানের ২৫ বছর করেছিলো সেই লড়াইটি কবে শুরু হবে এবং কীভাবে তার শেষ হবে?

সবশেষে আমি বলতে চাই, গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর (২০১৭) থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে জাতিসংঘের Prevention of Genocide Offence বিষয়ক দুই দিনব্যাপী একটি বৈঠক করেছে। সেই বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিলো Fostering inclusive socities in South Asia, সেখানে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মিঃ এ্যাডাম স্বাগত বক্তব্যের এক জায়গায় বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে ও বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়াটি চলছে। বাংলাদেশের নাম সেই বৈঠকেও উচ্চারিত হয়েছে।

আমি এই বলেই শেষ করতে চাই, একাত্তরে আমরা সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। Proclamation of Independence, স্বাধীনতার ইশতেহারটি ঘোষিত হয়েছিলো প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হবার আগে এবং একই দিন ১০ এপ্রিল সেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা ছিলো– আমরা এমন এক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্যই যুদ্ধ করছি যে রাষ্ট্রটি হলে পরে এদেশের সকল নাগরিকের সাম্য, সমতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে। আজকে দুঃখের সাথে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা এবং আদর্শ থেকে আমরা, রাষ্ট্র এবং রাজনীতি অনেক দূরেই কিন্তু ছিটকে পড়েছি। সেখান থকে ঐক্যবদ্ধভাবে উত্তরণে যদি আমরা এগিয়ে যেতে না পারি, আমার কাছে মনে হয়, ভবিষ্যতের বিপর্যয় কারো পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হবে না। আমি এই বলেই শেষ করছি, আপনাদের ধন্যবাদ।

চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে বড় কারণ হচ্ছে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রভাব

শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি

শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং বিশিষ্ট জনেরা, সুধীবৃন্দ। আসলে এতক্ষণ অনেক মূল্যবান কথা আমরা শুনেছি। আগের বক্তারা বলেছেন, যেগুলো হয়তো আমাদের অনেকেরই কথা। আমরা পুনরাবৃত্তি করবো না।

আমি প্রথমেই একটি কথা বলতে চাই, যদিও অনেক হতাশা ও অনেক কষ্ট নিয়ে আমরা ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছি। সূচনা বক্তব্যে সন্তুদা যা যা বলেছেন তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে আমি যে কথাটা বলতে চাই, যারা এই চুক্তি করেছিলেন, তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাতে চাই। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে, আজকে এই চুক্তি যদি ২০ বছর আগে, আজ যতটুকু বাস্তবায়িত হোক এই চুক্তি যদি না হতো, আমরা আজকে যে আলোচনা করছি এই আলোচনার কোন ভিত্তি আমরা খুঁজে পেতাম না। সেজন্যে আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে, আমরা ২০ বছরে চুক্তির বেশির ভাগ বিষয়ই বাস্তবায়িত হয় নাই, এই বেশির ভাগ বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণের সঙ্গে একটি বড় কারণ হচ্ছে– সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রভাব। তাদের এই প্রভাবটা নেতিবাচক, সেই প্রভাবটা যদি প্রতিহত না করা হয়, তাহলে সামনে এগুনো যাবে না। যে কারণে ৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে যখন চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির সময় পরস্পরের উপর যে আস্থা ছিলো সেই আস্থা অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে প্রথম কাজ হচ্ছে এই আস্থার পুনর্নির্মাণ করা, বিনির্মাণ করা এবং পরস্পরের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা। তার জন্যে সরকারের দায়িত্বটাই হচ্ছে প্রধান। কারণ সরকার এটা না চাইলে, এটা হতে পারবে না। সরকারের যদি এই কৃতিত্ব নিতে হয় যে, চুক্তি তারা করেছেন, তাহলে এই চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাদেরকে নিতে হবে এবং প্রথমে এই আস্থা বিনির্মাণের কাজটি তাদের করতে হবে।

আমি দ্বিতীয় কথা যেটি বলবো সেটি হচ্ছে, এটার কথাও অনেকেই বলেছেন যে, ভূমি সমস্যাটি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা ১৬ বছর পরে সংশোধন করা হলো, কিন্তু সেই কমিশন এখন কার্যত অকার্যকর। এই অকার্যকর অবস্থা থেকে অবিলম্বে এটাকে কার্যকর করতে হবে, তার জন্যে রোডম্যাপের কথা বলেছেন রানাদা, আমি সম্পূর্ণ একমত।

সেই রোডম্যাপটা এককভাবে সরকারকে করলে হবে না। অবশ্যই যারা চুক্তি করেছেন, দুই পক্ষকে এক সাথে হয়ে, একমত হয়ে এই রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। সেখানে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

আমি যে কথাটি বলে শেষ করবো, আজকে শুধু পাহাড়ের আদিবাসী বা সমতলের আদিবাসী অথবা সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বিপন্ন– এভাবে আমি দেখছি না। আমি নিজে বিশ্বাস করি, এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশের যে অসাম্প্রদায়িক চরিত্র, আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেটাই আজ বিপন্ন। আজকে যদি আমরা পাহাড়িদের, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা করতে না পারি, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে না পারি, যদি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র রক্ষা করতে না পারি, একদিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটাই বিপন্ন হবে, মুক্তিযুদ্ধটাই মিথ্যা হয়ে যাবে আমাদের কাছে। অতএব আমরা যদি আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাই এগুলো আমাদের জন্য অপরিহার্য, একথা বলে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।

> ৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে যখন চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির সময় পরস্পরের উপর যে আস্থা ছিলো সেই আস্থা অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে প্রথম কাজ হচ্ছে এই আস্থার পুনর্নির্মাণ করা, বিনির্মাণ করা এবং পরস্পরের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা। তার জন্যে সরকারের দায়িত্বটাই হচ্ছে প্রধান। কারণ সরকার এটা না চাইলে, এটা হতে পারবে না। সরকারের যদি এই কৃতিত্ব নিতে হয় যে, চুক্তি তারা করেছেন, তাহলে এই চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাদেরকে নিতে হবে এবং প্রথমে এই আস্থা বিনির্মাণের কাজটি তাদের করতে হবে।

সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ থেকে ক্রমাগতভাবে দূরে সরে গেছে

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনেক ধন্যবাদ। আমি সকাল থেকে যে আলোচনা শুনছিলাম, আমার কাছে দুটো দিক প্রধান হয়ে এসেছে। একটা হচ্ছে যে, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সন্তুদার আলোচনা থেকে আমি দেখেছি, একটা নিদারুণ বেদনাবোধের প্রকাশ। এটি সন্তুদার ব্যক্তিগত বেদনা নয়। এটি হচ্ছে পাহাড়ি জনগণের যে বেদনা, সেই বেদনার প্রকাশ তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে সরকার চুক্তি করেছিলো সেই সরকার এই চুক্তি বাস্তবায়নে আজকে আগ্রহী নয়, তৎপর নয়। তাদের সদিচ্ছার অভাব প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে। সরকারের এই যে অপারগতা, এই অপারগতাকে ঢাকার জন্য সরকার এবং রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা, তারা কিন্তু মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। একদিকে মানুষের বেদনাবোধ এবং তাদেরকে একধরনের ঠকানো হয়েছে, আমি বলার মত যথাযথ শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে যদি আমি বলি তা অমুলক হবে না। তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, সেই বিশ্বাসকে পা মাড়িয়ে, সেই বিশ্বাসকে অমর্যাদা করে আজকে সেই চুক্তি বাস্তবায়নের কাজটা থেকে সরকার ক্রমাগতভাবে দূরে সরে গেছে।

আজ বিশ বছর হলো। মানুষের মনে হয় ধৈর্যের একটা সীমা আছে। সেই কথাটাই কিন্তু আজকে এখানে সন্তুদার আলোচনায় এবং অন্যান্য আলোচকদের যে আলোচনা তার মধ্য দিয়ে দেখেছি। সময় কম এবং আমার বেশি কিছু বলার সুযোগ নেই। কিন্তু আমি দু-চারটা যে কথা বলতে চাই তার মধ্যে আমি একটা কথা বলবো, যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেটা একটা ঐতিহাসিক চুক্তি এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা চুক্তি ছিলো। বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তির উপরে জন্মগ্রহণ করার সময় এই কথাটা রাষ্ট্রের অধিনায়করা বুঝতে পারেননি যে, বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য জাতিসত্তার যে মানুষরা আছে তারা কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। এদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির পাশাপাশি আদিবাসী ছিলেন। আমাদের যে লাল-সবুজের পতাকা, সেই পতাকার রক্তগোলকের মধ্যে আদিবাসীর রক্ত আছে। সেখানে চাকমার রক্ত আছে, মারমার রক্ত আছে, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, সকল আদিবাসী জাতির রক্ত আছে। বাঙালির রক্ততো আছেই। কিন্তু এই যে মিলিত রক্তস্রোতে তৈরি হওয়া আমাদের যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার সংগ্রামে যারা বাঙালি নয় তারা কেন

অংশগ্রহণ করলো? তাদের কী প্রত্যাশা ছিলো? তাদের কী স্বপ্ন ছিলো? সেই স্বপ্নটা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বোঝা উচিত ছিলো। সেটা তারা বোঝেননি।

গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন, এই যে বিশ বছর আগের ছবি দেখুন, প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন, তাঁর পাশে তাঁর পক্ষ থেকে যিনি স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি বসে আছেন, আর আছেন সন্তু লারমা, পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধি। বিশ বছর পরে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স করছেন সেখানে সন্তু লারমা বা তাঁর দল, তারা নাই কেন? সেখানে আঞ্চলিক পরিষদ নাই কেন? তার মানেটা হচ্ছে যে, এর মধ্যে অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে এবং এই ব্যর্থতা কিন্তু আমি মনে করি, রাষ্ট্রের ব্যর্থতা, সরকারের ব্যর্থতা। কারণ চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের, এই সরকারের। আওয়ামীলীগ চুক্তি করে নাই, চুক্তি আওয়ামীলীগের সাথে হয় নাই, চুক্তি হয়েছে রাষ্ট্রের সাথে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত একটা কমিটি, তারা চুক্তি করেছে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। কাজেই এই চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। যেহেতু দল হিসেবে আওয়ামীলীগ তখন ক্ষমতায় ছিলো, নিশ্চয়ই আওয়ামীলীগের একটা বড় দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব কতখানি পালিত হচ্ছে?

আমি যতটুকু বুঝি একজন ঐতিহাসিক হিসেবে, একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম আদিবাসীদেরও মুক্তির পথ নির্মাণ করবে এটা তারা প্রত্যাশা করেছিলেন। বাঙালির মুক্তির সাথে তারা তাদের নিজেদের মুক্তিকে একাকার করে দেখেছিলেন। আমি উ সুয়ে দাদার কথা স্মরণ করছি, যিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন বছর তিনেক হলো। রাখাইন, উ সুয়ে দাদা ১৯৫২ সালে আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সৈনিক ছিলেন। বাংলা ভাষার আন্দোলনের সৈনিক রাখাইন উ সুয়ে কেন? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন যে, তাদের ভাবনাটা ছিলো, যদি বাংলা ভাষা তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে অন্য যে ভাষাগুলো আছে সেগুলোও ধীরে ধীরে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অন্যান্য ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হবে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম, বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অন্য জাতি তারা নিজেরাও এই স্বাধীনতায় সামিল হয়েছিলেন যুদ্ধে, তারা ভেবেছিলেন এর মধ্য দিয়ে তাদেরও স্বাধীনতা আসবে, তাদেরও মুক্তি আসবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, হয়তো ধনী বাঙালির মুক্তি হয়েছে। এখানে কি আদিবাসীর মুক্তি হয়েছে? যদি মুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আজকে কেন সন্তু লারমাকে বলতে হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশের উপনিবেশ! এটা তো গোটা বাঙালি জাতির জন্য লজ্জার!

গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন, এই যে বিশ বছর আগের ছবি দেখুন, প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন, তাঁর পাশে তাঁর পক্ষ থেকে যিনি স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি বসে আছেন, আর আছেন সন্তু লারমা, পাহাড়ি জনগণের প্রতিনিধি। বিশ বছর পরে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স করছেন সেখানে সন্তু লারমা বা তাঁর দল, তারা নাই কেন? সেখানে আঞ্চলিক পরিষদ নাই কেন? তার মানেটা হচ্ছে যে, এর মধ্যে অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে এবং এই ব্যর্থতা কিন্তু আমি মনে করি, রাষ্ট্রের ব্যর্থতা, সরকারের ব্যর্থতা। কারণ চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই রাষ্ট্রের, এই সরকারের। আওয়ামীলীগ চুক্তি করে নাই, চুক্তি আওয়ামীলীগের সাথে হয় নাই, চুক্তি হয়েছে রাষ্ট্রের সাথে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত একটা কমিটি, তারা চুক্তি করেছে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। কাজেই এই চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। যেহেতু দল হিসেবে আওয়ামীলীগ তখন ক্ষমতায় ছিলো, নিশ্চয়ই আওয়ামীলীগের একটা বড় দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব কতখানি পালিত হচ্ছে?

আসলে এই চুক্তিটা একটা রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্পত্তির একটা সঠিক পদক্ষেপ ছিলো। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা যে একটা জাতীয় সমস্যা সেটার স্বীকৃতি ছিল জাতীয়ভাবে এটাকে সমাধান করার। আসলে জাতিসমস্যার মূলটা কোথায়? সমস্যার মূলে একটা সোজা কথা– এদেশে বাঙালি ছাড়াও আরো অনেক জাতি আছে, সেই জাতিগুলোকে সমমর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে। সেই কাজটা এই চুক্তির মধ্য দিয়ে হওয়ার কথা ছিলো, হলো না। যদি হতো তাহলে আজকে এই বোধ আসতো না। এই যে মিথ্যাচার হচ্ছে, এই মিথ্যাচার কিন্তু নানাভাবে হচ্ছে। এটা রাষ্ট্রের, সরকারের, সরকারের বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা যারা আছে তাদের যে মনোভূমি সেটা তৈরির ক্ষেত্রেও কিন্তু ভূমিকা রাখছে। যেমন ধরুন, আমি একটা কথা বলি, মিয়ানমারের কথা একটু আমাকে বলতে হয়। মিয়ানমারে সেখানে সেনাবাহিনী এবং নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে রোহিঙ্গা বিরোধী মনোভাব এবং মুসলমান বিরোধী মনোভাবের বিস্তার ঘটানো হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। সেখানে বর্মীরা হচ্ছে প্রধান জাতি এবং সেখানে সেনাবাহিনীর ৯৭% ভাগ হচ্ছে বর্মী। সেখানে উগ্র বর্মী জাতীয়তাবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মান্ধতা দিয়ে যেভাবে মনস্তত্ত্ব তৈরি করা হয়েছে, ওখানে যখন রোহিঙ্গাকে নিদারুণ অত্যাচার করে তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া হচ্ছে তাতে নাকি

সেনাবাহিনী প্রধানের এবং তার প্রতিবাদ না করায় অংসান সুচির জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তার মানে জনগণের মধ্যে কী ধরনের উন্মত্ততা তৈরি হয়েছে!

আমি বাংলাদেশে দেখছি যে, এখানে পাহাড়ি বিরোধী, এখানে আদিবাসী বিরোধী এক ধরনের উন্মত্ততা তৈরির কাজ চলছে। রাষ্ট্র দীর্ঘ দিন ধরে এই কাজটা করেছে। মাঝখানে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে এটা বন্ধ হবে প্রত্যাশিত ছিলো। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না করার প্রক্রিয়ায় দেখছি অপরদিকে উন্মত্ততা তৈরি করা হচ্ছে পাহাড়ি বিরোধী, আদিবাসী বিরোধী এবং তার সাথে এরা যেহেতু মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী নন, সুতরাং তাদেরকে মুসলমান বিরোধী অভিধায়– এক ধরনের উন্মত্ততা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হচ্ছে। এটা খুব ভয়াবহ। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী একটু আগে বক্তৃতা দিলেন। তিনি সেখানে বললেন যে, সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। রানাদা বললেন, শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে না, গোটা দেশে সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়েছে। কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িকীকরণ করার এ্যাক্টররা তো রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে আছে। জামাত-বিএনপির কথা আমরা সবাই জানি। রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা আছে তারা যদি সাম্প্রদায়িকীকরণের কাজ করে তাহলে দেশ দাঁড়াবে কোথায়? মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী শক্তি যদি সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে দাঁড়ায়, সেই সাম্প্রদায়িকীকরণ নানাভাবে হতে পারে।

আমি মনেকরি, জাতিগত সাম্প্রদায়িকতাও একটি বড় সাম্প্রদায়িকতা। আমরা শুধু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কথা বলি, কিন্তু ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত সাম্প্রদায়িকতাও বড় জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা। সেই সাম্প্রদায়িকতাকে কিন্তু উস্কানি দেওয়া হচ্ছে, পরিবেশন করা হচ্ছে, লালন করা হচ্ছে, বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এইগুলোকে বন্ধ করতে হবে। তা না হলে আমরা দেখবো যে, মিয়ানমারে যা হয়েছে এখানে তাই হবে। আমরা রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক, আমরা তাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। রোহিঙ্গারা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে, আমাদের দেশে সেরকম নির্যাতনের অতীত আছে, এটা ভুলে গেলে চলবে না। হয়তো এত বড় স্কেলে হয়নি, কিন্তু আমাদের মাননীয় মন্ত্রী তো বলে গেলেন, তিনি গিয়েছিলেন কাউখালিতে একটা গণহত্যা তদন্ত করতে। এরকম গণহত্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো অনেকগুলো হয়েছে। কাজেই এই সত্যকে স্বীকার করুন, আমাদের দেশে গণহত্যা হোক এটা আমরা চাই না। আমাদের দেশের যারা নাগরিক তারা সকলে সমমর্যাদায় থাকবে, সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে, সেটাই আমরা চাই। এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার যদি ঘটানো হয়, তাহলে কিন্তু সেটা আবার আমাদেরকে ঐ মিয়ানমারের পথে নিয়ে যাবে। সেই বিপদ থেকে দেশ, জাতি, রাষ্ট্রকে রক্ষা করা দরকার।

শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ২৪ বছরের সংঘাতের এবং ২০ বছরের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অবসান হয়েছিলো এবং আমরা একটা শান্তির বাতাবরণ পেয়েছিলাম। আমরা শান্তিবাদী, আমরা শান্তি রক্ষিত হোক তাই চাই। আমি সন্তুদার একটা কথায় আশ্বস্ত হয়েছি, তাঁরা যে দশ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন তিনি যেদিন প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন, তিনি সেদিন বলেছিলেন যে, তারা গণতান্ত্রিক পথেই কিন্তু প্রতিবাদ করতে চান, প্রতিরোধ করতে চান। কিন্তু তাঁদের অধিকারের যেভাবে লংঘন হচ্ছে সেগুলো মোকাবেলার জন্য, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা দশদফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, আমি দশদফা পড়েছি, অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কর্মসূচি এবং তাঁরা গণতান্ত্রিকভাবে করতে চান। তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলন কে করেছিলেন? জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর আগে ভারত উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধীও অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। আজকে আমরা দেখছি, আমাদের জাতীয় নেতা সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। এই অসহযোগ আন্দোলনকে যদি আমাদের রাষ্ট্র সহিংসভাবে দমনের চেষ্টা করে, যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে অধিকার আছে সেই অধিকারকে যদি লংঘন করা হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শক্তিবলে, সেই চেষ্টা যদি করা হয়, সেটা ঠিক হবে না। মানুষের, সকল জাতিসত্তার, সকল জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার আছে, সেই অধিকার দিতে হবে এবং তার অধিকারের বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমি খুব চেষ্টা করছি সংক্ষিপ্ত করতে। কিন্তু দুয়েকটা কথা না বললেই নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট, তিনি এ দেশের পার্লামেন্টের সদস্য, ঊষাতন তালুকদার এবং যার প্রস্তাবে বহু বছর পরে আমাদের জাতীয় সংসদ, আমি বলবো যে কেমন বাংলাদেশ হওয়া উচিত তার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে, খুবই ভালো কাজ এবং এটা জাতীয় সংসদ করেছে। কিন্তু এই যে ঊষাতন তালুকদার, আমাদের নির্বাচন কমিশন এমন একটা ব্যবস্থা করেছে যে, ঊষাতন তালুকদার তার দলের নামে নির্বাচন করতে পারেন না। কেন? আঞ্চলিক দল কেন নির্বাচন করতে পারবে না? ভারতে আঞ্চলিক দল নির্বাচন করতে পারে না? শুধু কি নির্বাচন করতে পারে? তারা কেন্দ্রে পর্যন্ত সরকার গঠন করতে পারে। দেবগৌড়া কোন দলের ছিলেন, তিনি কি কোন জাতীয় দলের সদস্য ছিলেন? এরকম আরো নাম বলতে পারি। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আঞ্চলিক দল কেন নিজের নামে নির্বাচন করতে পারবে না? নিজের পরিচয়ে, নিজের কর্মসূচির ভিত্তিতে কেন নির্বাচন করতে পারবে না?

এভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় আমাদের আদিবাসীদেরকে যদি তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়, প্রতিনিধিত্বের অধিকারকে যদি লংঘন করা হয়, তাহলে কিন্তু সেটা ভালো হবে না, দেশে অস্থিরতা তৈরি হবে। আমি মনে করি, আমাদের দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ যত সংখ্যালঘু আছেন, আদিবাসী জাতি আছেন, তাদের জন্য পার্লামেন্টে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং রিজার্ভ সিট থাকা দরকার। জনসংখ্যায় তারা যদি ধরুন এদিকে (আদিবাসী) ৩%, আর ওদিকে (ধর্মীয় সংখ্যালঘু) ১১%, সব মিলিয়ে যদি ১৩-১৪% হন, কমপক্ষে ১৪% আসন সংখ্যালঘুদের জন্য রিজার্ভ থাকা দরকার। তা না হলে আমাদের পার্লামেন্টে এই জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পাচ্ছেন না। নারীর জন্য যদি রিজার্ভ

সিট থাকতে পারে, তাহলে সংখ্যালঘুর জন্য রিজার্ভ সিট কেন থাকতে পারবে না? এই বিষয়গুলো গভীরভাবে ভাবা দরকার।

শুভঙ্করের ফাঁকিগুলো বিষয়ে একটু বলতে হয়। চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, এত পারসেন্ট হয়েছে, কত পারসেন্ট হয়েছে সেখানে নাই বা গেলাম। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হস্তান্তরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে, ৩৩টার মধ্যে ৩১টা বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সেদিন একটা সভায় বললেন। আমি ছিলাম। আমি বলি, কী হয়েছে, সেটা কি ১% হয়েছে, না ২% হয়েছে, না ২৫% হয়েছে, না ১০০% হয়েছে? যেগুলো হস্তান্তর হয়েছে বলে বলছেন, যেমন ধরুন আমি বলি, একটি হস্তান্তরিত বিষয় হচ্ছে ‘ফিসারিজ’, মৎস্য বিভাগ। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বড় যে ফিসারিজ প্রজেক্ট চলছে, টাকার পরিমাণ আমার ভুল হতে পারে, সম্ভবত ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প, সেই প্রকল্পটা হস্তান্তর করা হয় নাই। আপনি ফিসারিজ হস্তান্তর করলেন, কিন্তু ফিসারিজের সবচেয়ে বড় যে প্রকল্প, সে প্রকল্প আপনি হস্তান্তর করলেন না। তাহলে আপনি প্রচার করছেন, আমি ‘ফিসারিজ’ হস্তান্তর করেছি।

আমাদের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী ছিলেন। পর্যটন হস্তান্তর করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। পর্যটনের কী হস্তান্তর করা হয়েছে? পর্যটন নিয়ে সন্তুদা তার আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, আমি জোর দিয়ে বলছি, সেখানে বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের মূল দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন একটা জাতীয় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবর্তনের করার মাধ্যমে, সেই গণতন্ত্রায়নের পথ তৈরি করেছে বাংলাদেশে, সেখানে যদি বাংলাদেশ কর্পোরেশনই দায়িত্বে থাকে, সেখানে সেনাবাহিনীকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পর্যটন নিরাপত্তার জন্য, তাহলে সেখানে কী হস্তান্তর করা হলো? পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল পাহাড় চুড়াগুলোই আমাদের সেনাবাহিনী পর্যটন কেন্দ্র করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ইঞ্চি জমি বরাদ্দ পেতে গেলে সেখানকার পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুমোদন লাগে। আমি জানতে চাই যে, ওখানে যে পর্যটনগুলো করা হয়েছে, যে রিসোর্টগুলো করা হয়েছে, সেটা যেই করে থাকুক, সেই রিসোর্টগুলো ব্যক্তি মালিকানায় হচ্ছে বা অন্য কোন সংস্থা করছে, সেই রিসোর্টের অনুমোদন কার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে? কোন সংস্থা অনুমোদন দিয়েছে? সেখানে পাহাড়ের মানুষ পর্যটনের বিপক্ষে নয়। যে পর্যটন তার জীবন-সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হবে, পরিবেশ-বান্ধব হবে, জনগোষ্ঠী-বান্ধব হবে সেই পর্যটন না করে যখন নির্বিচারে পরিবেশ-বিধ্বংসী বাণিজ্যিক পর্যটন করা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী এবং সংস্থা সেই পর্যটনের সাথে যুক্ত হচ্ছে, তখন সেটা আদিবাসী মানুষের জীবন এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংসের কাজকে এগিয়ে নিচ্ছে।

> **পাহাড়ের মানুষ পর্যটনের বিপক্ষে নয়। যে পর্যটন তার জীবন-সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হবে, পরিবেশ-বান্ধব হবে, জনগোষ্ঠী-বান্ধব হবে সেই পর্যটন না করে যখন নির্বিচারে পরিবেশ-বিধ্বংসী বাণিজ্যিক পর্যটন করা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী এবং সংস্থা সেই পর্যটনের সাথে যুক্ত হচ্ছে, তখন সেটা আদিবাসী মানুষের জীবন এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংসের কাজকে এগিয়ে নিচ্ছে।**

পরিশেষে আমি যেটা বলে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে, আমি মনে করি লড়াইটা আসলে সাংবিধানিক স্বীকৃতির। ভূমি অধিকারের প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে যে বাঙালি ছাড়াও আরো অনেক জাতির মানুষ বাস করে এবং তাদেরকে সমমর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত ‘উপজাতি’ বলতে থাকবে, রাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত তার সংবিধানের ঐ ধারা পরিবর্তন করবে না যাতে বলা হয়েছে– এই দেশের জনগণ জাতিতে বাঙালি, ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে আদিবাসীর লড়াই বন্ধ হওয়ার কোন পথ নাই এবং শান্তিচুক্তি আসলেই বাস্তবায়ন করা যাবে না। কাজেই আমি মনে করি, সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং তাদের যে কমিউনিটি মালিকানা সেই কমিউনিটি মালিকানার স্বীকৃতি অপরিহার্য। সংবিধানে সমস্যা আছে, সংবিধান বলছে, তিন ধরনের মালিকানা– ব্যক্তিগত মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং সমবায় মালিকানা। কিন্তু কমিউনিটি মালিকানার কথা সংবিধানে নাই। সংবিধান পরিবর্তন করে কমিউনিটি মালিকানার কেন স্বীকৃতি দেয়া যায় না? কারণ রাষ্ট্র সেটা করতে চায় না, সেই জায়গা বাঙালির নামে, মুসলমানের নামে হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত থাকতে চায়, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আমরা একটি সমতা ভিত্তিক রাষ্ট্র চাই। এই সমতার লড়াই ছিলো একাত্তরে। সেই সমতার লড়াই আজও চলছে। ধন্যবাদ সবাইকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন চাই

সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও গবেষক

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সন্তু দা, রানা দা এবং অন্যান্য আলোচকবৃন্দ সকলকে অভিনন্দন। সভার শুরুতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, সন্তু দা যে অবস্থায় ছিলেন সভার শেষ পর্যায়ে তিনি সেই অবস্থায় নেই। আমার মনে হয়েছে- সভা চলাকালীন সময়ে সরকারের তরফ থেকে কোন বার্তা এসেছে যে, অবিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আর সেই খুশিতে পাগড়ি মাথায় দিয়ে অগ্রিম বিজয় আনন্দ উপভোগ করছেন। ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষা আর রাষ্ট্রের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা দুটোর মধ্যে ঠাণ্ডা বরং ভালো। ঠাণ্ডার অত্যাচার সহ্য হয় কিন্তু রাষ্ট্রের অত্যাচার সহ্য করা বড়ই কষ্ট, বড়ই বেদনাদায়ক।

সূচনায় তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন সেই বক্তব্য দীর্ঘ এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই ব্যাখ্যার সময় তার বক্তব্যে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে, হতাশার প্রকাশ ঘটেছে, বেদনার প্রকাশ ঘটেছে আপনারা লক্ষ্য করেছেন। সে ক্ষোভ শুধু তার না, এটা আমাদের সকলের। আমাদের বাঙালিদের মধ্যে থেকে অনেকে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন। তবে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল আওয়ামীলীগ নেতাদের, বিএনপি নেতাদের, জাতীয় পার্টি নেতাদের। কারণ এখানে আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক বক্তব্য উঠে এসেছে যেগুলো রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি করা উচিত।

আজকেও পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন এই চুক্তির ২০ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। এই বিজ্ঞাপন দুই-তিন বছর ধরে প্রকাশিত হতে চলেছে। সরকারের দিক থেকে এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত গৌরবের হতে পারে। আর আমাদের দিক থেকে গত কয়েক বছর যাবৎ এই দিনটিকে পালন করি ক্ষোভ, হতাশা আর বেদনা নিয়ে। আমরা প্রতি বছর সগৌরবে ও আড়ম্বরপূর্ণভাবে রবীন্দ্র দিবস পালন করি, নজরুল দিবস পালন করি, নূর হোসেন দিবস পালন করি। এরকম দিবস বছরের পর বছর পালন করছি আমরা। চুক্তির বর্ষপূর্তির এই দিনটিও যদি আমরা আনন্দঘন পরিবেশে পালন করতে পারতাম, আজকে বিশ বছর পরে যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম হতো একটি শান্তির উপত্যকা এবং অন্যান্য এলাকার আদিবাসীরা তারা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারতেন তাহলে সেটি সবচাইতে ভাল হতো। কিন্তু তা হচ্ছে না। আজকের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে আশি ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে পার্বত্য চুক্তি। আশি ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে বিশ বছরে। সরকারের তরফ থেকে অংক কষে বলা হয়েছে এটা। বছরে চার ভাগ করে চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে। তাহলে অংকের হিসেবে দেখতে গেলে ঐ বিশ ভাগ বাস্তবায়ন করতে গেলে আরো পাঁচ বছর লাগে। অর্থাৎ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে গেলে একুশ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আমাদের। অপেক্ষা করতে না পারলে বাস্তবায়ন হবে না।

কিন্তু এই আশি ভাগ বাস্তবায়নের কথা তারা কয়েক বছর ধরে বলে আসছেন। ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি হয়েছে এটা বলে যাচ্ছেন তারা কয়েক বছর ধরে। কিন্তু কোন অগ্রগতি নেই। অগ্রগতি নেই বলে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আজকে এখানে যে বক্তব্যগুলি দেয়া হয়েছে সেসব অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষ করে সন্তু দা যে বক্তব্য দিয়েছেন। তার বক্তব্য আগেও শুনেছি, কিন্তু আজকে তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন। এই বক্তব্যের মূল্যায়ন দরকার।

পার্বত্য চুক্তি হয়েছিলো দুই পক্ষের মধ্যে। আজকে পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হবে যে চুক্তি হয়েছে এক পক্ষের, সরকার একাই করেছে। এই বিজ্ঞাপনে যেটা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে যদি সন্তু দার একটা বক্তব্য থাকতো তাহলে এখানে এত লম্বা বক্তব্য দিতে হতো না। আমরাও হয়তো চুক্তির এই বর্ষপূর্তিতে শহীদ মিনারে কিংবা অন্য কোথাও গান-বাজনা করে আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম।

> সরকার বলেছে আশি ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে আর বিশ ভাগ বাকি আছে। সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের কথা হলো চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষরিত করা হয়েছে। চুক্তির কোন ধারায় এটা ছিল না যে, কিছু কিছু ধারা বাস্তবায়ন করা হবে না। প্রত্যেকটি চুক্তির মানে হলো A হতে Z পর্যন্ত শতভাগ বাস্তবায়ন। সেটা হয় নাই এবং এটা রাষ্ট্রের চরম ব্যর্থতা। সুতরাং আমাদের দাবি হলো কত ভাগের কত ভাগ সেটা নয়, শতভাগ বাস্তবায়ন আমরা চাই। এমনকি নিরানব্বই ভাগ বাস্তবায়ন হওয়ার পরও বাকি একভাগেরও বাস্তবায়ন চাই।

মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে সহমর্মী ছিলেন এবং এখনও আছেন। রোবায়েত ফেরদৌস তিনিও অনেক যুক্তি দিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন এবং অনেকে আরো অনেক কিছু বলেছেন। রাজেকুজ্জামান রতন চারটা 'ভ'-এর কথা বলেছেন- আমি এর সঙ্গে আরেকটা যোগ করতে চাই, তাহলে হবে পাঁচটা। সেটা হলো ভাওতাবাজী। অর্থাৎ রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছে ভাওতাবাজীর জন্য।

সরকার বলেছে আশি ভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে আর বিশ ভাগ বাকি আছে। সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। আমাদের কথা হলো চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষরিত করা হয়েছে। চুক্তির কোন ধারায় এটা ছিল না যে, কিছু কিছু ধারা বাস্তবায়ন করা হবে না। প্রত্যেকটি চুক্তির মানে হলো A হতে Z পর্যন্ত শতভাগ বাস্তবায়ন। সেটা হয় নাই এবং এটা রাষ্ট্রের চরম ব্যর্থতা। সুতরাং আমাদের দাবি হলো কত ভাগের কত ভাগ সেটা নয়, শতভাগ বাস্তবায়ন আমরা চাই। এমনকি নিরানব্বই ভাগ বাস্তবায়ন হওয়ার পরও বাকি একভাগেরও বাস্তবায়ন চাই।

বাংলাদেশে বাঙালি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, হাজং থেকে শুরু করে সমতলের সকল আদিবাসী মিলেই আমরা যেহেতু একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবো এটি ছিল আমাদের অঙ্গীকার। সুতরাং সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হলে এই চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে। সকলকে ধন্যবাদ।

চিরন্তন সামরিক শাসন বহাল আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে

পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ ও আলোচনা সভার সভাপতি

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, প্রচার মাধ্যমের ভাই ও বোনেরা, ধৈর্যের চূড়ান্ত নজির আপনারা স্থাপন করেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে। সাড়ে নয়টা থেকে এখন পর্যন্ত বসে থাকা আমাদের সংহতি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার একটা পরিচয়। ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে।

এটা কত বড় রাজনৈতিক সমস্যা, কতটা জরুরি জাতীয় সংকট সেটা আজকের আলোচকদের আলোচনার মধ্য দিয়ে বুঝা গেল। বিশেষ করে অস্বীকৃতির সংস্কৃতির কথা যখন এসে যায় তখন সমস্যাটা জরুরি জাতীয় সংকটে পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে যারা চুক্তি করেছেন তারা যখন অস্বীকৃতির পথে পা বাড়ান তখন এটা বিপর্যয়কর পরিস্থিতির দিকে রাষ্ট্রকে ঠেলে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতির উদ্ভব কোথা হতে এবং আজকের যার কণ্ঠে দুঃখ-কষ্টের বেদনার কথা শুনলেন অন্তত আমার মনে হয়েছে যে, সেদিন ৭০ সনে/৭৩ সনে পার্লামেন্টে যে কণ্ঠটা (মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা) ছিল সেই একই কণ্ঠ আজকে প্রতিধ্বনিত হলো। আমাদের আত্মপরিচয়ের সংকট এবং সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী সংকট থেকে তারা মুক্তি চেয়েছিলেন, আত্মপরিচয়ের সুযোগ নিয়ে তারা বাঁচতে চেয়েছিলেন।

পার্লামেন্টে এম এন লারমার বক্তব্যগুলো আমার মনে পড়ছে, সেই একই বক্তব্য আমরা এখানে দিচ্ছি। সেই সময়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ার স্তব্ধ করে দিয়েছিল সেই কণ্ঠ। আমরা বাম প্রগতিশীল নেতৃত্ব সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারিনি। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা সেদিন চরম ফ্যাসিসূলভ আচরণ দেখিয়েছিলেন, সেই থেকে সমস্যার উৎপত্তি। যে বাঙালিরা পাঞ্জাবী বর্ণবাদের শিকার হয়েছিলেন সেই বাঙালিরাই আজকে বর্ণবাদী আচরণ করছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সাথে। কর্তৃত্ববাদী, আধিপত্যবাদী আচরণ করছে, উপনিবেশ হিসেবে ভাবছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে। পাঞ্জাবীরা যেমন পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ ভাবতো তেমনি আজকে বাঙালিরা উপনিবেশ হিসেবে ভাবছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে। যে কারণে রাশেদ খান মেনন যে বিভাগের মন্ত্রী (পর্যটন) সেই বিভাগকেও সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা বহন করে চলেছি। বাংলাদেশের দশ ভাগের একভাগ এখনো সেনাশাসনে আছে।

আজকে রাশেদ খান মেননকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি স্বীকার করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ এটা পাকিস্তান আমলে ছিলো, সেটার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছিলো। সেই রাষ্ট্র আজকে পাকিস্তানী মনস্তত্ত্বে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই সাম্প্রদায়িকীকরণ রাষ্ট্রধর্ম থেকে উৎসারিত হয়েছে, প্রণোদনা পেয়েছে। যেখানে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম বহাল থাকবে আর সেই রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না তার কোন কারণ নেই। রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী মনস্তত্ত্ব, বর্ণবাদী মনস্তত্ত্ব, কর্তৃত্ববাদী মনস্তত্ত্ব, আধিপত্যবাদী মনস্তত্ত্ব দেখেছি আর এখন দেখছি পাকিস্তানীকরণের মনস্তত্ত্ব। যেটা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য

দিয়ে জোরদার হয়েছে এবং জিয়াউর রহমান, এরশাদ আর এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলও সেই রাস্তা ধরে হাঁটছে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে সংকটের সীমানা অনেক বড় হয়েছে সমগ্র জাতির জন্য। তার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক শাসন চলছে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

নাগরিক কমিটির প্রতিনিধি হয়ে একবার গিয়েছিলাম বান্দরবানে নোমান সাহেবসহ। বান্দরবানের লামায় আমাদেরকে ঢুকতে দেয়নি সেনাবাহিনী। তাহলে বুঝতে হবে সেখানে একটা বিশেষ শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, নইলে আমাদের ঢুকতে দেয় না কেন? সুতরাং চিরন্তন সামরিক শাসন বহাল আছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী মানুষকে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে মুক্ত করতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে। এই লড়াই শুধু সন্তু লারমার লড়াই না, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার লড়াই না, এটা দেশের আপামর জনগণের লড়াই। বাংলাদেশের এক-দশমাংশ জায়গা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরে থাকবে, গণতন্ত্রের বাইরে থাকবে, সেটা হতে পারে না।

”

লংগদুতে আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িতকার চরম বহিঃপ্রকাশ। লংগদু হামলার বিচার হয়নি, বিচার হবে না। নাসিরনগর হামলার বিচার হয়নি, বিচার হবে না। গোবিন্দগঞ্জে হামলার বিচার হয়নি, বিচার হবে না। গঙ্গাচড়ার হামলার বিচার হয়নি এবং সেখানে দেখেছি বড় বড় রাজনৈতিক দল একীভূত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছি তোমার প্রতিবেশী তোমার পক্ষে দাঁড়ালো না কেন? কেউই এবার দাঁড়ায়নি গঙ্গাচড়ায়। সেখানে বিএনপি, জামাত কো-স্পন্সর হয়েছে একটা প্রজেক্টের। সেই প্রজেক্টের কো-স্পন্সর হয়েছে জাতীয় পার্টি, আওয়ামীলীগ। জাতীয় ঐক্য! সাম্প্রদায়িকতার একটা জাতীয় ঐক্য দেখেছি। সেই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে বিচারহীনতার প্রকটরূপ। লুটেরা, ধনী, ভূমিদস্যু এবং খাঁটি আমলাদের হাতে রাষ্ট্র চলে গেছে। রাষ্ট্রের প্রশাসনের ভিতরে আগামী সরকারকে দেখতে পাচ্ছি তৎপর। তারা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সবকিছু, বঙ্গবন্ধুর কন্যার নিয়ন্ত্রণে আছে মনে হয় না।

দেশে সংকটের পরিসরটা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের সংকোচন, গণতন্ত্রের চর্চা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের অফিসে পুলিশের হামলা হচ্ছে। সাঁওতাল হত্যা করা হচ্ছে। সাঁওতাল পল্লীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের দেশের পুলিশ। পুলিশের লাঠির চোটে সাঁওতাল রমণীর অকাল প্রস্রব হয়েছে এই বাংলাদেশে। তাহলে কি পুলিশী রাষ্ট্রের দিকে পা বাড়াচ্ছে বাংলাদেশ!

লংগদুতে আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িতকার চরম বহিঃপ্রকাশ। লংগদু হামলার বিচার হয়নি, বিচার হবে না। নাসিরনগর হামলার বিচার হয়নি, বিচার হবে না। গোবিন্দগঞ্জে হামলার বিচার হয়নি, বিচার হবে না। গঙ্গাচড়ার হামলার বিচার হয়নি এবং সেখানে দেখেছি বড় বড় রাজনৈতিক দল একীভূত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছি তোমার প্রতিবেশী তোমার পক্ষে দাঁড়ালো না কেন? কেউই এবার দাঁড়ায়নি গঙ্গাচড়ায়। সেখানে বিএনপি, জামাত কো-স্পন্সর হয়েছে একটা প্রজেক্টের। সেই প্রজেক্টের কো-স্পন্সর হয়েছে জাতীয় পার্টি, আওয়ামীলীগ। জাতীয় ঐক্য! সাম্প্রদায়িকতার একটা জাতীয় ঐক্য দেখেছি। সেই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে বিচারহীনতার প্রকটরূপ। লুটেরা, ধনী, ভূমিদস্যু এবং খাঁটি আমলাদের হাতে রাষ্ট্র চলে গেছে। রাষ্ট্রের প্রশাসনের ভিতরে আগামী সরকারকে দেখতে পাচ্ছি তৎপর। তারা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সবকিছু, বঙ্গবন্ধুর কন্যার নিয়ন্ত্রণে আছে মনে হয় না। বান্দরবানের লামায় যখন আমাদেরকে সেনাবাহিনী ঢুকতে দিচ্ছে না তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, কার নির্দেশে আমাদেরকে যেতে দিচ্ছেন না? বলেছেন উপরের নির্দেশে। তার মানে প্রধানমন্ত্রীর! না, তার উপরে আরেকটা শক্তি। আমাকে বুঝে নিতে হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আমি মনে করি, এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের বিষয় নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমতাভিত্তিক লড়াইয়ের দায়িত্ব পালন করছেন আমাদের প্রিয় নেতা সন্তু লারমা। উনি শুধু একজন আঞ্চলিক নেতা নন, উনি জাতীয় নেতা। তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা কি পারি না অপরাপর রাজনৈতিক দল যারা সমতার বাংলাদেশের পক্ষে, শোষণহীন বাংলাদেশ বানানোর পক্ষে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর অনুসারী, মণিসিংহের প্রকৃত অনুসারী, অমলসেনের প্রকৃত অনুসারী, মাওলানা ভাসানী-মোজাফ্ফরের অনুসারী, এমনকি আমাদের জাসদের নেতা কাজী আরিফের প্রকৃত অনুসারী, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার প্রকৃত অনুসারী সবাই বাংলাদেশকে আবার মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ বানাতে হবে, যে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ ছিনতাই হয়েছে। আমাদের সেই হারানো মুক্তিযুদ্ধ ফিরিয়ে আনার, সমতাভিত্তিক বাংলাদেশ, শোষণমুক্ত বাংলাদেশ ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের এক অবিভাজ্য লড়াই যুক্ত রয়েছে, জাতীয় সমস্যা সমাধানের লড়াই সম্পৃক্ত রয়েছে।

সেই সংকট থেকে উত্তরণের উদ্যোগ রাজনৈতিক দলগুলো নেবে কিনা এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ক্ষুদ্র এই অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমার সেই সামর্থ্য নেই। কিন্তু নৈতিকভাবে সেই দায়িত্ব নিতে বাধ্য। আমি সকলকে অনুরোধ করবো যে, সকল রাজনৈতিক দল যারা দায়বদ্ধ জনতার প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি, অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি দায়বদ্ধ, আসুন আমরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের সমস্যাকে জাতীয়ভাবে, জরুরি জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করি। সেই সাথে সমস্ত নাগরিক সমাজকে হাত মেলাবার জন্য আমি আহ্বান জানাই। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

পার্বত্য চুক্তি ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধসহ চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি উপলক্ষে
সংবাদ সম্মেলন
২৯ নভেম্বর ২০১৭, বুধবার, হোটেল সুন্দরবন, ঢাকা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থপরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার ঘোষণা দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

গত ২৯ নভেম্বর ২০১৭ সকাল ১১ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিরি উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর সুন্দরবন হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

শ্রী লারমা তাঁর ঘোষণায় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে জুম্ম জনগণ আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই ২০১৬ সালে ঘোষিত দশদফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা– এই তিন দফা আন্দোলনের ঘোষণা দেন তিনি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতিও আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরার সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য তুলে করেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, মানবাধিকার কর্মী নুমান আহমেদ খান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের অর্থ সম্পাদক এন্ড্রু সলোমার প্রমুখ।

নিম্নে সংবাদ সম্মেলনে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পঠিত মূল সংবাদ বিবৃতি পত্রস্থ করা হলো :

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, এই দীর্ঘ সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বিষয়ই অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বলেছিলেন যে, চার দলীয় জোট সরকারের ৫ বছর এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর– মোট ৭ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকায় চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার সুযোগ ছিল না। তাই ২০০৯ সালে সরকার গঠনের মাধ্যমে চুক্তির প্রতিটি ধারা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে বলে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। কিন্তু বিগত ৯ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন

কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ পূর্বের মতোই অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। আরো উদ্বেগের বিষয় যে, শেখ হাসিনা সরকার কেবল চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় ফেলে রেখে দেয়নি, পক্ষান্তরে একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলশ্রুতিতে-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য তথা জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইনসমূহ সংশোধন করা হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়নি।
- তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষা, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে।
- সেটেলার বাঙালি, অস্থানীয় ব্যক্তি ও কোম্পানী, সেনাবাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূমি বেদখল বন্ধ হয়নি এবং বেদখলের ফলে উদ্ভূত পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি।
- 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ সেনাশাসনের অবসান হয়নি।
- ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণপূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন প্রদান করা হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ সুনিশ্চিত হয়নি।
- সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

গত ২০১৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের পর এক বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন আইনের ১৮নং ধারায় 'এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, যথাশীঘ্র সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে' মর্মে উল্লেখ রয়েছে। তদনুসারে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালার খসড়া গত ১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকার সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। এই বিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে কমিশনের ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত মামলার শুনানী বা বিচারিক কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন গঠিত হলেও কমিশনের নেই প্রয়োজনীয় জনবল ও তহবিল। খাগড়াছড়ি জেলায় কমিশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হলেও এখনো রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় শাখা কার্যালয় স্থাপন করা হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হকের মেয়াদ গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে শেষ হয়েছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি) এখনো চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান থাকলেও এখনো চার শতাধিক ক্যাম্প পার্বত্যাঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন জারি করে। এই 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। উক্ত সেনাশাসনের কারণে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে যত্রতত্র সেনা অভিযান, তল্লাসী, ধরপাকড়, মারপিট, দমন-পীড়ন এবং বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশের উপর হস্তক্ষেপ ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আন্দোলনরত কর্মীদেরকে চাঁদাবাজি, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকারকে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকায় সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংস, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উৎখাত, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। যেমন-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন, ১৯২৭ সালের বন আইন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন করার জন্য অব্যাহতভাবে দাবি জানানো হলেও সরকার আজ অবধি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্যবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজেদের দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে সরকার অতি দ্রুততার সাথে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৬ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ জাতীয় সংসদে পাশ করে থাকে।
- 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যালয়,

বাসভবন ও এতদসংশ্লিষ্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক' প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ 'প্রক্রিয়াধীন' রয়েছে মর্মে দোহাই দিয়ে বিগত দুই দশক ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ২০ বছরেও আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্সের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। অথচ পার্বত্যবাসীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ সরাসরি স্থাপন করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে কলেজসহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি নজর না দিয়ে সরকারের তথাকথিত উচ্চ শিক্ষার আয়োজনের পশ্চাতে গভীর ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়।

- পর্যটন (স্থানীয়) বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যতম বিষয় হলেও ২৮ আগস্ট ২০১৪ পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট উক্ত বিষয়টি অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করা হয়। ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত পর্যটন ছাড়া অন্য কোন পর্যটন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ারে রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে চুক্তি লঙ্ঘন করে সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে পর্যটনের প্রধান দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যা বিধিসম্মত নয়। জুম্মদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারা, ভূমি অধিকার এবং পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য বিবেচনায় না নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্বিচারে ব্যাপক হারে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যাপক এলাকা জবরদখল করা হচ্ছে। এসব জায়গা-জমি হচ্ছে জুম্মদের মৌজা ও জুম ভূমি। বন, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জুম্মদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে এবং এসব এলাকায় জুম চাষ, বাগান-বাগিচা গড়ে তোলা, মৌসুমী ক্ষেত-খামারে জুম্মদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। এর ফলে জুম্মদের জীবন-জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিধান মোতাবেক সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ কোন আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'-কে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসন; সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ; ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক বহিরাগতদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান এবং চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; অবাধে ভূমি বেদখল; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান; জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে, যার মূল লক্ষ্য হলো অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদেরকে যথাযথ ও সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের পরিবর্তে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সমতল জেলাগুলো থেকে বহিরাগত অভিবাসন অব্যাহত রয়েছে। সেটেলার বাঙালিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল, নারীর উপর সহিংসতা, পার্বত্য চুক্তির বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক তৎপরতা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের আমলে ১১টি সাম্প্রদায়িক হামলাসহ পার্বত্য চুক্তি-উত্তর সময়ে অন্তত ২০টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হলো জুম্মদেরকে তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা এবং জাতিগতভাবে নির্মূল করা।

- চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যতম একটা বিষয়। এই খণ্ডের ২৬নং ধারায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর ও অধিগ্রহণ করা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। পক্ষান্তরে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে ডেপুটি কমিশনারগণ অবৈধভাবে নামজারি, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদানের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, সেনাক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটনের নামে হাজার হাজার একর জমি বেদখল ও অধিগ্রহণ করা হচ্ছে যা সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় ২০১০ সালের এপ্রিলে হাই কোর্টের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপীল আবেদন করা হয়। কিন্তু আজ অবধি এই আপীলের কোন সুরাহা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে ইহা ক্রমাগত জটিলতর ও অনিশ্চিত হয়ে উঠছে।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ পূর্বের মতো 'শান্তি চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি ধারা আংশিক এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে' বলে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এখনো দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জনসংহতি সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে গত ১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ' সম্বলিত ১৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন এবং তৎসঙ্গে সহায়ক দলিল হিসেবে ১৬টি

পরিশিষ্ট সংযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রীর নিকট জমা দেয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় অব্যাহতভাবে অসত্য তথ্য প্রদান করে চলেছে।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি বরখেলাপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এখনো পূর্বের মতো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পরিবর্তে এসব পরিষদগুলোকে অথর্ব অবস্থায় রাখা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে ক্ষমতাসীন দলের শাখা অফিস ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। জনগণের প্রতি পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নেই কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা। পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম। তা সত্ত্বেও সরকার এসব দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ তো গ্রহণ করেনি, উপরন্তু আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।
- পার্বত্য চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান থাকলেও তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পুলিশ প্রশাসনের পুলিশ সুপার ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা চুক্তির এ বিধান লঙ্ঘন করে চলেছে। উল্লেখ্য যে, এসব কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নন। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী। ফলত এ যাবৎ আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যাবলী চালিয়ে যাচ্ছে, যা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরো অনিশ্চিত করে তুলেছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত গোয়েন্দা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে চলেছে। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের ন্যায্য আন্দোলনকে সন্ত্রাস হিসেবে চিত্রিত করে অপপ্রচার, দমন-পীড়ন, নির্যাতন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে উপনিবেশিক কায়দায় হস্তক্ষেপ করে চলেছে। বলাবাহুল্য চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় সেনাবাহিনীর অনেক কম্যান্ডার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তব্য প্রদান ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে থাকেন। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যক্রম সমর্থন না করতে ও কার্যক্রমে জড়িত না হতে জুম্ম জনগণকে হুমকি দিয়ে থাকেন। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জীবনধারা নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠেছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ও অত্যন্ত নাজুক। পার্বত্যবাসীরা বিশেষত জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত এক চরম বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে কঠিন জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। জুম্ম জনগণ এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে আজ সংকল্পবদ্ধ। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে রক্ত-পিচ্ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীর অধিকার সনদ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অর্জিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি ও কালক্ষেপণের মধ্য দিয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আবারও জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার যে কোন ষড়যন্ত্র এবং জুম্ম জনগণের এই চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের যে কোন চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনগণের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের আর পেছনে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে জুম্ম জনগণ আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আবারো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ঘোষণা করছে-

- **২০১৬ সালে ঘোষিত দশদফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া।**
- **পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করা।**
- **পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা।**

পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন: রাজনৈতিক সমাধান বনাম সরকারের উন্নয়নের জোয়ার

মঙ্গল কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয় তুলে ধরলেই সরকারের পক্ষ থেকে ফলাও করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়। উন্নয়নের ফিরিস্তি এমনভাবে তুলে ধরা হয় যেন কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ। তারই অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্রোড়পত্রে (ডেইলী স্টার, ২ ডিসেম্বর ২০১৭) এক নজরে 'পার্বত্য শান্তি চুক্তির অর্জন' সংক্রান্ত যে ১৮টি বিষয় দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ১২টি বিষয় হচ্ছে উন্নয়ন সংক্রান্ত। আর ৬টি বিষয় ছিল চুক্তি সংশ্লিষ্ট। যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি; তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ শক্তিশালীকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি নিষ্পত্তি কমিশন গঠন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পর্যটন, সমবায়, মৎস্য, সমাজ কল্যাণসহ ৩০টি বিভাগ/ বিষয় ৩ পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, এবং ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন- এই ৬টি বিষয় দেখানো হয়েছে যেগুলো চুক্তির বিভিন্ন ধারার সাথে সম্পৃক্ত।

উক্ত ক্রোড়পত্রে কথিত অপর ১২টি বিষয়ের মধ্যে দেখানো হয়েছে নতুন রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; সার্কেল চীফ/ হেডম্যান/ কার্বারীদের ভাতা বৃদ্ধি; ঢাকার বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ; তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রতি বছর শিক্ষা-বৃত্তি প্রদান; কৃষকদের উন্নয়নে মিশ্র ফলের বাগান সৃজন; রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণ; বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণ ও সাবস্টেশন স্থাপন; ৪০০০ পাড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; ৪টি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ; মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু; নিরাপদ পানি সরবরাহ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্বত্য চুক্তির দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে গত ১ ডিসেম্বর পার্বত্যবাসীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন যে, 'এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি হয়েছে। আজকে শান্তি চুক্তি হওয়ার ফলে সেখানে রাস্তাঘাট হয়েছে। আজকে সাজেক পর্যন্ত যাওয়া যায়।' উক্ত কনফারেন্সে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিংও তাঁর স্বাগত বক্তব্যের পুরোটা জুড়ে তুলে ধরেছিলেন উন্নয়নের নানা কথা। তিনি বলেছিলেন, 'এই উন্নয়নের ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই, ৭০-৭১ সালে সেই সময় যোগাযোগ ক্ষেত্রে যদি বলি সেখানে পাকা রাস্তা ছিলো মাত্র ৪৮ কিলোমিটার। আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের শুরু হওয়ার কারণে প্রায় ১৪০০-১৫০০ কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়েছে।'

'৭১ সাল থেকে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব নেয়ার আগ পর্যন্ত পার্বত্যাঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে কি হয় নাই সেটা এই লেখার বিচার্য নয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ধরন কী? এটা কি নিছক একটি অর্থনৈতিক বা উন্নয়ন সমস্যা নাকি একটি রাজনৈতিক সমস্যা? সরকারের নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য শুনলে মনে হবে যেন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। তাই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার এসব উন্নয়ন মহাযজ্ঞ বাস্তবায়ন করে চলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে দিয়ে চলেছে। বস্তুত বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক এবং জাতীয় সমস্যা। পূর্বের মতো ১ ডিসেম্বরের ভিডিও কনফারেন্সেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, 'রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে...।'

কিন্তু সরকারের বক্তব্যে বা চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিকভাবে সমাধানের বিষয়গুলো অত্যন্ত সন্তর্পনে ও সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রাক্কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে শাসিত হয়ে আসছে। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীন হলেও ব্রিটিশ শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের উপর কোন হস্তক্ষেপ করেনি। পরবর্তীতে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির মাধ্যমে উপনিবেশিক কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসনবহির্ভূত এলাকা হিসেবে ঘোষণা, জুম্ম জনগণের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা, বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন ও ভূমি মালিকানায় বিধিনিষেধ, ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন ইত্যাদি বিশেষ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে ১৯১৯ সাল ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনেও পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবহির্ভূত এলাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবহির্ভূত এলাকার মর্যাদা এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে ট্রাইবাল এরিয়ার মর্যাদার স্বীকৃত ছিল।

তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বকীয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, জুম্ম জাতিসমূহের স্বকীয় সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচিতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের পশ্চাদপদতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ১৯৭২ সালে

গণপরিষদে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের চার দফা দাবিনামা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করা হয়।

একের পর এক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই রাজনৈতিক সমস্যাকে সামরিক উপায়ে সমাধানের জন্য ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদমে তিনটি ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করে। পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের শাসনামলেও সামরিক কায়দায় জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে দমন করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। এক সময় জেনারেল জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন। সেই লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে উন্নয়ন বোর্ডের যাবতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম জুম্ম জনগণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে ব্যবহার করা হয়। সেসময় মুখ্যত সামরিক বাহিনী ও সরকারি উদ্যোগে বসতিপ্রদানকারী চার লক্ষাধিক সেটেলার বাঙালিদের অবাধে চলাচলের জন্য ব্যাপক রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম, অবৈধভাবে ভূমি বেদখল ও বন্দোবস্তী প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করা যায়নি। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আরো জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করে।

ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের জন্য আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। বলাবাহুল্য, সশস্ত্র আন্দোলনে অবতীর্ণ হলেও জনসংহতি সমিতিও বরাবরই আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের পথ খোলা রাখে। ফলে প্রথমে এরশাদ সরকারের সাথে ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক সংলাপ শুরু হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা হিসেবে সরকার পক্ষ স্বীকার করে নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় এরশাদ সরকারের সাথে ৬ বার, খালেদা জিয়া সরকারের সাথে ১৩ বার ও সর্বশেষ শেখ হাসিনা সরকারের সাথে ৭ বার আনুষ্ঠানিক সংলাপের ফসল হিসেবে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে সেই কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমাধান আজও অর্জিত হতে পারেনি। সরকার পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের প্রতি প্রাধান্য না দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কেবল উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে চলেছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হতে থাকে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকার সচতুরভাবে ধামাচাপা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সামরিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত করা না হলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করা না হলে, পক্ষান্তরে জুম্মদেরকে সংখ্যালঘু করার হীনউদ্দেশ্যে বহিরাগত অভিবাসন যদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে; সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, সকল প্রকার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় যদি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা না হলে; স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক নির্বাচনের মাধ্যমে যদি এসব পরিষদ গঠিত না হয়; চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পসহ অপারেশন উত্তরণ নামক সেনাশাসন যদি প্রত্যাহার করা না হয়; প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের যদি যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা না হয়; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ যদি নিষ্পত্তি না হয়, পক্ষান্তরে যদি ভূমি বেদখল ও জুম্মদেরকে তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে; বহিরাগতদেরকে যদি স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিয়ে চাকরিসহ নানা সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা অব্যাহত থাকে; তাহলে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানে কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা সহজেই অনুমেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তির পর ২০ বছর ধরে এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন উদ্যোগ নেই সরকারের। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নের কাজ বিগত ২০ বছর ধরে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দলের সদস্যদেরকে চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। নিজেদের দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে এভাবে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব পরিষদকে স্থায়ীভাবে পরিচালনার হীনউদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৫ সদস্য থেকে ১৫ সদস্যে বৃদ্ধি করে ২০১৪ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়। অনির্বাচিত বা মনোনীত এসব অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের জনমানুষের কাছে নেই কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা। ফলত এসব অন্তর্বর্তী পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্যদেরকে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধেও অবস্থান নিতে দেখা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যানকে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন তথা পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা ডেপুটি কমিশনারকেও অর্পণের ক্ষেত্রে এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের

নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে প্রচলিত ভোটার তালিকা (যেখানে বহিরাগতদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) দিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতেও আপত্তি নেই বলে মতামত ব্যক্ত করতে দেখা যায়। বলাবাহুল্য, ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পার্বত্যবাসীকে বঞ্চিত রেখে কিংবা জনগণের কাছে দায়বদ্ধহীন অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠনের অগণতান্ত্রিক ধারা বজায় রেখে হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলেও পার্বত্যবাসীর উন্নয়ন হতে পারে না। সেই উন্নয়ন কার্যক্রম কখনোই এলাকার জনমানুষের উন্নয়ন প্রত্যাশা পূরণ কিংবা পার্বত্য চুক্তির উদ্দেশ্য- পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে না।

১ ডিসেম্বরের ভিডিও কনফারেন্সে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর বলেছিলেন, '৭০-৭১ সালে যেখানে মাত্র ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা ছিল, সেখানে প্রায় ১৪০০-১৫০০ কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়েছে', সেই পাকা রাস্তার উপকারিতা পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীরা কিছুটা যে পাচ্ছে না তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু উপকারের চেয়ে ঢের বেশি অপকার বা ক্ষতির মুখোমুখী হচ্ছে এতদাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা। পার্বত্যাঞ্চলে যেখানেই পাকা রাস্তাঘাট নির্মিত হয়েছে সেখানে জুম্ম অধিবাসীরা ধীরে ধীরে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। তারা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিতাড়িত হতে বাধ্য হচ্ছে। আর পক্ষান্তরে সেখানে অবাধে সেটেলার বাঙালিদের অভিবাসন ঘটছে। সেটেলার বাঙালিরা যেখানেই যাচ্ছে সেখানে ভূমি জবরদখল করছে, স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কার্যত এ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন পার্বত্য চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের উপর চরম ক্ষতি সাধন করে চলেছে। উন্নয়নের নামে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প, সরকারি উদ্যোগে সমতল থেকে চার লক্ষাধিক বাঙালি বসতিপ্রদান, দুই লক্ষ আটার হাজার একর জুমভূমি ও মৌজাভূমিকে রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ এতদাঞ্চলের জুম্ম জনগণের চরম বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা ইত্যাদি বিবেচনা না করে নির্বিচারে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জুম্ম জনগণের চরম ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক অংশীদারিত্ব হিসেবে পার্বত্য চুক্তিতে 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা', 'আইন-শৃঙ্খলা' ও 'পুলিশ (স্থানীয়)' তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে বিধান করা হয়েছে। কিন্তু সরকার এসব বিষয় এখনো হস্তান্তর করেনি। পার্বত্য চুক্তির 'গ' খণ্ডের ৯(গ)নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের যে বিধান রয়েছে তা এখনো কার্যকর করা হয়নি। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে ১০ এপ্রিল ২০০১ সালে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার পরিপত্র জারি করা হলেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে।

বস্তুত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অগোচরে ও আলোচনা ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর গুইমারা উপজেলা, সাজেক থানা ও বড়থলি ইউনিয়ন গঠনের যে বিবরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও ভাষণে তুলে ধরা হয়েছে সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। সীমান্ত সড়ক নির্মাণ, ঠেগামুখ স্থল বন্দর স্থাপন, স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ ও পর্যটন কর্পোরেশনের উদ্যোগে বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষিত ও সংরক্ষিত বন ঘোষণা, অস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট ভূমি ইজারা প্রদান, বিজিবির অর্ধ-শতাধিক বিওপি স্থাপন ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ ছাড়াই গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হলেও এসব পরিষদসমূহকে অথর্ব অবস্থায় রাখার ফলে এখনো পূর্বের মতো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা আজ পূর্বের সরকারগুলোর অনুসৃত নীতির মতো জুম্ম স্বার্থ-পরিপন্থী ও চুক্তি বিরোধী হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত না হওয়ার ফলে চুক্তি-পূর্ব সময়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের মতো বর্তমান সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত অধিকাংশ উন্নয়ন কার্যক্রমও জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তথাকথিত এসব উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে জুম্ম জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা, পার্বত্যাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসী উন্নয়ন বিরোধী নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম দরকার নেই এমনটা বলার কোন অবকাশ নেই। বরঞ্চ পার্বত্য চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ৯ ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চুক্তিতে বিধৃত মৌলিক বিষয়সমূহ, যেগুলির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান, পার্বত্যবাসীর বিশেষ শাসনব্যবস্থার অংশীদারিত্ব, পার্বত্যাঞ্চলের অন্যতম সমস্যা ভূমি সমস্যার সমাধান, সংঘাতময় পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের পুনর্বাসন, পার্বত্যাঞ্চলে বলবৎ সেনা কর্তৃত্বের অবসান, সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের

বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ইত্যাদি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত সেসব মৌলিক বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই হতে পারে না কিংবা পার্বত্য জনমানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। উন্নয়ন কার্যক্রমকে অবশ্যই পার্বত্য চুক্তির উল্লেখিত মৌলিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের সাথে সমান তালে এগিয়ে নিতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবে উন্নয়ন কার্যক্রমকে পরিচালনা করতে হবে। চুক্তির মূল স্পিরিট তথা মৌলিক বিষয়সমূহকে খর্ব করে পরিচালিত কোন উন্নয়ন কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১ ডিসেম্বরের ভিডিও কনফারেন্সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে পূর্বে 'সামরিকী কায়দায় দমন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়' বলে জানিয়েছেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর সেই সামরিকী ধারার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে এমনটা বলার কোন অবকাশ নেই। পার্বত্য চুক্তিতে ছয়টি ক্যান্টনমেন্ট ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী ব্যতীত সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান করা হলেও এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প রয়েছে। অধিকন্তু পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারই ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এক প্রকার সেনা শাসন জারি করে কার্যত সেই সামরিকী ধারা বজায় রেখেছে। এই 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পার্বত্য চুক্তি-পূর্ব অবস্থার মতো সেনাবাহিনী বর্তমান সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে যত্রতত্র তল্লাসী অভিযান, দমন-পীড়ন এবং বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশের উপর হস্তক্ষেপ ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে। চুক্তি-পূর্ব সময়ে যেভাবে সেনাবাহিনী এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বার, হেডম্যান-কার্বারী, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ক্যাম্পে তলব করা বা তাদেরকে নিয়ে সভা-সমাবেশ-সম্মেলন আয়োজন করতো, ঠিক তেমনি বর্তমান সময়েও একই কায়দায় বিভিন্ন সেনা রিজিয়ন, জোন ও ক্যাম্প কর্তৃক নিয়মিত তলব কিংবা সভা-সমাবেশ-সম্মেলন আয়োজন করে থাকে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চুক্তি-পূর্ব সময়ে একের পর এক সরকার জনসংহতি সমিতি বা জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, চাঁদাবাজি কার্যক্রম হিসেবে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। কিন্তু শত অপপ্রচার সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের আন্দোলন একটি ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসেবে দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ফলশ্রুতিতে জনসংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সংলাপ চালিয়ে যেতে একের পর এক সরকারও বাধ্য হয়েছিল এবং একপর্যায়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকার দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল। চুক্তি-পূর্ববর্তী সময়ের মতো বর্তমান সময়েও শাসকশ্রেণি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বসহ আন্দোলনরত জুম্মদেরকে চাঁদাবাজি, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অপপ্রচার চালাতে কার্পণ্য করছে না। এসব সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত করে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রযন্ত্রসমূহ তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি জনসংহতি সমিতির কার্যক্রমকে সমর্থন না করতে ও কার্যক্রমে জড়িত না হতে জুম্ম জনগণকে হুমকি দিয়ে চলেছে। তাই যেখানে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের সামান্যতম নিশ্চয়তা নেই, যেখানে মানুষ প্রতিনিয়ত ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়, যেখানে মানুষ কখন কোন মুহূর্তে তাদের জায়গা-জমি হারাবে বা নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক অস্ত্র গুঁজে দিয়ে তুলে নিয়ে অমানুষিক নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে পঙ্গুত্ব জীবন বরণ করবে এমনিতর এক অনিশ্চিত ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে জুম্ম জনগণকে বসবাস করতে হয় সেখানে লক্ষ কোটি টাকার উন্নয়ন কিংবা নয়নাভিরাম রাস্তাঘাট দিয়ে কী হবে?

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এ ধরনের দমন-পীড়নের পেছনে অন্য যাই কারণ থাকুক না কেন, মূল উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা। এমনিতর পরিস্থিতির আলোকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে সামরিক দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ তথা জুম্ম জনগণের চুক্তি বাস্তবায়নের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমনের পথ বেছে নিয়েছে। পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের সামরিক নীতি পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকারও কার্যত গ্রহণ করে চলেছে বলে বললেও অত্যুক্তি হবে না। এমনিতর অবস্থায় আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্র দিনের পর দিন সীমিত হয়ে পড়ছে, যা দেশের সার্বিক স্বার্থে কখনোই কাম্য হতে পারে না।

১ ডিসেম্বরের ভিডিও কনফারেন্সে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছিলেন, 'সমতল ভূমি থেকে বহু মানুষ সেখানে (পার্বত্য চট্টগ্রামে) নিয়ে তাদেরকে রাখা হয়েছিলো। এভাবে দ্বন্দ্বটা আরো বেশি বৃদ্ধি করা হয়।' উল্লেখ্য যে, আনুষ্ঠানিক সংলাপ চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবির প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক তৎকালীন চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদল্লাহ নিশ্চিত করেছিলেন যে, উনিশ্শো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে সমতল অঞ্চলে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন দেয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন। সেই সূত্রে ২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর জনসংহতি সমিতির সভাপতির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের নিকটও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। বস্তুত এলক্ষ্যে পার্বত্য

চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্যাঞ্চলকে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বেহাত হওয়া জমি জুম্মদের নিকট ফেরত দেয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ শাসনকাঠামো প্রবর্তন, পাহাড়ি অধিবাসীদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণ, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান, জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান সংরক্ষণ প্রভৃতি বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত দুই দশকের মধ্যে আওয়ামীলীগ প্রায় ১৩ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও পার্বত্য চুক্তির উল্লেখিত ধারাসমূহ বাস্তবায়নে যেমনি সরকারের কোন উদ্যোগ বা সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়নি, তেমনি সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যথাযথ পুনর্বাসনের উদ্যোগও দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরঞ্চ চুক্তি-উত্তর সময় আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেও সেটেলার বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল ও বিতাড়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, আশ্রায়ণ প্রকল্পের নামে সেটেলার বাঙালিদের আবাসন সুবিধা প্রদান, বহিরাগতদেরকে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্তকরণ ও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে দেখা যায়। এ থেকে এটা নিদ্বির্ধায় বলা যায় যে, সেটেলার বাঙালিদের সমতল অঞ্চলে পুনর্বাসন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের মূল স্পিরিট থেকে বর্তমান সরকার সরে গিয়েছে। বিপরীতক্রমে 'সমতল থেকে মানুষ এনে পার্বত্যাঞ্চলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত জটিল করার' পূর্ববর্তী সরকারের অনুসৃত নীতি বর্তমান সরকারও কার্যত গ্রহণ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে উপনিবেশিক কায়দায় সমাধানের পথ গ্রহণ করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে অথর্ব রেখে, সেনা শাসন ও দমন-পীড়ন জারি রেখে, জুম্ম জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ ও বিতাড়ন অব্যাহত রেখে, সর্বোপরি চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী নীলনকশা জারি রেখে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হোক না কেন তা কখনোই পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়িত্বশীল শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে না তা বর্তমান সরকারকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। 'রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার' কোন বিকল্প নেই। একটি রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় সামরিক উপায়ে বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে কিংবা ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যেই এই সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান নিহিত রয়েছে তা সরকারকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন
জন্য পৃথক ও স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠনের দাবিতে
মানববন্ধন
আদিবাসী ছাত্র পরিষদ
আদিবাসী যুব পরিষদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাঙ্গামাটিতে একের পর এক মিথ্যা মামলা, ধরপাকড় ও হয়রানি

২৮ জনকে গ্রেফতার, ৪২ জনকে নির্যাতন, ১০৯টি ঘরবাড়ি তল্লাসী

HEAVY METAL

সম্প্রতি নভেম্বর ২০১৭ থেকে রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ এবং সেনা-পুলিশের উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করার ষড়যন্ত্র জোরদার হয়েছে। অন্যদিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশ গভীর রাতে তিন উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী অভিযান পরিচালনার নামে নিরীহ গ্রামবাসীদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ঘরবাড়ি তল্লাসী, মারধর ও গ্রেফতার করে চলেছে। তিন উপজেলায় এ যাবৎ ১৪৬ জন (নাম উল্লেখ করে) এবং ১০৫-১২৩ জন অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে এ ধরনের ৮টি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর থেকে বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ফারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের একজন মেম্বারসহ নিরীহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ এবং ৪২ জনকে নির্যাতন ও হয়রানি করা হয়। কমপক্ষে ১০৯টি ঘরাবাড়ি তল্লাসী ও এসব ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। দুই মারমা বোনের শ্লীলতাহানী করা হয়েছে। এতে করে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

তিন পার্বত্য জেলায় উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, টেন্ডারবাজি, নজিরবিহীন নিয়োগ-বাণিজ্য, অনিয়ম ও দুর্বৃত্তায়ন, সর্বোপরি আওমালীলীগ সরকারের ৯ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনমানুষের চরম অসন্তোষকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীনউদ্দেশ্যে স্থানীয় সেনা-পুলিশের যোগসাজশে আওয়ামীলীগ সম্প্রতি কোন ঘটনা ঘটলেই সেই ঘটনার সাথে জড়িত করে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ কে বা কারা জুরাছড়িতে আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা অরবিন্দু চাকমাকে হত্যা ও বিলাইছড়িতে রাসেল মারমাকে মারধর, এবং ৭ ডিসেম্বর বিলাইছড়ি উপজেলায় আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি রাসেল মারমাকে এবং রাঙ্গামাটি শহরে মহিলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ঝর্ণা খীসাকে মারধর করে। কিন্তু এসব ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে স্থানীয় আওয়ামীলীগ, পুলিশ ও সেনাবাহিনী অপপ্রচার চালাতে থাকে এবং নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে।

রাঙ্গামাটিতে দায়েরকৃত মামলা ও অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা

তারিখ	থানা	মামলাকারী	অভিযুক্তের সংখ্যা	অজ্ঞাতনামা
২০-১১-২০১৭	বিলাইছড়ি	অমৃত কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা	১৮	১০/১২
০৭-১২-২০১৭	বিলাইছড়ি	রাম চরণ মারমা	৩১	১০/১২
০৭-১২-২০১৭	জুরাছড়ি	মো: মঈনউদ্দিন এসআই	৯	১৫/২০
০৭-১২-২০১৭	রাঙ্গামাটি	ঝর্ণা খীসা	২১	৩০/৪০
১২-১২-২০১৭	বিলাইছড়ি	মো: নজরুল ইসলাম	২	-
২৩-১২-২০১৭	বিলাইছড়ি	সজীব তঞ্চঙ্গ্যা	৩১	১০/১২
০৩-০১-২০১৮	বিলাইছড়ি	অজরায় তঞ্চঙ্গ্যা	১৮	১০/১২
০৭-০২-২০১৮	বিলাইছড়ি	তরুণ কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা	১৬	১০/১৫
মোট			১৪৬	১০৫/১২৩

সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার, মারধর ও হয়রানির শিকার ব্যক্তি এবং ঘরবাড়ি তল্লাসীর সংখ্যা

ঘটনার তারিখ	ঘটনাস্থল	গ্রেফতার	মারধর ও হয়রানি	ঘরবাড়ি তল্লাসী
১৮-১১-২০১৭	বিলাইছড়ির ফারুয়া	-	৫	৫৫
০৭-১২-২০১৭	বিলাইছড়ির দীঘলছড়ি ও কেঙড়াছড়ি	৫	৩	-
০৭-১২-২০১৭	রাঙ্গামাটির রাঙ্গাপানি ও ভেদভেদী	৭	-	১
০৮-১২-২০১৭	বিলাইছড়ির তক্তানালা	-	৬	-
০৮-১২-২০১৭	রাঙ্গামাটির আসামবস্তী	২	-	১
১০-১২-২০১৭	রাঙ্গামাটির বনবিহার এলাকা	-	৩	-
১০-১২-২০১৭	জুরাছড়ির সদর এলাকা	৫	-	-
১০-১২-২০১৭	রাজস্থলীর সদর	-	-	১
১১-১২-২০১৭	জুরাছড়ির সদর এলাকা	-	-	৫
১১-১২-২০১৭	বিলাইছড়ির ইজাছড়ি	১	-	-
১২-১২-২০১৭	বিলাইছড়ির বাজার ও ফারুয়া	-	৪	-
২২-১২-২০১৭	বিলাইছড়ি	৫	৭	-
২৪-১২-২০১৮	বিলাইছড়ির ফারুয়া	১	৩	-
২১-০১-২০১৮	বিলাইছড়ির ফারুয়া	২	-	-
২২-০১-২০১৮	বিলাইছড়ির ফারুয়া	-	৫	৪০
২৯-০১-২০১৮	বিলাইছড়ির ফারুয়া	-	৪	-
০৭-০২-২০১৮	বিলাইছড়ির শামুকছড়ি	-	-	১
১২-০২-২০১৮	বিলাইছড়ির ফারুয়া	-	২	৫
মোট		২৮	৪২	১০৯

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলা মহিলা আওয়ালীলীগের সহ-সভাপতি ঝর্ণা খীসাকে দুর্বৃত্ত কর্তৃক হামলা চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝর্ণা খীসার নামে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা ও থানা কমিটির অনেক সদস্যের (মোট ২১ জনের) বিরুদ্ধে একটি সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়। জানা যায়, ঝর্ণা খীসা নিজেই বলেছেন, হামলাকারীদের তিনি চিনতে পারেননি। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রামে রওয়ানা দেয়ার আগ মুহূর্তে গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ ঝর্ণা খীসা থেকে সাদা কাগজে একটি স্বাক্ষর নেন। উক্ত দস্তখত দিয়েই জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমা ও রাঙ্গামাটি থানা কমিটির সহ-সভাপতি অংকুর চাকমাসহ ২১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। অনুরূপভাবে জনৈক মো: নজরুল ইসলামকে বাধ্য করে তাকে দিয়ে গত ১২

ডিসেম্বর ২০১৭ বিলাইছড়ি থানায় কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের ইজাছড়ি গ্রামের জনসংহতি সমিতির গ্রাম কমিটির সভাপতি কমল চাকমার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা করা হয়। তার আগের দিন ১১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত আনুমানিক ১:০০ টার দিকে দীঘলছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য কমল চাকমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ইজাছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে আটক করে নিয়ে আসে। ক্যাম্পে নিয়ে সেনা সদস্যরা তাঁর উপর অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে। তার পরদিন মো: নজরুল ইসলাম কর্তৃক কমল চাকমাসহ দুইজনের বিরুদ্ধে একটি চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয় এবং ঐ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি ঘটনায় রাঙ্গামাটি জেলা ছাত্রলীগের সহ সম্পাদক সুপায়ন চাকমা আহত হওয়ার ঘটনায় পিসিপি জড়িত বলে ছাত্রলীগ অপপ্রচার চালায়। ক্রিকেট খেলে বাসায় ফেরার সময় স্টেডিয়াম এলাকায় সুপায়ন চাকমার উপর একদল পিসিপি কর্মী হামলা করে বলে ছাত্রলীগ ব্যাপক গুজব ছড়ায়। সাথে সাথে সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ একযোগে বনরূপা, কলেজ গেইট ও ভেদভেদীতে পিসিপি ও জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে জঙ্গী মিছিল বের করে। যাত্রীবাহী গাড়ি থামিয়ে জুম্মদের মারধরের চেষ্টা করে। তারা কল্যাণপুর এলাকায় হামলা করার চেষ্টা করে। এতে পুলিশ বাধা দিলে ছাত্রলীগের কর্মীরা পুলিশের উপরও চড়াও হয়। সংবাদ সংগ্রহকালে বনরূপায় দৈনিক সমকালের সংবাদদাতা ও একুশে টিভির প্রতিনিধি সত্রং চাকমার উপর হামলা করে। পিসিপির বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ এনে ১৩ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলায় আহুত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তরা ম্যানসন চাকমা নামে এক নিরীহ ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করে। এছাড়া কামাল এবং সাইফুল ইসলাম নামে আরো দুইজন স্থানীয় বাঙালি সাংবাদিককে মারপিট করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। অথচ সুপায়ন চাকমার উপর হামলার ঘটনার সাথে পিসিপির কোন সদস্য জড়িত ছিল না এবং ঘটনার সময় পিসিপির কোন সদস্যও স্টেডিয়াম এলাকায় উপস্থিত ছিল না। এভাবে কোন ঘটনা ঘটলেই শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের জড়িত করে অপপ্রচার ও হয়রানি শুরু করে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলাতেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেনা-পুলিশের যোগসাজশে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে হয়রানি করা, দুর্বল করা এবং এলাকা ছাড়া করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। গত ২০১৬ সালে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের, নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ৩০ জনকে গ্রেফতার, ৫৯ জনকে সাময়িক আটক ও হয়রানি, ৮৯ জনকে মারধর এবং জনসংহতি সমিতির প্রায় দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকা ছাড়া করা হয়।

যেমন গত ১৪ জুন ২০১৬ বান্দরবানে মংপু মারমা অপহরণকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবানে অবস্থানরত সিনিয়র সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন, কে এস মং, জলি মং, ক্যবা মং, উছো মং, শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যাসহ ৩৮ জন ও অজ্ঞাতনামা ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করে এবং শুধু মংপু মারমা অপহরণ মামলা করে ক্ষান্ত না হয়ে পরপর আরো ৩টি মিথ্যা ও সাজানো মামলা দায়ের করে। মোট মামলা সংখ্যা ৪টি দাঁড়ায়। ৪টি মামলায় প্রায় শতাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করে। সকলে ফেরারী জীবন যাপনের এক পর্যায়ে আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে জামিনে মুক্ত থেকে আইনকে সম্মান করে আদালতে হাজিরা দিতে থাকেন।

বান্দরবানে দায়েরকৃত মামলা ও অভিযুক্ত ব্যক্তি সংখ্যা

তারিখ	থানা	মামলাকারী	অভিযুক্তের সংখ্যা	অজ্ঞাতনামা
১৪ জুন ২০১৬	বান্দরবান সদর	হ্লামং চিং মারমা	৩৮	১৫/২০
১ আগস্ট ২০১৬	বান্দরবান সদর	মো: আবদুল করিম	১১	১৫/২০
১৮ আগস্ট ২০১৬	বান্দরবান সদর	মংসানু মারমা	১৬	৩০/৪০
২৩ আগস্ট ২০১৬	বান্দরবান সদর	মো: মহিউদ্দিন	১৯	১৫/২০
১৫ নভেম্বর ২০১৭	বান্দরবান সদর	মো: আবদুল আলীম	২৪	১০/১৫
মোট			১০৮	৮৫/১১৫

উল্লেখ্য যে, ৪টি মামলার মধ্যে একটি মামলা খারিজ হয়ে যায়। অভিযুক্তরা বাকি মামলাগুলোতে জামিন নিয়ে আদালতে হাজিরা দিয়ে আসছেন। কিন্তু মামলা চলাকালীন খারিজ হয়ে যাওয়া মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে পুনঃরায় আসামীভুক্ত করে গত ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আরেকটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়। সেদিন বান্দরবান জেলার রাজভিলায় সংঘটিত এক তুচ্ছ ঘটনা সাথে পরিকল্পিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, যুব সমিতি এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্র ও শাখাসমূহের সদস্যদের ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যাভাবে জড়িত করে মো: আবদুল আলীম নামক ভাড়ায় চালিত জনৈক মোটর সাইকেল চালক কর্তৃক ২৪ জনের নামে ও অজ্ঞাতনামা ১০/১৫ জনের বিরুদ্ধে বান্দরবান সদর থানায় চাঁদাবাজি ও হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার অভিযোগ এনে এক মামলা

দায়ের করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনায় প্রথম থেকে সুনির্দিষ্টভাবে তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে রাজভিলা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ ও মামলার বাদী উভয়ে দাবি করেছেন। কিন্তু স্থানীয় আওয়ামীলীগের কতিপয় ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে তিনজনের স্থলে ২৪ জনের নাম দিয়ে পরবর্তীতে মামলাটি রুজু করা হয়। মো: আবদুল করিম মামলাটি করেননি বলে ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেফিটও করেছেন। আইনকে শ্রদ্ধা করে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে গত ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ উক্ত মামলায় আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিনের আবেদন করা হলে তিনজন যথাক্রমে রোয়াংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ক্যবা মং মারমা, নোয়াপতং ইউপি চেয়ারম্যান অংথোয়াইচিং মারমা ও নোয়াপতং ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে জামিনের আবেদন আমলে নিয়ে বাদবাকি ১৫ জনকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

শুধু নতুন মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ নয়, জামিনে থাকা জুম্ম গ্রামবাসীরা আদালতে হাজিরা দিতে গেলে তাদেরকে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক অবৈধভাবে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে মারধর ও আরো অন্য মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণের ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে বান্দরবানে।

এভাবেই জামিনে থাকা ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে একের পর এক নতুন মামলা দায়ের করা এবং অবৈধভাবে ধরে নিয়ে বিচার-বহির্ভূত শারীরিক নির্যাতন এবং মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণের ঘটনা সরাসরি সংবিধানের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল বলে বিবেচনা করা যায়। এধরনের ঘটনা কখনোই আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিচায়ক বহন করে না।

বিশেষ প্রতিবেদন

লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলার আট মাস

ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণে নেই কোন অগ্রগতি এবং দোষীদের বিচারেও অনিশ্চয়তা

গত ২ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার তিনটি গ্রামে সেনা-পুলিশ-ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের উপর বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলার আট মাস ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িঘর নির্মাণ শুরু করা যায়নি। সরকারের প্রশাসনিক ও বাড়ি নির্মাণ প্রক্রিয়ার নানা জটিলতায় যেন আটকে আছে এর অগ্রগতি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম পরিবারসমূহ এখনও দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি

মাসিক ৩০ কেজি চাল রেশন প্রদান শুরু হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের সূত্রে অনেক পরিবারের জন্য তা অপ্রতুল বলে জানা গেছে। অপরদিকে উক্ত বর্বরোচিত হামলায় জড়িত ও মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের বিচার নিশ্চিতকরণেও দেখা যাচ্ছে চরম অনিশ্চয়তা। তালিকাভুক্ত আসামীরা প্রশাসনের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রেপ্তারকৃতরাও অধিকাংশই জামিনে ছাড়া পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ১ জুন ২০১৭ খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কে কার বা কাদের দ্বারা হত্যার শিকার নুরুল ইসলাম নয়নের লাশ উদ্ধারের পর এই হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করে পরদিন ২ জুন ২০১৭ সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক জুম্ম অধ্যুষিত লংগদু উপজেলা সদরের তিনটিলা এবং পার্শ্ববর্তী মানিকজোরছড়া ও বাত্যাপাড়ায় এই সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। সেনা-পুলিশের ছত্রছায়ায় স্থানীয় আওয়ামী-যুবলীগের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিদের এই হামলায় গুণমালা চাকমা (৭৫) নামে এক বৃদ্ধকে অগ্নিসংযোগে হত্যাসহ জুম্মদের ২১৮টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত এবং ৮৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও লুটপাট করা হয়। জুম্মদের তালিকা অনুযায়ী বসতবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৪ কোটি টাকা।

আট মাসেও শুরু হয়নি বাড়ি নির্মাণ

হামলার ঘটনার পর আট মাসেও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ি নির্মাণ শুরু করা যায়নি। এমনকি কবে নাগাদ তা শুরু হবে ও সম্পন্ন হবে এ নিয়েও রয়ে গেছে অনিশ্চয়তা। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে কঠিন এক ভোগান্তির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের কিছু পরিবার এখনও আশ্রয়কেন্দ্রে, কিছু পরিবার ভাড়া বাসায়, কিছু পরিবার আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে এবং অনেক পরিবার অস্থায়ী ছোট মাচাং ঘর তুলে কোনমতে সময় অতিবাহিত করছে। বিশেষ করে যারা অস্থায়ী মাচাং ঘর বা আশ্রয়স্থল তৈরি করে রয়েছে তারা এই কনকনে শীতের সময়টাতে একপ্রকার মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। আর শীতকালটা প্রায় শেষ হতে চললেও সামনে আসছে বর্ষাকাল। তাই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ঘটনার কিছু দিন পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারকে পুনর্বাসন বাবদ নগদ ৫ লক্ষ টাকা প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ক্ষতির তুলনায় এ বরাদ্দ একেবারে অপ্রতুল হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ বাড়ি নির্মাণসহ তাদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তা কাজের লাগবে–এই আশায় তা গ্রহণ করতে রাজি হয়। কিন্তু পরে সরকার পরিবার পিছু নগদ টাকা প্রদানের পরিবর্তে সরকারের আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় ২১২টি পরিবারের বসতগৃহ (৩ কক্ষ বিশিষ্ট) ও ৮টি দোকান নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা সরকার কর্তৃক বাড়ি নির্মাণের পরিবর্তে নগদ অর্থ দাবি করে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি উপেক্ষা করে সরকার কর্তৃক ১৭৬টি পরিবারের প্রতি বাড়ি নির্মাণ বাবদ আইটিভ্যাট ১০%সহ ৫,২৫,০০০ টাকা করে মোট ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তহবিলে জমা করা হয় বলে জানা যায়। প্রকল্প কমিটির তত্ত্বাবধানে টেন্ডারের মাধ্যমে উক্ত ১৭৬টি বাড়ি নির্মাণ করা হবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ টেন্ডার ছাড়া প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাড়িগুলি নির্মাণ করে দেওয়ার দাবি জানায়। তাছাড়া ভাড়াটিয়া দোহাই দিয়ে ২১২ পরিবারের মধ্যে ৩৬টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে এই ঘরনির্মাণ সুবিধা থেকে বাদ দেয়ার বিষয়টিও সরকারের নিকট তুলে ধরে ক্ষতিগ্রস্তরা।

এরপর লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক বাড়ি নির্মাণ কাজের ৪টি প্যাকেজ করে প্রতি প্যাকেজে ৪৪টি বাড়ি মোট ১৭৬ বাড়ি নির্মাণের জন্য এ পর্যন্ত প্রথমবার গত ২ ডিসেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এবং দ্বিতীয়বার প্রথমবারের মেয়াদ বাড়িয়ে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দরপত্র দাখিলের সময় ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুই দুইবার দরপত্র ঘোষণা করা হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাড়ি নির্মাতা কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উক্ত বাড়ি নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র দাখিল করেনি। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাড়ি নির্মাণ কাজটি এখন অনিশ্চিত অবস্থায় বিরাজ করছে। জানা গেছে, প্রথমত সীমিত বাজেট অর্থাৎ নির্মাণ সামগ্রীর বর্তমান বাজার দরের সাথে বরাদ্দ বাজেটের সামঞ্জস্যহীনতা, দ্বিতীয়ত প্যাকেজসমূহের আকার বড় হওয়ার কারণে আগ্রহী ঠিকাদাররাও এগিয়ে আসছেন না। জানা গেছে, এ ব্যাপারে সর্বশেষ গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাঙ্গামাটি ডিসি কার্যালয়ে ডেপুটি কমিশনারের উপস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের প্রতিনিধি ও লংগদু উপজেলা কার্যালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পূর্বের ৪টি প্যাকেজের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে ১০টি প্যাকেজে বিভক্ত করে বাড়ি নির্মাণের জন্য পুনরায় দরপত্র ঘোষণা করা এবং এব্যাপারে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক, আশ্রায়ন প্রকল্প-২ এর নিকট প্রস্তাব জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অপ্রতুল সরকারী ত্রাণ

ঘটনার পর রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে পরিবার প্রতি এককালীন নগদ ৬ হাজার টাকা, ২ বান্ডিল ঢেউ টিন, ৩০ কেজি চাল ও ২টি করে কম্বল প্রদান করা হয়। পরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পরিবার প্রতি এককালীন নগদ ৫ হাজার টাকা, ১টি লুঙ্গি, ১টি গামছা, ১ সেট তাতের পিনন-খাদি, ১টি মশারী ও শিশুদের জন্য কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এরপর সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আর কোন ত্রাণ বা রেশন প্রদান করা হয়নি। তবে সম্প্রতি লংগদু উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে গত অক্টোবর ২০১৭ হতে ১ বছরের জন্য পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি চাল রেশনবাবদ বরাদ্দ প্রদান অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা ইতোমধ্যে অক্টোবর ২০১৭ হতে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত চার মাসের রেশন উত্তোলন করেছেন বলেও জানা যায়। তবে বেশ কিছু পরিবারের আকার তুলনামূলকভাবে বড় হওয়ার কারণে সেই পরিবারসমূহের জন্য এই বরাদ্দ অপ্রতুল বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতরা অধিকাংশই মুক্ত, তালিকাভুক্ত আসামীরা ঘুরছে প্রকাশ্যে

ঘটনার পরপরই হামলা ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের পক্ষ থেকে কিশোর চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা এবং লংগদু থানার এসআই দুলাল হোসেন কর্তৃক দায়েরকৃত পুলিশী মামলার আসামী হিসেবে এ পর্যন্ত ৩৪ জন সেটেলার বাঙালিকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা গেছে। তবে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মূল হোতা ও অংশগ্রহণকারী এবং উক্ত দুই মামলার তালিকাভুক্ত আসামীদের অনেকেই গ্রেপ্তারের বাইরে থেকে যায়। এমনকি সেই আসামীদের গ্রেপ্তারে প্রশাসনের কোন উদ্যোগও দেখা যায়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এদিকে ঘটনার পর যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইতোমধ্যে জামিনে ছাড়া পেয়েছে বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, আরও উদ্বেগের বিষয় হল– যারা মামলার তালিকাভুক্ত আসামী এবং হামলা ও অগ্নিসংযোগ ঘটনার মূল হোতা ও অংশগ্রহণকারী তারা এখন প্রকাশ্যে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন তাদের গ্রেপ্তার তো দূরে থাক, দেখেও না দেখার ভান করে চলেছে। ফলে এ নিয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ, আতঙ্ক এবং প্রশাসনের প্রতি আস্থাহীনতা বিরাজ করছে।

এ হামলায় ক্ষতিগ্রস্তরা চারটি মামলা দায়ের করলেও পুলিশ মাত্র কিশোর চাকমা কর্তৃক ৯৮ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা ৩০০/৪০০ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এজাহারটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করে। উক্ত মামলায় ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ৫৫ জন আদালত থেকে জামিন নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। বর্তমানে মাত্র ৭ জন অভিযুক্ত জেলে রয়েছে। অভিযুক্ত আরো ৩৬ জন পলাতক রয়েছে মর্মে বলা হলেও তারা পুলিশের নাকের ডগায় প্রকাশ্য ঘুরাফেরা করে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এ্যাডভোকেট আবছার আলী। রাঙ্গামাটি জেলা আদালত প্রাঙ্গণে পুলিশের সামনে ঘোরাফেরা করলেও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার না করে পলাতক হিসেবে দেখিয়েই চলেছে। পুলিশ কর্তৃক দায়েরকৃত আরেকটি মামলায় ইতিমধ্যে ৩২ জন জামিনে বেরিয়ে গেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে মাত্র ৩ জন জেলে রয়েছে। এছাড়া গুণমালা চাকমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় তার মেয়ে কালাসোনা চাকমা মামলা করলেও তা জিডি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। আশ্চর্যজনক যে, গুণেমালাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলেও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী বিশ্বাসই করে না। পুড়ে যাওয়া হাড়গোড় ডিএনএ পরীক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসন গড়িমসি করে চলেছে। অপরদিকে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে এত বড় নৃশংস ঘটনা ঘটলেও তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বা আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এমনিতর অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্তরা ন্যায় বিচার নিয়ে আশঙ্কা করছেন। এই বিচারহীনতার কারণে এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে।

গ্রেপ্তার এড়িয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরাকারী এসব আসামী ও হামলাকারীরা হল– ১. মোঃ জুয়েল, আওয়ামীলীগ; ২. খলিলুর রহমান, সভাপতি, সমঅধিকার আন্দোলন, লংগদু উপজেলা কমিটি (আওয়ামীলীগে যোগদান করেছেন); ৩. সাইফুল ইসলাম, ঠিকাদার, (সবদলের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন); ৪. ফারুক মেম্বার, মেম্বার, লংগদু ইউনিয়ন পরিষদ (আওয়ামীলীগ); ৫. মোঃ কাইয়ুম, মেম্বার, মাইনীমুখ ইউনিয়ন (আওয়ামীলীগ); ৬. চান মিয়া, ব্যবসায়ী (আওয়ামীলীগ); ৭. মোঃ রাসেল (আওয়ামীলীগ); ৮. এ্যাডভোকেট আবছার আলী, সমঅধিকার আন্দোলন; ৯. মোসাম্মৎ আফরোজা তানিয়া ওরফে হাওয়া, সভাপতি, মহিলালীগ, লংগদু উপজেলা।

বিশেষ প্রতিবেদন

বিলাইছড়িতে দুই মারমা বোনের শ্লীলতাহানি ভিকটিম ও পিতা-মাতাকে আইন-বহির্ভূত অন্তরীণ

গত ২২ জানুয়ারি ২০১৮ রাত আনুমানিক ২:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ওড়াছড়ি গ্রামে এক মারমা কিশোরী (১৯) ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার সুবেদার মিজানের নেতৃত্বাধীন সেনাসদস্য কর্তৃক নিজ বাড়িতে ধর্ষণের শিকার এবং তার আরেক ছোট বোন (১৫) শ্লীলতাহানির চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায় যে, গত ২২ জানুয়ারি গভীর রাতে ১৩ বেঙ্গলের দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার সুবেদার মিজানের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য ঐ সময় উক্ত ওড়াছড়ি গ্রামে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারী খোঁজার নামে তল্লাসী অভিযান চালায়। এ সময় সেনা সদস্যরা একের পর এক ঘরবাড়িতে ঢুকে তল্লাসী করে। তল্লাসীর সময় লোকজনদেরকে বেপোরোয়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের কাছ থেকে আইডি কার্ড খুঁজতে থাকে। সেনাসদস্যরা লোকজনদের চোখে জোরালো টর্চের আলো ফেলে হয়রানি করতে থাকে।

এক পর্যায়ে সেনাদলের দুই সদস্য তল্লাসীর কথা বলে উক্ত তরুণীর বাড়িতে প্রবেশ করে ভিকটিমের বাবা-মাকে বাড়ির বাইরে আসতে বাধ্য করে। এরপর সেনাসদস্যদের মধ্যে একজন দরজায় অস্ত্র উচিয়ে থাকে, অপরজন উক্ত মারমা তরুণীর কক্ষে ঢুকে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠে। ধর্ষণের সময় তরুণী চিৎকার করলেও অস্ত্রের মুখে বাবা-মা এগিয়ে যেতে পারেনি। এ সময় ধর্ষণের শিকার তরুণীর আরেক ছোট বোনকেও শ্লীনতাহানির চেষ্টা করা হয় বলে জানা যায়।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধর্ষণের ঘটনাটি সেনাদলের কম্যান্ডার সুবেদার মিজানকে জানানো হলেও তিনি এ ব্যাপারে নিজে তদন্ত করে শাস্তি দেবেন বলে জানান। তবে তিনি এ ব্যাপারে কাউকে না জানানোর নির্দেশ দেন। একপর্যায়ে ধর্ষণকারী সেনা সদস্য ভিকটিমের বাবাকে ১০০ টাকা গুঁজে দেন ভিকটিমকে দেয়ার জন্য। ভিকটিমের বাবা সাথে সাথে উক্ত টাকা সেনা সদস্যকে ফেরৎ দেন বলে জানা যায়। আর যাওয়ার সময় এলাকার মেম্বার, কার্বারী ও হেডম্যানকে পরদিন সকালে ফারুয়া সেনা ক্যাম্পে গিয়ে দেখা করার নির্দেশ দেন।

ঘটনা প্রকাশ না করতে সেনাসদস্যদের হুমকি:

২২ জানুয়ারি ভোরে ঘটনার পর দিনের বেলায় ফারুয়া ক্যাম্পের একদল সেনা ওড়াছড়িতে ভিকটিমের বাবার বাড়িতে গিয়ে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসেন এবং কেউ এসে জানতে চাইলে 'ধর্ষিত হয়েছে' বলে কেউ যাতে না বলে তা নির্দেশ দিয়ে আসেন। বললে মেরে ফেলা হবে বলেও তারা হুমকি দেন। তবে 'শুধু একটু গায়ে ধরে টানাটানি করা হয়েছে' মর্মে বলা যাবে বলে জানিয়ে আসেন। ২৩ জানুয়ারি রাংগামাটি জেলার পুলিশ সুপার সাঈদ তারিকুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: নজরুল ইসলাম, বিলাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসিফ ইকবাল, সহকারী পুলিশ সুপার (বিলাইছড়ি সার্কেল) আলাম ইকবাল প্রমুখ কর্মকর্তাবৃন্দ ওড়াছড়িতে গিয়ে ভিকটিমের পিতা-মাতা ও এলাকার মুরুব্বিদের সাথে দেখা করে ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং কথা বলার সময় ভিডিও রেকর্ডিং করেন বলে জানা যায়। সেনা সদস্যরা যেভাবে বলতে বলেছেন ঠিক সবাই সেভাবে এডিসি ও এসপির নিকট কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ভিকটিমদের রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নেয়া বন্ধ করতে ২৩ জানুয়ারি সারাদিন গাছকাবাছড়া ক্যাম্পের চেকপোস্টে যাত্রীবাহী বোট ও নৌকা থামিয়ে মারমা লোকজন খোঁজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আওয়ামীলীগের নেতার সংবাদ সম্মেলন ও মিথ্যাচার:

এই অমানবিক ও বর্বরোচিত ঘটনাকে রাজনীতিকরণ তথা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার হীন উদ্দেশ্যে দুই ভিকটিমের পিতা-মাতাকে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ধরে এনে তাদের উপস্থিতিতে বিলাইছড়ি উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি রাম চরণ মারমা ওরফে রাসেল মারমা রাঙ্গামাটি জেলা প্রেস ক্লাবে 'বিলাইছড়ি উপজেলায় ফারুয়াতে দুর্বৃত্তদের নির্যাতনের প্রতিবাদে' এক ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদ সম্মেলন করেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে রাসেল মারমা দাবি করেন যে, 'ওইদিন নিরাপত্তা বাহিনীর একটি টহল দল ওই এলাকায় সরকারি কাজে গিয়েছিল, তারা তাদের কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার বেশ কিছু সময় পর, আমরা (দুই কিশোরীর পিতা-মাতা) ওই দুই কিশোরীকে সুস্থ অবস্থায় ঘরে রেখে তার পিতা-মাতা সংসারিক কাজে বাড়ির আশেপাশেই ঘরের বাইরে যান। এ সময় একদল স্থানীয় যুবক কে বা কারা (কে বা কারা দূর থেকে চিনা যায়নি) ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক তাদের তুলে নিয়ে যায় এবং নির্যাতন চালায়। ...ওই সময় আমরা সেখানে কোনো সরকারি পোষাকধারী লোকজনকে দেখতে পাইনি।'

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে রাসেল মারমা এসব কথা বললেও সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ভিকটিম সহোদরার ছোট ভাই মারমা ভাষায় বলেছিল যে, 'লোকেরা ছিল আর্মিদের পোশাক পরা। বাড়িতে উঠে টর্চ লাইট বন্ধ করে দেয়। কথা বলতে চাইলে মাথায় বন্দুক তাক করে। তিনবার উঠানামা করে সেনা সদস্যরা। কিছুক্ষণ পর মেঝ দিদি চিৎকার করে এবং চিৎকার শুনে মামুরা ছুটে আসে।'

বিলাইছড়ি থানায় পুলিশের জিডি:

উক্ত ঘটনার উপর গত ২৩ জানুয়ারি পুলিশ বিলাইছড়ি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী (জিডি নং ৬৫০) দায়ের করে। বার্তা নং ১৪৬ তারিখ ২৩/০১/২০১৮ মূলে এক বার্তা যোগে বিলাইছড়ি অফিসার ইনচার্জ থেকে রাঙ্গামাটি জেলার পুলিশ সুপারের কাছে এই জিডি পাঠানো হয়। উক্ত জিডিতে উল্লেখ করা হয় যে, 'কথিত ভিক্টিমের প্রতিবেশী প্রত্যক্ষদর্শী সনোঅং মারমা (৫৫) পিতা মৃত উছাঅং মারমা, ভিক্টিমের মা সুইক্রাচিং মারমা (৩৮), ভিক্টিমের ভাই অংশিং থোয়াই মারমা (০৯) সহ উপস্থিত লোকজনদের ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসাবাদকালে ঘটনার বিষয়ে জানা যায়, গত ২১/০১/২০১৮ খ্রী: দিবাগত রাত তথা ২২/০১/২০১ খ্রী: রাত অনুমান ০২:৩০ মিনিট সময় ফারুয়া সেনা ক্যাম্পে একটি টহল দল কথিত ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী সানাঅং মার্মার বসতবাড়ীতে অস্ত্রধারী পাহাড়ী সন্ত্রাসীদের আটকের জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে কথিত ভিক্টিমের ঘরে চিৎকার শুনিয়া সেনাবাহিনীর সদস্য ও প্রত্যক্ষদর্শী সানাঅং মার্মা (৫৫), তার স্ত্রী ছাইনিমা মার্মা (৩৮), ছেলে থোয়াইন উখই মার্মা (২৫) সহ ভিক্টিমের বসতঘরে পৌঁছিয়া জানতে পারে, অভিযান পরিচালনাকালে উক্ত ভিক্টিমের ঘরে অভিযানকারী দলের অজ্ঞাত এক সদস্য প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা ভিক্টিমের মুখের উপর থেকে কাথা সরাইলে সে ঘুম থেকে জেগে উঠে চিৎকার করিয়া উঠে। তাৎক্ষণিক কথিত ভিক্টিম তাহাকে ধর্ষণের কোন অভিযোগ করেনি।...'

আইএসপিআরের 'এক আনসার সদস্যকে ক্লোজ' করার বক্তব্য:

এ বিষয়ে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের (আইএসপিআর) পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশিদুল হাসান বলেন, 'বিলাইছড়ির ওড়াছড়ি গ্রামের একটি বাড়িতে সেনাবাহিনীর একটি টহল দল তল্লাসী চালাচ্ছিল। এ সময় পাশের আরেকটি বাড়ি থেকে একটি চিৎকারের শব্দ শুনে সেনা সদস্যরা সেখানে যান এবং একজন আনসার সদস্যকে দেখতে পান। পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই আনসার সদস্যকে স্থানীয় আনসার কমান্ডারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সেখানে কোনও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি' (বাংলা ত্রিবিউন, ২৬ জানুয়ারি ২০১৮)। উল্লেখ্য যে, সাধারণত অভিযান চলাকালে সেনাসদস্য ব্যতীত একা কোন আনসার বা পুলিশ সদস্যকে কোন ঘরে সার্জ করতে দেয়া হয় না বলে জানা যায়।

পুলিশের জিডিতে ফারুয়া ক্যাম্পের টহল দলের এক সদস্যের কথা বলা হলেও আইএসপিআর এ ঘটনার জন্য এক আনসার সদস্যের কথা উল্লেখ করে, যা ছিল স্ববিরোধী। ঘটনাস্থল থেকে সেনাবাহিনী

চলে যাওয়ার পর 'একদল স্থানীয় যুবক' দুই বোনকে তুলে নিয়ে যায় মর্মে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা রাসেল মারমা বললেও আইএসপিআর বলছে, ঘটনাস্থলের বাড়ির কক্ষে এক আনসার সদস্যকে প্রত্যক্ষভাবে ধরা হয়। ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে এভাবেই ক্ষমতাসীন দল, পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়ে থাকে বলে প্রতীয়মান হয়।

ভিকটিমের পিতা-মাতাকে আটক, অজ্ঞাতস্থানে নজরবন্দী:

গত ২৪ জানুয়ারি ভোরে ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য ভিকটিমদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পিতা-মাতা, যথাক্রমে পিতা উসেচিং মারমা ও মাতা শৈক্রাচিং মারমাকে স্থানীয় এক হেডম্যান ও এক কার্বারীসহ আটক করে দীঘলছড়ি সেনা জোনে নিয়ে যায়। সকালে হেডম্যান ও কার্বারীকে ছেড়ে দিলেও ভিকটিমের মা-বাবাকে ছেড়ে দেয়নি এবং তাদেরকে জোর করে এনে স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা রাসেল মারমা কর্তৃক ২৪ জানুয়ারি দুপুরে রাঙ্গামাটি সদরে আহুত সংবাদ সম্মেলনে হাজির করা হয়। ধর্ষণের ঘটনার সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জড়িত নয় বলে সংবাদ সম্মেলনে বলতে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। তারপর থেকে ভিকটিমের পিতা-মাতাকে অজ্ঞাত স্থানে কার্যত বন্দী করে রাখা হয়েছে। তারা কখনো কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্‌গা ইউনিয়নের মুরলী পাড়ায়, কখনো রাঙ্গামাটি শহরের শাপলা হোটেলে, আবার কখনো রিজার্ভ বাজারের আশুতোষ বিল্ডিং-এ তাদেরকে রাখা হয়েছে বলে ফোনে তাদের দুই মেয়েকে বলে থাকেন।

গত ২৫ জানুয়ারি পুলিশ ও গোয়েন্দাদের প্রহরায় ভিকটিমের পিতা-মাতাকে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে আনা হয়। রাসেল মারমা কর্তৃক আহুত সংবাদ সম্মেলনে ঘটনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেভাবে বলতে তারা তাদের দুই মেয়েকে পরামর্শ প্রদান করেন এবং তাদের সাথে ভিকটিক দুই মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সর্বশেষ গত ৮ ফেব্রুয়ারি আবার তাদেরকে পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে আনা হয় এবং তারা তাদের দুই মেয়েকে তাদের সাথে আবার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে ভিকটিম দুই বোন তাদের মাতা-পিতার সাথে যেতে অস্বীকার করে।

ভিকটিমদেরকে হাসপাতালে পুলিশ কর্তৃক অবৈধভাবে অন্তরীণ:

ভিকটিমের ঘনিষ্ট আত্মীয়রা গত ২৩ জানুয়ারি দুপুর ১২:০০ টার দিকে ভিকটিমদেরকে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। ভর্তির পর সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন তৎপর হয়ে উঠে। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই একদল পুলিশ এসে ভিকটিমদেরকে সার্বক্ষণিক পাহারা দিতে শুরু করে। এরপর রাত ৮:০০ টার দিকে দুইজন পুরুষ পুলিশ এসে দুই ভিকটিমকে হাসপাতালের অফিস কক্ষে নিয়ে যায়। প্রায় একঘন্টা ধরে উক্ত দুই পুলিশ ভিকটিমদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেসময় উক্ত কক্ষে কোন নার্স বা চিকিৎসক কিংবা মহিলা পুলিশ রাখা হয়নি। পুলিশ ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যমে ভিকটিমের জন্য কোন খাবার বা ঔষধ না আনার জন্য নার্সদেরকে পুলিশ জানিয়ে দেয়। ভিকটিমদের চিকিৎসা শেষ হলেও সেনা-পুলিশ-জেলা প্রশাসন ভিকটিমদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তারপর থেকে (২৩ জানুয়ারি থেকে) ভিকটিমদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে জোরপূর্বক হাসপাতালে সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরায় আইন-বহির্ভূতভাবে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে। পুলিশ ভিকটিমদের সাথে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দেখা করতে বাধা প্রদান করে থাকে।

জানা যায় যে, আদালতের নির্দেশে গঠিত মেডিকেল টিম কর্তৃক বড় বোনের ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ হলে তথা ভিকটিমের চিকিৎসা শেষ হলে ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ সকালের দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ছাড়পত্র দিয়ে চেয়েছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে হঠাৎ করে জানিয়ে দেয়া হয় যে, ভিকটিমদেরকে একমাত্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য মিজ বাঞ্ছিতা চাকমা ব্যতীত কারো হাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেবে না। অপরদিকে ২৫ জানুয়ারি বিকালের দিকে পুলিশের প্রহরায় ভিকটিমদের পিতা-মাতাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। যেহেতু তাদের পিতা-মাতাকে ফারুয়াস্থ বাড়ি থেকে ২৪ জানুয়ারি ভোরে একদল সেনা সদস্য ধরে নিয়ে আসে এবং তারপর থেকে সেনা-পুলিশ-আওয়ামীলীগের হেফাজতে তাদেরকে অন্তরীণ রাখা হয়েছে, সেহেতু নিরাপত্তার কথা ভেবে দুই ভিকটিম বোন তাদের পিতা-মাতার সাথে যেতে অস্বীকার করেন। তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য মিজ বাঞ্ছিতা চাকমা ও চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের হেফাজতে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২৬ জানুয়ারি সকালের দিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য মিজ বাঞ্ছিতা চাকমা ও চাকমা সার্কেলের রাণী য়েন য়েন দুই মারমা বোনকে ছাড়িয়ে আনতে হাসপাতালে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের হেফাজতে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তাদের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ রয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়। এ সময় হাসপাতালের বাইরে থাকা একদল সেনাসদস্য কর্তৃক সাংবাদিকদেরও হাসপাতাল এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

সেদিন বিকাল ৫:০০ টার দিকে দুই ভিকটিম বোনকে ছাড়িয়ে আনতে আবার সাংসদ উষাতন তালুকদার, চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, রাণী য়েন য়েন ও বাঞ্ছিতা চাকমা হাসপাতালে যান। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের হেফাজতে ছাড়পত্র দিতে চাইলেও পুলিশ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। এ সময় আরো পুলিশ ফোর্স বাড়ানো হয়। অনেক সেনা সদস্যও হাসপাতালের প্রাঙ্গণে জড়ো হতে দেখা যায়। গোয়েন্দা সদস্যদের ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এ সময় রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও হাসপাতালে ছুটে যান।

ভিকটিমের মেডিকেল পরীক্ষা করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন করা হয়েছে মর্মে আদালতের একটা কাগজ প্রদর্শন করে ভিকটিমদের পুলিশের হেফাজতে রাখার যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন পুলিশ সুপার। কিন্তু তদনুসারে যেহেতু ইতিমধ্যে

মেডিকেল পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাই সেই মেডিকেল পরীক্ষার নামে ভিকটিমদের হাসপাতালে রাখার পুলিশের যুক্তিও ধোপে টেকেনি। একপর্যায়ে বলা হয়, শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। তাই ছাড়পত্র দেয়া যাবে না। রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের সাথে আলাপ করে পরবর্তী রবিবারে ছাড়পত্র দেয়া যেতে পারে বলে জানানো হয়। চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরও ভিকটিমদের এভাবে অযথা হাসপাতালে রাখা একপ্রকার মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন বলে তুলে ধরা হলেও পুলিশ কোন যুক্তিই কর্ণপাত করেনি। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেয়া হবে না মর্মে শোনার সাথে সাথে ভিকটিমরা কাঁদতে শুরু করেন।

এভাবে ভিকটিম দুই বোনকে হাসপাতালে থাকতে কার্যত সেনা-পুলিশ বাধ্য করেছে, যদিও হাসপাতালে রাখার জন্য আদালতের কোন নির্দেশনা নেই। আইনগতভাবে পুলিশের হেফাজতেও দুই ভিকটিম বোনকে দেয়া হয়নি। কিন্তু পুলিশ বা অদৃশ্য কর্তৃপক্ষ অনেকটা জোর করে বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে আইন-আদালতকে তোয়াক্কা না করে দুই ভিকটিম বোনকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় হাসপাতালে গত ২৩ জানুয়ারি থেকে অনেকটা বন্দী করে রেখেছে।

ভিকটিমদের হেফাজতে নিতে আদালতে পুলিশের অযৌক্তিক আবেদন:

২৮ জানুয়ারি ২০১৮ পুলিশ ভিকটিমদের তাদের হেফাজতে নিতে রাঙ্গামাটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের কগনিজেন্স আদালতে আবেদন করে। কিন্তু যেহেতু এই ঘটনায় এখনো কোন মামলা হয়নি, তাই পুলিশের হেফাজতে নেয়ার কোন এখতিয়ার নেই বলে ভিকটিমের আইনজীবীরা যুক্তি উপস্থাপন করলে আদালত পুলিশের আবেদনের উপর কোন শুনানী করেননি। উল্লেখ্য যে, ভিকটিমরা নিজেদের উদ্যোগে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন এবং ভর্তি হয়েছিলেন। কাজেই তারা নিজেদের উদ্যোগে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে পারবেন বলে ভিকটিমদের আইনজীবীরা অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু পুলিশের অভিমত হচ্ছে- ভিকটিমরা নাকি নাবালিকা এবং বিষয়টি স্পর্শকাতর। এ নিয়ে মিডিয়াতে লেখালেখি হচ্ছে। তাই তাদেরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া যাবে না বলে পুলিশ যুক্তি উপস্থাপন করে ভিকটিমদেরকে হাসপাতালে প্রকারান্তেরে অন্তরীণ করে রাখা রাখে।

অপরদিকে সেদিন (২৮ জানুয়ারি) পুলিশ রাঙ্গামাটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনটি আর্জি যথাক্রমে- (১) ভিকটিমদের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য আবেদন; (২) মেডিকেল পরীক্ষার জন্য আবেদন এবং (৩) যৌনাঙ্গের স্পাম পরীক্ষার আবেদন করে। কিন্তু তিনটি আবেদনের মধ্যে ভিকটিমদের ডিএনএ পরীক্ষা এবং যৌনাঙ্গের স্পাম পরীক্ষার আবেদনও আদালত আমলে নেয়নি। যেহেতু ইতিমধ্যে ডা: হেনা বড়ুয়ার নেতৃত্বে ছয়-সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক ভিকটিমের মেডিকেল পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাই পুনর্বার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই বলে ভিকটিমের আইনজীবীরা যুক্তি উপস্থাপন করলে পুলিশের মেডিকেল পরীক্ষার আবেদনও আদালতে গ্রাহ্য হয়নি।

ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে পুলিশের তালবাহানা ও কালক্ষেপণ:

পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালের ডা: হেনা বড়ুয়ার নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিম গত ২৪ জানুয়ারি ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করেন বলে জানা যায়। উক্ত ডাক্তারী পরীক্ষার উপর ২৮ জানুয়ারি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে শুনানী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে না পৌঁছায় শুনানী অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে আদালত পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৩১ জানুয়ারি নির্ধারণ করে। কিন্তু ৩১ জানুয়ারিতেও হাসপাতাল থেকে ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে না পৌঁছায় সেদিনও শুনানী অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই শুনানীর পরবর্তী তারিখ ৭ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত হয়। জানা যায় যে, ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত শুনানীর পরে (কোর্ট আওয়ার পরে) ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে আসলেও ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা খোলা হয়নি বা প্রকাশ করা হয়নি। এতদিন উক্ত রিপোর্ট সিলগালা অবস্থায় খামবন্দী করে রাখা হয়েছিল। ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানী শুরু হলে দুপুর ১২:১৫ ঘটিকায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সামসুদ্দিন খালেদ আদালত কক্ষে সিলগালা মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট খুলে সবাইকে পড়ে শোনান, যেখানে ভিকটিমের শরীরে কোন পুরুষ শুক্রানু না পাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে বলে জানা গেছে।

৭ ফেব্রুয়ারি সকালের দিকে পুলিশও ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফলের আলোকে ভিকটিমদের বয়স নির্ধারণে চট্টগ্রামে নেয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেছিল। আশ্চর্য হতে হয়, রিপোর্ট প্রকাশের আগে পুলিশও কিভাবে ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফলের কথা জেনেছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, আদালত কর্তৃক ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বেই গত ৩ ফেব্রুয়ারি 'পার্বত্যনিউজডটকম' নামক অনলাইন পত্রিকায় উক্ত রিপোর্টের ফলাফল প্রকাশ হয়। যেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও প্রকাশ করেনি, আদালতও না খুলে এযাবৎ সিলগালা অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, তাহলে উক্ত অনলাইন পত্রিকা কিভাবে উক্ত পরীক্ষার ফলাফল জানলো তা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ বলে বলা যায়। এসব কিছু মিলে এটা বলা যায় যে, ঘটনার সত্যতা ধাপাচাপা দিতেই রাষ্ট্রযন্ত্র, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও ক্ষমতাসীন দল সম্মিলিতভাবে মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে নানা তালবাহানা ও নানা অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে চলেছে।

সেনাবাহিনী কর্তৃক বোট চালককে জিজ্ঞাসাবাদ, ভিকটিমের পিতামহ খোঁজে তল্লাসী

যে বোট যোগে বিলাইছড়ির ধর্ষণের ভিকটিমদের ফারুয়া থেকে রাঙ্গামাটিতে আনা হয়েছিল সেই বোট চালককে ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় ফারুয়া ক্যাম্পের কম্যান্ডার কর্তৃক ধরে নিয়ে আসা হয়। তার নাম মংপ্রু মারমা পিতা লাচিকই মারমা, সাং ওড়াছড়ি। ক্যাম্পে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন ২২ জানুয়ারি ভিকটিমদেরকে তার বোট যোগে নিয়ে গেছে, সেদিন কার বাড়িতে রাত্রিযাপন করেছিল ইত্যাদি। জিজ্ঞাসাবাদের পর সেনা সদস্যরা বোট চালক মংপ্রু মারমাকে

দীঘলছড়ি সেনা জোনে যেতে নির্দেশ দেয়। এছাড়া সেদিন ফারুয়া ক্যাম্পের একদল সেনা ওড়াছড়িতে গিয়ে ভিকটিমের পিতামহ দোঅং প্রু মারমাকে (৬৬) খোঁজ করে। সেসময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। ভিকটিমের পিতামহকে অতিদ্রুত ফারুয়া ক্যাম্পে হাজির হতে সেনা সদস্যরা গ্রামের লোকজনদেরকে নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা যায়।

২৯ জানুয়ারি ২০১৮ ভোর ৫:০০ টা দিকে ফারুয়ার ওড়াছড়ি গ্রাম থেকে ফারুয়া ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য (১) চাইন চু মারমা (হেডম্যান) পিতা চোয়ান জাই মারমা; (২) কংচো মারমা (কার্বারী) পিতা থোই অং মারমা; (৩) টুটুল মারমা পিতা কংচো কার্বারী; এবং (৪) চানি অং মারমা পিতা উষাঅং মারমাকে ধরে নিয়ে আসে। তাদেরকে দীঘলছড়ি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় বলে জানা গেছে। এ সময় সেনা সদস্যরা ধর্ষণের আলামত নষ্ট করার হীনউদ্দেশ্যে ভিকটিমদের পরিধেয় কাপড়ও ভিকটিমদের বাড়ি থেকে নিয়ে যায়।

হাইকোর্টে রিট ও পাল্টা-রিট পিটিশন, চাকমা রাণীকে মারধর :

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হাই কোর্টে ভিকটিমদের পক্ষে খুশী কবীর, গীরিআরা নাসরিন, সুলতানা কামাল, রোকেয়া কবীর, শামসুল হুদা, আফজল রহমান প্রমুখ ব্যক্তিরা বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর বেঞ্চে কেন ভিকটিমদের নিজ জিম্মায় যেতে দেওয়া হবে না জানতে চেয়ে রিট দায়ের করলে, রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি এটর্নী জেনারেল স্পর্শকাতর বিষয় বলে যুক্তি উপস্থাপন করে একদিনের সময় চেয়ে নেন। পরদিন শুনানীতে রাষ্ট্রপক্ষ একসপ্তাহের Stand Over নেয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি শুনানীর দিন ধার্য ছিল। ইতিমধ্যে ১২ ফেব্রুয়ারি ভিকটিমের পিতা থেকে ওকালতনামা নিয়ে হাইকার্টে বিচারপতি নাইমা হায়দার চৌধুরীর বেঞ্চে পুলিশ প্রোটেকশনে পিতার জিম্মায় ভিকটিমদের দেওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর কোর্টে প্রথম রিট পিটিশনের শুনানীর হওয়ার আগেই সকালের সেশনে বিচারপতি নাইমা হায়দার চৌধুরীর বেঞ্চে (পিতা কর্তৃক দায়েরকৃত) দ্বিতীয় রিট পিটিশনের শুনানী হয়ে যায়। ফলে বিকেলের সেশনে বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর বেঞ্চে প্রথম রিট পিটিশন শুনানিতে কোর্ট আরো কয়েকদিনের সময় নেন। অন্যদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি নাইমা হায়দার চৌধুরীর বেঞ্চে দায়েরকৃত দ্বিতীয় রিট পিটিশনের শুনানীতে পুলিশ প্রোটেকশনে পিতার হেফাজতে ভিকটিমদের প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়।

আদেশ পাওয়ার পর দেরি না করে ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পুলিশ প্রহরায় পিতা-মাতাকে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে নেয়া হয়। নিরাপত্তার কথা ভেবে ভিকটিমরা তাদের পিতা-মাতার সাথে যেতে আবারো অস্বীকার করে। এ সময় পিতা-মাতারা তাদের দুই মেয়েকে রাজী করাতে কয়েক চড়-থাপ্পড়ও মারেন বলে জানা যায়। তা সত্ত্বেও ভিকটিমরা পিতা-মাতার সাথে না গিয়ে চাকমা সার্কেলের চীফের কাছে যাবেন বলে আর্জি করতে থাকে। এ সময় চাকমা রাণী য়েন য়েন হাসপাতালে উপস্থিত হন এবং ভিকটিমরা তাকে জড়িয়ে থাকেন। এ সময় প্রচুর পুলিশ, গোয়েন্দা, সাদা পোষাকের নিরাপত্তা বাহিনীর লোক উপস্থিত হয়। ভিকটিমদের আইনজীবীসহ অনেক নারী অধিকার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকও হাসপাতাল চত্বরে জড়ো হন। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কাউকে ভিকটিমদের কাছে ঘেষতে দেয়নি। এক পর্যায়ে সন্ধ্যা ৭:৩০ টার দিকে আইন-শৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা বাহিনী হাসপাতালের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারপর মুখোশ পরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা চাকমা রাণীকে ঘিরে ফেলে এবং ভিকটিমদের রুম থেকে বের করে টেনে হেচড়ে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নিয়ে আসে এবং করিডোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এ সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য কিল-ঘুষি মারলে রাণী আবার মাটিতে পড়ে যান। নিরাপত্তার কথা ভেবে রাণী তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালের দেয়াল টপকে সেখান থেকে চলে যান। প্রথমে তিনি লেকের পানিতে লুকিয়ে থাকেন। পুলিশ দূরে চলে গেলে এক জুম্ম পরিবারের বাড়ি ঢুকে তাদের সহযোগিতায় সেখান থেকে চলে যান। অনেক নারী অধিকার কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের উপরও পুলিশরা হামলা করে বলে জানা যায়। এরপর রাতের আধারে পুলিশ প্রহরায় পিতা-মাতার হেফাজতে দুই ভিকটিম বোনকে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায়। অন্যদিকে সেনা-পুলিশ রাজবাড়ি সড়কে টহল জোরদার করে। হাসপাতাল থেকে দুই ভিকটিম বোন ও তাদের পিতা-মাতাকে নিয়ে রাঙ্গামাটি শহরের পাথরঘাটায় আওয়ামীলীগের সদস্য অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যার বাড়িতে পুলিশ প্রহরায় অন্তরীণ রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভিকটিমদের উপর নিপীড়ন:

প্রশাসন ও সেনা-পুলিশের নানা ষড়যন্ত্রের কারণে দুই ভিকটিম বোনকে প্রায় একমাস ধরে অস্বস্তিকর পরিবেশে অন্তরীণ থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে কাহিল অবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাদেরকে অন্তরীণ রাখা চরম অমানবিক ও নিপীড়নমূলক। বস্তুত তাদেরকে এখন বন্দী শিবিরে রাখা হয়েছে এবং প্রকারান্তরে মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে বলে বিবেচনা করা যায়। আরো উদ্বেগ যে, অভিযুক্ত বা দোষীদের গ্রেপ্তার করে যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার পরিবর্তে প্রকারান্তরে ভিকটিম, ভিকটিমদের পিতা-মাতা ও গ্রামবাসীর উপর অব্যাহতভাবে নানা হয়রানি ও নিপীড়ন চলছে। এ ঘটনায় এখনো কোন থানায় কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। ভিকটিমের মা-বাবারা নিরীহ লোক। জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

নাইক্ষ্যংছড়িতে দুই জুম্ম নারী শ্লীলতাহানির শিকার

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নে মারোগ্যা পাড়ায় এক ভিক্ষুর অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসে ঘুমধুম ইউনিয়নের বড়ইতলী গ্রামের ১২ বছরের এক তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরী নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়নের চাকঢালার নিবাসী ছৈয়দনুরের ছেলে শাহাজাহান কর্তৃক রাত ১২.০০টা সময় শ্লীলতাহানির শিকার হয় বলে জানা যায়।

অপরদিকে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ দুপুর ২.০০ টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের ২৮৩নং ঈদগড় মৌজার আথুই মং মারমা পাড়ার খালে ঘাটে গোসল করতে গিয়ে ১৪ বছরের এক মারমা কিশোরীকে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার ঈদগড়চর পাড়ার অধিবাসী আব্দুল শুক্কুর-এর ছেলে শাহাবুদ্দীন জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। তার পরদিন ২২ ডিসেম্বর ফাঁসিয়াখালী সাবেরঘাটা মারমা পাড়ায় ফেলে রেখে যায়। এভাবে মেয়েটি যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। মেয়েটির অভিভাবক এখনো পর্যন্ত কোন আইনী পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

বিলাইছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক দুই মারমা সহোদরার উপর যৌন সহিংসতা

গত ২২ জানুয়ারি ২০১৮ রাত আনুমানিক ২:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ওড়াছড়ি গ্রামে এক মারমা কিশোরী (১৯) ১৩ বেঙ্গলের দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের সেনাসদস্য কর্তৃক নিজ বাড়িতে ধর্ষণের শিকার এবং তার আরেক ছোট বোন (১৫) শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায় যে, গত ২২ জানুয়ারি গভীর রাতে ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের সুবেদার মিজানের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য ঐ সময় উক্ত ওড়াছড়ি গ্রামে তল্লাসী অভিযান চালায়। এ সময় সেনা সদস্যরা একের পর এক ঘরবাড়িতে ঢুকে তল্লাসী চালায়। তল্লাসীর সময় লোকজনদেরকে বেপোরোয়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের কাছ থেকে আইডি কার্ড খুঁজতে থাকে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেনাসদস্যরা লোকজনদের চোখে জোরালো টর্চের আলো ফেলে হয়রানি করে।

এক পর্যায়ে সেনাদলের দুই সদস্য তল্লাসীর কথা বলে উক্ত ধর্ষিতা তরুণীর বাড়িতে প্রবেশ করে ভিকটিমের বাবা-মাকে বাড়ির বাইরে আসতে বাধ্য করে। এরপর সেনাসদস্যদের মধ্যে একজন দরজায় অস্ত্র নিয়ে থাকে, অপরজন উক্ত মারমা তরুণীর কক্ষে ঢুকে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের সময় তরুণী চিৎকার করলেও অস্ত্রের মুখে বাবা-মা এগিয়ে যেতে পারেনি। এ সময় ধর্ষণের শিকার তরুণীর আরেক ছোট বোনকেও শ্লীনতাহানির চেষ্টা করা হয় বলে জানা যায়।

রামগড়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ আনুমানিক সকাল ১১ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি'র রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের থলিপাড়ায় এক ত্রিপুরা নারীকে (৪০) সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গলাটিপে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ঘটনার সময় ওই নারী গরু চড়াতে বাড়ি থেকে আধা কিলোমিটার দূরে টিএনও বাগানমুখ স্থানে যায়। সেখানে এক সেটেলার বাঙালি এসে ওই নারীকে ঝাঁপটে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায় এবং ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তাকে গলাটিপে হত্যার চেষ্টা করে। পরে ওই নারীর চিৎকারে স্থানীয় পাহাড়ি ও বাঙালিরা এগিয়ে গেলে ওই সেটেলার বাঙালি পালিয়ে যায়। তবে সেটেলার বাঙালিটির নাম জানা যায়নি।

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

পিসিপি সদস্যদের উপর একদল সেটেলার যুবক কর্তৃক হামলা

গত ২৬ নভেম্বর ২০১৭ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬:১৫ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাংগামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সদস্য অনিল কান্তি চাকমা (২২), পিতা যাত্রা মোহন চাকমা ও গোপাল কান্তি চাকমা (২৩), পিতা ধর্মমোহন চাকমা এবং তাদের বন্ধু শায়ন চাকমা (২৪) পিতা প্রিয়ময় চাকমার উপর প্রায় ৩০-৪০ জন সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক লাঠি, রড ও কিরিচ নিয়ে সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালানো হয়।

জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগানো শেষ হওয়ার পর অন্যান্য সঙ্গীদের মতো অনিল কান্তি চাকমা ও গোপাল কান্তি চাকমাও তাদের ভাড়া বাসায় যাচ্ছিলেন। তারা রাংগামাটি মারি

স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পাশে পৌঁছলে আগে ওৎপেতে থাকা ৩০-৪০ জন সেটেলার সন্ত্রাসী তাদের পথ আটকিয়ে প্রথমে মোবাইল ফোন এবং টাকা জোর করে কেড়ে নেয় এবং কেড়ে নেওয়ার পর প্রথমে মো: কবির, পিতা আকতার হোসেন পেছন থেকে লাঠি দিয়ে গোপাল কান্তি চাকমার মাথায় আঘাত করে। এরপর এলোপাতাড়িভাবে গোপাল ও অনিলের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাতাড়ী আঘাত করতে থাকে। গোপালের বন্ধু শায়ন চাকমা তাদেরকে উদ্ধার করতে গেলে সন্ত্রাসীরা তার উপরও সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এতে গোপালের ডান হাত ও বাম পা ভেঙ্গে যায় এবং মাথায় গুরুতর জখম হয়। তার বন্ধু শায়ন চাকমার মাথায় ও হাতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। আর অনিল কান্তি চাকমা মাথায়, শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হয়। প্রথমে আহত অবস্থায় তাদের তিনজনকে পাশের লোকজন রাংগামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরবর্তীতে গোপাল কান্তি চাকমা এবং শায়ন চাকমার অবস্থার অবনতি হলে তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। আহতরা হামলাকারীদের মধ্যে (১) মো: কবির, (২) রবি হাসান, (৩) মো: ইমন, (৪) দুলাল ড্রাইভার, (৫) মাসুদ, (৬) সাইফুল, (৭) মো: রাসেল ও (৮) মো: আবিরকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে অতুল বরণ চাকমা উক্ত ৮ জনসহ অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করেন। কিন্তু পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

নাইক্ষ্যংছড়িতে মন্ত্রীপরিষদ সচিবের ভাই-বোন কর্তৃক লীজের নামে ১০০ একর ভূমি জবরদখল

বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ২৬৮নং রেজু মৌজায় মন্ত্রীপরিষদ সচিব শফিউল আলমের তিন ভাই ও এক বোন যথাক্রমে- (১) ফরিদুল আলম, (২) ছুরুত আলম, (৩) জহুর আলম ও (৪) রাবেয়া বেগম সর্বপিতা- মৃত ছৈয়দ হোছন মাষ্টার সর্বসাং রুমখান পালং ইউনিয়ন- হলদিয়া পালং, উপজেলা- উখিয়া, জেলা- কক্সবাজারের নামে বাতিল হয়ে যাওয়া ১০০ একরের ভূমি লীজ অতীব গোপনে সচিবের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে পুনর্বহাল করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা তৎকালীন জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান যথাক্রমে হর্টিকালচার ২৭ (ফরিদুল আলম) ২৫ একর অনুমোদনের তারিখ-১/৭/১৫; হোল্ডি নং রাবার ২৮ (সুরুত আলম) ২৫ একর অনুমোদনের তারিখ-১০/৩/১৫; হোল্ডিং নং রাবার ২৯ (জহুর আলম) ২৫ একর অনুমোদন তারিখ-১/৭/১৪; এবং হোল্ডিং নং রাবার ৩০ (রাবেয়া বেগম) ২৫ একর অনুমোদন তারিখ- ১/৭/১৪ তারিখে ৪০ বছর মেয়াদের মোট ১০০ একর জায়গা লীজ অবৈধভাবে পুনরায় অনুমোদন দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, গত ১১ মার্চ ২০১৭ মন্ত্রীপরিষদ সচিব শফিউল আলমের আত্মীয়-স্বজনরা এই ১০০ একর লীজের জায়গার জবর দখল করার উদ্দেশ্যে উখিয়া থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ২৬৮নং রেজু মৌজা এবং ২৬৯নং সোনাইছড়ি মৌজার স্থানীয় পাহাড়ি ও বাঙালির দখলীয় ও আবাদী জায়গা-জমি জঙ্গল পরিষ্কার করতে আসে। এতে স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালিরা বাধা দিলে ভূমিদস্যু সুরুত আলম স্থানীয় ১৪ জন পাহাড়ি-বাঙালির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি এবং ভূমি দখলের মিথ্যা অজুহাতে ১২/৩/১৭ তারিখ নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় এক অভিযোগ দাখিল করেন। বর্তমানে ১০০টির অধিক স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালি পরিবার নিজ জায়গাজমি ও ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

অপরদিকে স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালি অধিবাসীদের আপত্তি সত্ত্বেও মন্ত্রীপরিষদের সচিব শফিউলের নির্দেশে গত ১৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে একবার এবং সম্প্রতি গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ আরেকবার বান্দরবান জেলার এডিসি রেভিনিউ ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম সরওয়ার কামাল এবং উপজেলার সার্ভেয়ার শফিউল আলমের তিন ভাই ও এক বোনের নামে অবৈধভাবে দখল করে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

লংগদুতে পদ্মলোচন চাকমার বন্দোবস্তীকৃত জমির উপর রাতের অন্ধকারে সেটেলার কর্তৃক ৩টি বসতবাড়ি নির্মাণ

গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ দিবাগত রাতের অন্ধকারে, রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার ৩নং লংগদু মৌজার পদ্ম লোচন চাকমার পিতার (মৃত সুরেশ্বর চাকমা) নামীয় বন্দোবস্তীকৃত জায়গার হোল্ডিং নং-আর-২, ১নং দাগের যাহার চৌহদ্দি উত্তরে- জলাশয়, দক্ষিণে- জলাশয়, পূর্বে- জলাশয়, পশ্চিমে- ধনেশ্বর, পরিমাণ- ৫.১৬ (পাঁচ দশমিক এক ছয়) একর এর উপর সৃজনকৃত ফলজ ও বনজ বাগান ধ্বংস করে নিম্নোক্ত তিনজন ব্যক্তির নেতৃত্বে আনুমানিক ১৫/১৬ জন সেটেলার বাঙালি দলবেঁধে জবরদখলপূর্বক অবৈধভাবে ৩টি বসতবাড়ি নির্মাণ করে।

১. মো: মোসলেম (৪৫), পিতা- জয়নাল মৌল্লা, সাং- ভাইবোন ছড়া, ৩নং লংগদু মৌজা;

২. মো: সাত্তার (৪০), পিতা- জসীম উদ্দিন, সাং- আনোয়ার টিলা, ৩নং লংগদু মৌজা;

৩. মো: ফরিদুল ইসলাম, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- আনোয়ার টিলা, ৩নং লংগদু মৌজা।

৫ ডিসেম্বর সকালে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে পদ্ম লোচন চাকমা প্রথমে স্থানীয় হেডম্যান, ৩নং লংগদু মৌজাকে অবগত করে এবং

তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অফিসার ইনচার্জ, লংগদু থানা মহোদয়কে অবহিত করেন। কিন্তু অফিসার ইনচার্জ, লংগদু থানার পক্ষে দারোগা মোঃ বেলাল হোসেন সাহেব সরেজমিন তদন্ত করে বিষয়টি সত্যতা নিশ্চিত করেন এবং উপরোক্ত বিবাদীদেরকে নির্মাণাধীন বাড়ি বিকাল ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে ভেঙ্গে ছড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও তারা উক্ত আদেশ অমান্য করে বরং অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার নিমিত্তে অব্যাহতভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

কাপ্তাই ও রাজস্থলীতে আওয়ামীলীগ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ৩ সদস্যকে হামলা

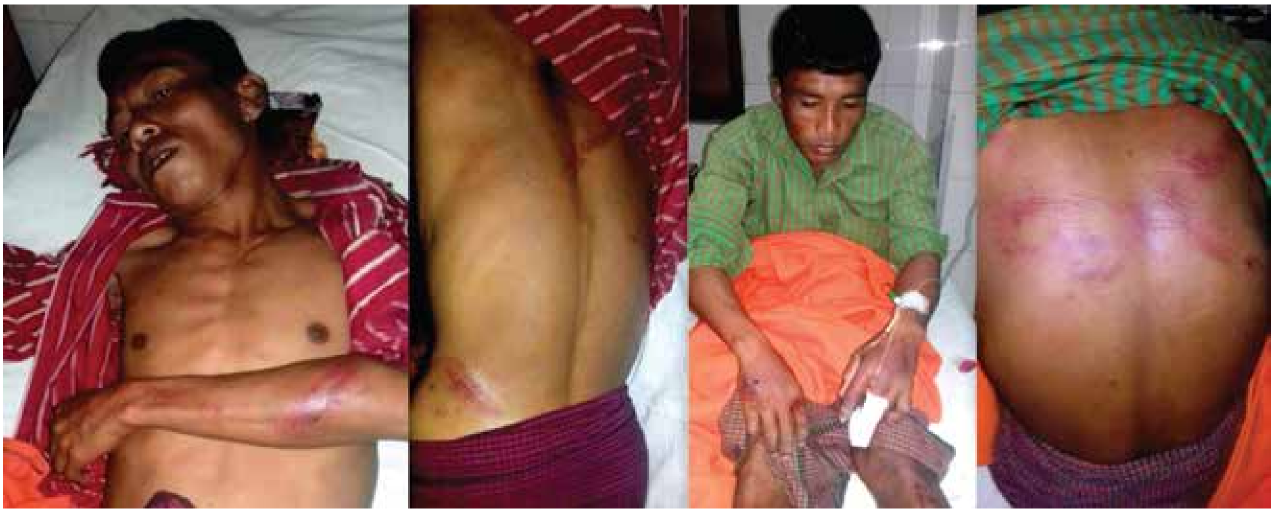

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ জুরাছড়ির অরবিন্দু চাকমা হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে হরতাল চলাকালে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নে জনসংহতি সমিতির ২ সদস্যের উপর হামলা চালায়। সকাল আনুমানিক ১১:০০ টায় স্থানীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহাবুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মিজান এর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের একদল দুর্বৃত্ত জনসংহতি সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য উষামং মারমাকে (৩৮) ডংনালা গ্রাম থেকে অপহরণ করে মারধর করতে করতে পার্শ্ববর্তী বাঙালি অধ্যুষিত কোদালা গ্রামের দিকে নিয়ে যায়। পরে দুপুর ১:০০ টার দিকে স্থানীয় জনগণ মারাত্মক আহত অবস্থায় উষামং মারমাকে কোদালা গ্রাম থেকে উদ্ধার করে এবং চন্দ্রঘোনা মিশন হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। উষামং মারমা মারাত্মকভাবে জখম হয় এবং তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

অপরদিকে দুপুর আনুমানিক ১২:৩০ টায় আওয়ামীলীগের কর্মীরা কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কংহ্লা অং মারমা (৪০)-কে রাইখালী বাজারে শারীরিকভাবে হামলা চালায়। এসময় স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মারাত্মক আহত অবস্থায় কংহ্লা অং মারমাকে উদ্ধার করে এবং এরপর বরইছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। কংহ্লা অং মারমার হাতে ও পায়ে মারাত্মক জখম হয়।

৮ ডিসেম্বর ২০১৭ মধ্যরাত আনুমানিক ১২:১৫ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গাল হালিয়া এলাকার যৌথ খামার গ্রামে জনসংহতি সমিতির বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন কমিটির দপ্তর সম্পাদক ক্যসাং থোয়াই মারমা (৩৮) আওয়ামীলীগের একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক হামলার শিকার হয়েছেন। তার মাথায় ও কানে মারাত্মক জখমের সৃষ্টি হয়। তাকে বরইছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

লক্ষ্মীছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক একজন জুম্মকে কুপিয়ে মারাত্মক আহত

গত ৮ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার ১নং সদর ইউনিয়নের মংহ্লাপাড়া গ্রামের থোয়াইচিং মং মারমাকে (৩২) সেটেলার বাঙালিরা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে।

জানা যায়, ঘটনার সময়ে মৃত কেজুরী মারমার ছেলে থোয়াইচিং মং মারমা (৩২) লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার মহিষকাটা গ্রামে তার গামারি ও সেগুন বাগানে যায়। সে সময়ে লক্ষ্মীছড়ি সেটেলার গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা মো: হেদায়েত উল্লাহের ছেলে মো: আব্দুল হামিদ (৩৫) ও মো: আলু জাকির (৪৫)-কে তার বাগানে ১০/১১ জন শ্রমিক নিয়ে গাছ কাটতে দেখা যায়। এ সময়ে থোয়াইচিং মং মারমা সেটেলার বাঙালিদের গাছ কাটতে বাধা দিলে বাক্‌বিতণ্ডার এক পর্যায়ে সেটেলার মো: আব্দুল হামিদ থোয়াইচিং মং মারমার উপর হামলা চালায় এবং কুড়াল দিয়ে মাথায় আঘাত করে মারাত্মক আহত করে। পরে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে লক্ষ্মীছড়ি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে চিকিৎসক আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়নি।

রামগড়ে ত্রিপুরা গ্রামে বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলা

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ১১ ঘটিকায় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নে হাচৌক পাড়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ত্রিপুরাদের নির্মাণাধীন ১টি ঘরসহ দু'টি ঘরের আসবাবপত্র ভাংচুর করা হয়েছে। এ সময়ে ঘটনাস্থলে রামগড় ৪৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একদল বিজিবি সদস্য উপস্থিত ছিল বলে জানা যায়।

জানা গেছে, ঘটনার দিন কালাডেবা, লামাকুগ্রামের ৩০/৪০ জন সেটেলার বাঙালি হাচৌক পাড়ায় যায়। এসময় সেটেলার বাঙালিদের সাথে রামগড় ৪৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একদল বিজিবি সদস্যও উপস্থিত ছিল। বিজিবি ও সেটেলার বাঙালিরা সেখানে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত অবস্থান করে। বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতিতে সেটেলার বাঙালিরা ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়। সেটেলার বাঙালিরা নিতাই ত্রিপুরার (৪০) নির্মাণাধীন বাড়িটি ভেঙ্গে দেয় এবং তার ছোট ভাই পতেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়িতে ঢুকে আসবাবপত্র তছনছ ও ভাংচুর চালায়। এসময়ে সেটেলার বাঙালিরা জয়সেন ত্রিপুরার বাড়ির জিনিসপত্রও লুটপাট করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় হাচৌক পাড়ার ত্রিপুরা জনগণ চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

রোয়াংছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক আটক, নির্যাতন

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৭ সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকার সময় বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার ভাঙ্গামুড়া কচ্ছপতলী মোড়ের যাত্রী ছাউনি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমলাসেন তঞ্চঙ্গ্যাকে টহলরত একদল সেনা আটক করে।

জানা গেছে, গাছের ব্যবসা কাজে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার পাগলাছড়া পাড়ার কমলাসেন তঞ্চঙ্গ্যা অপর তিনজন সঙ্গী নিয়ে মোটর সাইকেল যোগে বান্দরবানে গিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে একজন সঙ্গী নিয়ে কমলাসেন তঞ্চঙ্গ্যা বান্দরবানের মোঃ ফরিদ সওদাগর নামে জনৈক ব্যবসায়ীর সাথে কাঠ ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ সেরে নিজ বাড়ি রোয়াংছড়ির উদ্দেশ্যে ফিরে আসার পথে সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকার সময় রোয়াংছড়ি কাছাকাছি ভাঙ্গামুড়া নামক যাত্রী ছাউনিতে টহলরত একদল সেনা আটক করে। সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকার দিকে রোয়াংছড়ি সাব-জোন কমান্ডার মেজর সালাহউদ্দিন এসে তাঁর গাড়িতে উঠিয়ে বান্দরবানে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে রাতভর মারপিট করেছে বলে জানা যায়। পরে ২০১৬ সালের জুনে সংঘটিত মংপু মারমাকে অপহরণ মামলার সাথে মিথ্যাভাবে জড়িত করে পরদিন ১ নভেম্বর ২০১৭ সকাল ১১টার দিকে বান্দরবান সদর থানায় সোপর্দ করে।

বাঘাইছড়িতে সেনাসদস্য কর্তৃক একজনকে পিস্তল গুঁজে দিয়ে আটক, নির্যাতন, পুলিশে সোপর্দ

গত ৩ নভেম্বর ২০১৭ ভোর আনুমানিক ৪:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সিজক-দজর এলাকায় লুমপাড়া থেকে সেনা সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সাবেক সভাপতি ও নিরীহ জুমচাষী অক্ষর চাকমাকে আটক করে।

জানা যায়, বাঘাইহাট সেনা জোনের (১২ ইস্ট বেঙ্গলের) একদল সেনাসদস্য বাঘাইছড়ি সদর ইউনিয়নের সিজক-দজর এলাকায় লুমপাড়ায় তল্লাসী অভিযানের নামে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে এবং কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তিকে আটক করে নির্যাতন চালায়। সেনা সদস্যরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে এলাকাটি ঘেরাও করে পরিত্যক্ত একটি জুমঘরে এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে। এ সময় সেনা সদস্যরা দজর এলাকার লুমপাড়া থেকে অক্ষর চাকমা (২৬) পীং- নিলেন্দ্র চাকমাসহ চারজন নিরীহ গ্রামমবাসীকে আটক করে। আটকের পর পরই সেনা সদস্যরা অক্ষর চাকমার ব্যাগে একটি দেশীয় পিস্তল গুঁজে দেয়। এ সময় অক্ষর চাকমা প্রতিবাদ করলে তাকে এক সদস্য জোরে চড় ও লাথি মারে। আটকের কিছুক্ষণ পর অপর তিনজনকে ছেড়ে দিলেও অক্ষর চাকমাকে প্রথমে দজর বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে মারধর করে। তারপর বাঘাইহাট সেনা জোনে নিয়ে গিয়ে সেখানে নির্যাতন করে বলে জানা যায়। পরে সন্ধ্যার দিকে সেনা সদস্যরা গুঁজে দেয়া পিস্তলসহ অক্ষর চাকমাকে বাঘাইছড়ি থানায় সোপর্দ করে।

বান্দরবানে জেএসএস ও পিসিপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, ১৫ জনকে জেলে প্রেরণ

গত ১৫ নভেম্বর ২০১৭ বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার রাজভিলায় সংঘটিত লেনদেন সংক্রান্ত এক ঝগড়ার সাথে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্যদের ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যাভাবে জড়িত করে মো: আবদুল আলীম নামে জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ২৪ জনের বিরুদ্ধে বান্দরবান সদর থানায় এক চাঁদাবাজি ও হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার অভিযোগ এনে এক মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত সাজানো মামলায় মুখ্য হাকিম আদালতে জামিন নিতে গেলে জনসংহতি সমিতির ১৮ জন সদস্যের মধ্যে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবা মং মারমা, নোয়াপতং ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও নোয়াপতং ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান অংথোয়াংচিং মারমা- এই তিনজনকে জামিন দিলেও বাকি ১৫ জনকে জেলে প্রেরণ করা হয়। জেলে প্রেরিত ১৫ জনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় চিংলামং চাক, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলি মং, মংপু হেডম্যান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উবাসিং মারমা প্রমুখ ব্যক্তি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনায় রাজবিলা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ ও মামলার বাদী উভয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রথম থেকে তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বলে দাবি করেছেন। কিন্তু কিভাবে ২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হলো তাঁদের সাথে এলাকাবাসী এবং প্রত্যক্ষদর্শীরাও হতবাক হয়েছেন। গত ২৭ নভেম্বর আটককৃত উক্ত ১৫ জন ব্যক্তি জামিনে জেল থেকে ছাড়া পান।

ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক অর্ধ শতাধিক বাড়ি তল্লাসী
গ্রামবাসীদের জড়ো করে ৫ জনকে নির্যাতন

গত ১৮ নভেম্বর ২০১৭ রাত আড়াইটার দিকে বিলাইছড়ি সেনা জোনের উপ-অধিনায়কের নেতৃত্বে বিলাইছড়ি জোন ও তক্তানালা ক্যাম্প থেকে দুই বোট সেনা সদস্য রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের চাইন্দা গ্রামে এক সেনা অভিযান চালায়। গভীর রাতে অভিযানকালে সেনা সদস্যরা গ্রামের ৬৫ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫০/৫৫টি পরিবারের ঘরবাড়ি তল্লাসী চালায়। তল্লাসীকালে বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে। তল্লাসীর পর গ্রামবাসীদের এক জায়াগায় জড়ো করে সন্ত্রাসীরা কোথায় আছে দেখিয়ে দাও, কেন অস্ত্রধারীদের আশ্রয় দাও, কেন ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের খবর দাও না ইত্যাদি অভিযোগ তুলে গ্রামবাসীদেরকে হুমকি দিতে থাকে। ঘরবাড়ি তল্লাসীর সময় নিম্নোক্ত পাঁচজন গ্রামবাসীকে সেনা সদস্যরা বেদম মারধর করে-

১. নির্মল তঞ্চঙ্গ্যা (৩০) পিতা- কালন্দ হেডম্যান, গ্রাম চাইন্দ্যা (পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সহ সভাপতি)।

২. চন্দ্র বাবু তঞ্চঙ্গ্যা (৩২) পীং- তরুণীসেন তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম চাইন্দ্যা (পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির ফারুয়া ইউনিয়ন কমিটির সাবেক সদস্য)।

৩. বরণ জয় তঞ্চঙ্গ্যা (৩১) পীং- আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম চাইন্দ্যা।

৪. জগৎ চান তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) পীং- মাল্যাপো তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম চাইন্দ্যা, (পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির চাইন্দ্যা গ্রাম কমিটির সভাপতি)।

৫. কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (১৮) পীং- শামুক্যা তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম চাইন্দ্যা।

উপরোক্ত ব্যক্তিরা তাদের নাম বলার সাথে সাথে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সেনা সদস্যরা একের পর এক কিল-ঘুষি ও লাথি দিতে থাকে। মারধরের সময় এক সেনা সদস্য হুমকি দেয় যে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গ্যা মুসলমানদের উপর বৌদ্ধরা যেভাবে অত্যাচার করছে, সেভাবে তোমাদেরকেও করা হবে। সেনা সদস্যরা বন্দুক তাক করে গ্রামবাসীদের হত্যারও হুমকি দেয়।

এক পর্যায়ে ‘সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবো না, অস্ত্রধারী আসলে ক্যাম্পে খবর দেবো’ মর্মে অঙ্গীকারনামায় সকল পরিবার প্রধানের স্বাক্ষর নিয়ে তার পরদিন সেনা জোনে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়ে ভোর ৫টার দিকে সেনা সদস্যরা চলে যায়। নির্দেশ মোতাবেক ৬৪ পরিবারের পরিবার-প্রধানের স্বাক্ষর সম্বলিত অঙ্গীকারনামায় দস্তখত নিয়ে ১৯ নভেম্বর কালন্দ হেডম্যান, চন্দ্র বাবু তঞ্চঙ্গ্যা, নির্মল তঞ্চঙ্গ্যা ও মিলাবো তঞ্চঙ্গ্যা বিলাইছড়ি সেনা জোনে জমা দিয়ে আসেন।

অন্যদিকে ফারুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত তক্তানালা ক্যাম্পের সুবেদার মির্জার নেতৃত্বে একদল সেনা গত ১৯ নভেম্বর ২০১৭ সকাল ১১টার দিকে তক্তানালায় অভিযান চালিয়ে সানু রঞ্জন চাকমা, অনিল তঞ্চঙ্গ্যা ও ভরতচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি তল্লাসী চালায়। সে সময় সুবেদার মির্জা পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির তক্তানালা গ্রাম কমিটির সভাপতি এবং ফারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য তান্যাবী তঞ্চঙ্গ্যাকে ‘আওয়ামীলীগ বা বিএনপি না করে কেন জনসংহতি সমিতি করেন’ ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মহিলা সমিতির গ্রাম কমিটির সকল সদস্যদেরকে নিয়ে তক্তানালা ক্যাম্পে হাজির হতে তান্যাবী তঞ্চঙ্গ্যাকে নির্দেশ দিয়ে আসেন সুবেদার মির্জা। সেদিন বিকাল ৪টার দিকে স্থানীয় এক হেডম্যানকে নিয়ে তান্যাবী তঞ্চঙ্গ্যা তক্তানালা ক্যাম্পে যান এবং কাজের ব্যস্ততার কারণে মহিলা সমিতির সদস্যবৃন্দ আসতে পারেননি বলে সুবেদার মির্জা জানিয়ে আসেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহিলা সমিতির সদস্যকে ক্যাম্পে নিয়ে আসতে আবারো নির্দেশ দেন উক্ত সুবেদার মির্জা। বর্তমানে মহিলা সমিতির সদস্যবৃন্দ এলাকার নারী-পুরুষ চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

বিলাইছড়িতে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা

গত ১৯ নভেম্বর ২০১৭ বিলাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়াডের সদস্য অমৃত কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার সাথে কে বা কারা মারামারি ঘটনায় জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীদের জড়িত করে অমৃত কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে বিলাইছড়ি থানায় এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্ত ১৮ জনের মধ্যে জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সহ-সভাপতি চন্দ্র লাল চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক টিপু চাকমা ও সদস্য জ্ঞান রঞ্জন তালুকদার, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিলাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি বীর উত্তম চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত চাকমা প্রমুখসহ ভাড়ায় চালিত ৫ জন নিরীহ মোটর সাইকেল চালকও রয়েছে। উক্ত মামলায় অভিযুক্ত জনসংহতি সমিতির সদস্য এবং নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীদের ধরতে বিলাইছড়ি সেনা জোনের সেনারা বিলাইছড়ির বিভিন্ন গ্রামে হয়রানিমূলক তল্লাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

লংগদুতে বৌদ্ধ বিহার সরিয়ে নেয়া ও সেখানে কোন স্থাপনা না করার নির্দেশ বিজিবির

গত ২১ নভেম্বর ২০১৭ বিকাল অনুমান ৫:০০ ঘটিকার সময় লংগদু উপজেলার গুলশাখালী ইউনিয়নে অর্ন্তগত ৩৭ বিজিবি-এর রাজনগর জোনের জোন কমান্ডার লেফটেনেন্ট কর্নেল গাজী মোহাম্মদ বশির আহম্মেদ মৌল্লা নলুয়া নব উদয় বৌদ্ধ বিহারে যান। সে সময় তিনি বিহারের পার্শ্ববর্তী স্থানীয় আদিবাসীদের দোকানে থাকা লোকজন সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে কয়েকটি স্থির ছবি তোলেন এবং বিহারের আশে-পাশের সম্পূর্ণ জায়গা ভিডিও ধারণ করেন। এসময় তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, চিবেরেগা এলাকায় একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হবে, এই জায়গাটা বিজিবি ক্যাম্পের নির্ধারিত জায়গা, এটা এলাকাবাসীদের ছেড়ে দিতে হবে। সেখানে স্থাপিত বৌদ্ধ বিহারটি অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এখানে নতুন করে আর কোন প্রকার স্থাপনা করা যাবে না বলে তিনি নির্দেশ জারি করেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত জায়গার মালিক রাঙাচান চাকমা, পিতা- নিতাই চন্দ্র চাকমা, সাং- ৯নং মারিশ্যাচর মৌজা, লংগদু যার হোল্ডিং নং আর-২ এবং পরিমাণ- ২.০০ একর। ১৯৬৫-৬৬ সালে উক্ত জায়গায় নলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং ভূমির মালিক তখনকার সময়ে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২.০ একর জায়গা দান করার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে জীবন বাঁচার তাগিদে অত্র এলাকার সাধারণ পাহাড়িরা তাদের সৃজনকৃত ফলজ এবং বনজ বাগানসহ নিজ বসতবাড়ি ও ভিটামাটি ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। তৎপরবর্তী সময়ে এলাকায় কোন লোকজন না থাকায় বিদ্যালয়টি অন্যত্র ছড়িয়ে নেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়ের জায়গার উপর সেনাবাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করে। উক্ত সেনাবাহিনীর ক্যাম্পটিকে পরবর্তীতে সরিয়ে নিয়ে সেনাবাহিনীর স্থলে পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত করা হয়। উক্ত পুলিশ ক্যাম্পটিও বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে প্রত্যাহার করা হয় এবং পুলিশ ক্যাম্পটি প্রত্যাহার করার পর অর্থাৎ মার্চ/এপ্রিল ২০০৫ সালে উক্ত জায়গার মালিকের ওয়ারিশ জগদীশ চন্দ্র চাকমার অনুমতিক্রমে উক্ত জায়গায় উল্লেখিত নব উদয় বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করা হয়। ইহা বর্তমানে এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

এছাড়াও গুলশাখালী এলাকার শান্তিনগর গ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ চাকমা, পিতা- মৃত ভুলসিং চাকমা, সাং- ৩৮৬নং গুলশাখালী মৌজা, যার বন্দোবস্তী ডকেট নং- ৯৫৩, তারিখ- ০২/০৩/২০০৩, পরিমাণ- ০.৮০ একর। বিগত ২৪/১২/২০১০ সালে উক্ত জায়গার উপর মালিকের বসতবাড়ি ও বাগান-বাগিচা থাকা সত্বেও তাকে সেখান থেকে বাধ্য করে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে অস্থায়ীভাবে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। তবে পরবর্তীতে অর্থাৎ গত ৩০/১১/২০১৬ সালে উক্ত ক্যাম্পটি প্রত্যাহার করা হয় এবং প্রত্যাহার করার সময় স্থানীয় মুরুব্বী ও জায়গার মালিককে ডেকে তার জায়গা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ইদানিং আবারো জোন কমান্ডার মহোদয় স্থানীয় কার্বারী ও মুরুব্বীদেরকে ডেকে বলে দেন যে, এই জায়গাটা তাদের ক্যাম্পের নির্ধারিত জায়গা, এটা তাদের লাগবে, এখানে নতুন করে কোন প্রকার স্থাপনা করা যাবে না।

আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে ২০০৩-২০০৪ সালে চিবেরেগা এলাকার উদ্বাস্তু পাহাড়ি অধিবাসীরা নতুন করে বসতি স্থাপন শুরু করেন এবং তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন।

নাইক্ষ্যংছড়িতে মাদকদ্রব্য উদ্ধারের নামে র‍্যাব কর্তৃক দুই জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ক্যাং পাড়ায় মাদক দ্রব্য উদ্ধারের নামে কক্সবাজারের র‍্যাব ব্যাটালিয়ান অভিযান চালিয়ে দুই পাড়াবাসী- (১) চচিং মারমা পিতা মৃত মংমংহ্লা মারমা ও (২) চিংয়েন মারমা স্বামী মংচিংথোয়াইং মারমাকে আটক করে মামলা দিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করে। মাদক দ্রব্য উদ্বার নামে র‍্যাব এভাবে সোনাইছড়ি মারমা পাড়ায় র‍্যাব ঘন ঘন অভিযান চালিয়ে মারমা সম্প্রদায়কে হয়রানি অব্যহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ সোনাইছড়ি লামার পাড়ার মাদক উদ্বার নাম নিয়ে অভিযান চালিয়ে র‍্যাব পাড়ার কার্বারীসহ তিনজন নিরীহ পাড়াবাসীকে হয়রানিমূলক মামলা দেয়।

রোয়াংছড়িতে এক বৌদ্ধ বিহারে সেনাবাহিনীর তল্লাসী

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ ভোর ৩:০০ টার দিকে বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার নোয়াপতং ইউনিয়নের কানাইজো পাড়ার বৌদ্ধ বিহারে আন্তা পাড়া ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা তল্লাশি চালায় এবং বৌদ্ধ বিহারের পবিত্রতা নষ্ট করে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছে। বিহারে প্রবেশ করে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে অস্ত্র ঠেকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বিহারাধ্যক্ষকে অস্ত্র বের দিতে চাপ দেয়। বিহারে ঘন্টাখানিক তল্লাশি চালানোর পর সেনা সদস্য চলে যায়।

রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা, নিরীহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ রাত আনুমানিক ১:০০ টায় অজ্ঞাতপরিচয় একদল ব্যক্তি রাঙ্গামাটি শহরের ভালেদি এলাকায় রাঙ্গামাটি জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ঝর্ণা খীসাকে হামলা চালিয়ে শারীরিকভাবে জখম করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমা ও রাঙ্গামাটি থানা কমিটির সহ-সভাপতি অংকুর চাকমাসহ ২১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৮ ডিসেম্বর ২০১৭, দিবাগত মধ্যরাত ১২:৩০ টার দিকে পুলিশ রাঙ্গামাটি শহরের ভেদভেদি ও রাঙাপানি এলাকা থেকে ৭ নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- ১. মঙ্গল মনি চাকমা (২৬), পীং- মৃত পুষ্প চন্দ্র চাকমা, অটোরিক্সা চালক, ঠিকানা- ভেদভেদি; ২. রিকন চাকমা মোম্বু (২৮), পীং- মন্টি কুমার চাকমা, অটোরিক্সা চালক, ঠিকানা- ভেদভেদি; ৩. সাধন চাকমা (২৮), পীং- কালাবিজা চাকমা, দিনমজুর, ঠিকানা- ভেদভেদি; ৪. কালাঞ্জিত চাকমা (২২), পীং- মৃত কৃষ্ণ মঙ্গল চাকমা, সেলুন কর্মী, ঠিকানা- ভেদভেদি; ৫. রূপম চাকমা (২৮), পীং- সাধন চন্দ্র চাকমা, ছাত্র, ঠিকানা- ভেদভেদি; ৬. বাবু চাকমা এমারসন (২৭), পীং- গুলোমনি চাকমা, ঠিকানা- রাঙাপানি; ৭. রিটন চাকমা (২৯), পীং- মৃত উমাচান চাকমা, ঠিকানা- রাঙাপানি।

আটককৃত উল্লেখিত ৭ জনকে ৮ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। এরপর যথাক্রমে ১০ ডিসেম্বর পুলিশ আদালতে আটকৃকতদের ৫ দিনের রিমান্ড দাবি করে। ১২ ডিসেম্বর এক শুনানীতে আদালত একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। গত ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজবনবিহার এলাকা থেকে পুলিশ তিন যুবককে আটক করে বলে জানা যায়। তবে তাদেরকে আদালতে হাজির করা হয়নি। তাদেরকে পরে ছেড়ে দেয়া হতে পারে।

জুরাছড়িতে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা, নিরীহ ৫ জনকে গ্রেফতার

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ জুরাছড়ি থানার এসআই মো: মঈন উদ্দিন কর্তৃক নিরীহ গ্রামবাসী এবং জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের ৯ সদস্য ও অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনের বিরুদ্ধে জুরাছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত ৯ জনের মধ্যে রয়েছেন জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সভাপতি মায়াচান চাকমা; জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমিত চাকমা; পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, জুরাছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক পলাশ চাকমা (৩৫) ও সাংগঠনিক সম্পাদক মণিষ চাকমা (৩৮) এবং সদস্য রিপন চাকমা বম, যুব সমিতির জুরাছড়ি ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক চিত্র কুমার চাকমা।

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ সন্ধ্যায় জুরাছড়ি উপজেলা সদরের ঢেবাছড়া মগবাজার এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় একদল ব্যক্তি কর্তৃক অরবিন্দু চাকমাকে হত্যার ঘটনায় নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির উল্লেখিত সদস্যদেরকে দায়ী করে উক্ত ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য যে, এধরনের ঘটনায় কেউ বাদী হয়ে মামলা দায়ের না করলে পুলিশ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। কিন্তু বিধি-বহির্ভূতভাবে পুলিশ সরাসরি জনসংহতি সমিতির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের নাম উল্লেখ করে উক্ত মামলা দায়ের করে, যা ছিল ষড়যন্ত্রমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল ১১:৩০ হতে দুপুর ১:০০ টার মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলা সদর এলাকা থেকে জুরাছড়ি থানার পুলিশ ও জুরাছড়ি সেনা জোনের সেনা সদস্যরা জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আরও ৫ নিরীহ জুম্মকে আটক করেছে। পুলিশ কর্তৃক আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন- ১. হেমন্ত চাকমা (২২), পীং- রনজিত কার্বারী, সাং- বরকলক, দুমদুম্যা ইউনিয়ন; ২. রবিধন চাকমা (২১), পীং- অমৃত লাল চাকমা, সাং- উপজেলা সদর, জুরাছড়ি ইউনিয়ন; ৩. মানস চাকমা (২৩), পীং- লক্ষ্মীরাম চাকমা, সাং- ধামাই পাড়া, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন; ৪. লক্ষ্মীলাল চাকমা (৪৪), পীং- অজ্ঞাত, সাং- দুমদুম্যা ইউনিয়ন; ৫. উত্তম কুমার চাকমা (৪৫) পীং- নিরঞ্জন চাকমা, সাং- চৌমুহনী, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন।

উল্লেখ্য, লক্ষ্মীলাল চাকমা দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৬নং ওয়াডের একজন নির্বাচিত সদস্য। প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি ঐ সময় প্রয়াত জনৈক তড়িৎ কান্তি চাকমার সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে লাকড়ি বহন করছিল। অপরদিকে, সেনাসদস্যরা উত্তম কুমার চাকমা নামে আরেক ব্যক্তিকে আটক করে। উল্লেখ্য, উত্তম কুমার চাকমা জনসংহতি সমিতির বনযোগীছড়া ইউনিয়ন কমিটির সদস্য।

বিলাইছড়িতে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা, ৭ জনকে গ্রেপ্তার

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বিলাইছড়ি উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি রাম চরণ মারমা ওরফে রাসেল (৫৬) কর্তৃক বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি শুভমঙ্গল চাকমা, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্যামা চাকমা, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক অমৃতসেন তঞ্চঙ্গ্যা এবং জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যাসহ জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গসংগঠনের ৩১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। উল্লেখ্য যে, গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৭, বিকেলের দিকে, বিলাইছড়ি উপজেলার তিলিক্যাছড়ি গ্রামে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি কর্তৃক রাসেল মারমার উপর শারীরিকভাবে হামলা করা হয়। উক্ত ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের জড়িত করে উক্ত মিথ্যা ও সাজানো মামলা দায়ের করা হয়।

এ ঘটনার পর গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের ১৩ বেঙ্গলের একদল সেনাসদস্য উপজেলার দীঘোলছড়ি ও কেরংছড়ি গ্রামে এক অভিযান চালিয়ে নিম্নোক্ত ৪ ব্যক্তিকে আটক করে। আটককৃতরা হলেন- ১. সুমন চাকমা (২৮), পীং-অমরেন্দ্র লাল চাকমা; ২. বুদ্ধ বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা (২৫), পীং-লাম্বাহুলা তঞ্চঙ্গ্যা; ৩. বিটোমনি চাকমা, পীং- নলিনী চাকমা; এবং ৪. সুনীল কান্তি চাকমা, পীং- কালিমন চাকমা। অপরদিকে উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের তক্তানালা সেনাক্যাম্পের সুবেদার মিজান এর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য তক্তানালা গ্রামে তল্লাসী অভিযান চালায় এবং এক ফারুয়া ইউনিয়নের মহিলা সদস্য রান্যাবি চাকমা ও তাঁর স্বামীসহ নিরীহ তিন জুম্মকে আটক করে। সেনা সদস্যরা প্রায় সারা রাত ধরে রান্যাবি ও তাঁর স্বামীকে তাদের সাথে তল্লাসী অভিযানে ঘুরতে বাধ্য করে। পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনকে ছেড়ে দিলেও স্থানীয় দোকানদার চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে।

একই সঙ্গে ৮ ডিসেম্বর ২০১৭, ভোর সকালে, সেনা ও পুলিশের একটি দল রাঙ্গামাটি শহরস্থ আসামবস্তী এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শুভমঙ্গল চাকমা (৫৮) ও তাঁর পুত্র সমর বিজয় চাকমা (২৫)-কে গ্রেপ্তার করে। গ্রেফতারের সময় বাউন্ডারির গেইট ভেঙ্গে পুলিশরা প্রবেশ করে এবং বাউন্ডারিতে ঢুকে একনাগারে ঘরের চারদিকে জানালা-দরজা ধাক্কা দিতে থাকে। সশস্ত্র সামরিক অভিযান পরিচালনার মতো চারদিকে রাইফেল তাক করে এ সময় এক ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে শুভ মঙ্গল চাকমার স্ত্রী দরজা খুলে দিলে দরজা খুলতে না খুলতে তাঁকে ঠেলে পুলিশ সমস্যরা সরাসরি তাঁদের বেডরুমে ঢুকে পড়ে এবং শুলমঙ্গল চাকমাকে আটকিয়ে অশালীনভাবে পাকঘরসহ ঘরের বিভিন্ন কক্ষ তল্লাসী চালাতে থাকে। গ্রেফতারের কোন কারণ না জানিয়ে কেবল 'থানা যেতে হবে' বলে পুলিশ সমস্যরা শুভমঙ্গল চাকমাকে নির্দেশ দেয়। তাঁর সাথে তাঁর ছেলেকেও যেতে হবে বলে পুলিশরা জানায়। এসময় শুভমঙ্গল চাকমাকে গরম কাপড় পরতেও পুলিশ সদস্যরা সময় দিচ্ছিল না। ৩০/৪০ জন পুলিশ সদস্যসহ সেনাবাহিনীও এই গ্রেফতারে অংশ নেয় বলে জানা গেছে।

বিলাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যানসহ আটককৃত উল্লেখিত ৭ জনকে ৮ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ১ জানুয়ারি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জামিন লাভ করেন। এরপর ৭ জানুয়ারি সুমন চাকমা, বুদ্ধ বিজয় চাকমা, বিটোমনি চাকমা ও সুনীল কান্তি চাকমা জেল থেকে জামিনে বের হন। সর্বশেষ ১৭ জানুয়ারি বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শুভ মঙ্গল চাকমা জামিন লাভ করেন।

ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ জনকে আটক, পরে থানা থেকে ছাড়

গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৭, দিবাগত রাত আনুমানিক ২:৩০ টায়, সুবেদার মিজান এর নেতৃত্বে তক্তানালা সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য ফারুয়া ইউনিয়নের তক্তানালা এলাকার রয়াপাড়া গ্রামে তল্লাসী অভিযান চালিয়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের আটক করে। তাদেরকে সেনা সদস্যরা বিলাইছড়ি থানায় হস্তান্তর করে। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় পুলিশ বিকালে তাদেরকে বিলাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সচিব অনিল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার জিম্মায় ছেড়ে দেয়। হয়রানির শিকার গ্রামবাসীরা হলেন-

১. পুতুল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৮), পীং- আঙ্কারা তঞ্চঙ্গ্যা;
২. অমরধন তঞ্চঙ্গ্যা (৪০), পীং- মুক্তধন তঞ্চঙ্গ্যা;
৩. সিদ্দিকা তঞ্চঙ্গ্যা (৩৬), পীং- বিয়োং তঞ্চঙ্গ্যা;
৪. বোধিচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, পী- মঘাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা;
৫. জনচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫), পীং- অজ্ঞাত;
৬. বালিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (৪২), পীং- বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা।

রাজস্থলী সাব-জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার সরোয়ারের নেতৃত্বে জেএসএস রাজস্থলী কার্যালয়ে অনুপ্রবেশ

গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ রাত আনুমানিক ১২:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলায় সেনাবাহিনীর রাজস্থলী সাব-জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার সরোয়ার এর নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা কার্যালয়ে অনুপ্রবেশ করে।

জানা গেছে, সেনাসদস্যরা ঐ সময় জনসংহতি সমিতির ভাড়াতে কার্যালয়ে গেলে দরজা তালাবদ্ধ দেখতে পায়। এরপর সেনাসদস্যরা কার্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কার্যালয়ের মূল মালিককে অফিসে কেউ থাকে কিনা জানতে চাইলে কার্যালয়ের মালিক 'তারা দিনে কার্যালয়ে কাজ করার পর তা বন্ধ করে চলে যায়' বলে জানায়। এতে সেনাসদস্যরা মালিকের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে কার্যালয়ে প্রবেশ করে। তবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেনাসদস্যরা কার্যালয় থেকে বের হয়ে আসে এবং চলে যায়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি তল্লাসী ও হয়রানি

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ দিবাগত রাতে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলায় জুরাছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য উপজেলা সদরস্থ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের এক বাড়িসহ ৫ নিরীহ জুম্ম বাড়িতে তল্লাসী চালায়। জানা গেছে, সেনা সদস্যরা প্রথমে দিবাগত রাত ১:৩০টার দিকে ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শান্তিরাজ চাকমার জুরাছড়ি উপজেলা সদরস্থ ভাড়াতে বাড়িতে তল্লাসী চালায়। এসময় চেয়ারম্যান বাড়িতে ছিলেন না।

এরপর সেনাসদস্যরা ভোর ৫:০০ টায় চকপতিঘাট এলাকায় পরপর মনিষ তালুকদার (৩০), পীং- অনিল তালুকদার, রূপম চাকমা (৩৭), পীং- বিনয় কুমার চাকমা, খোকন চাকমা (৩৮), পীং- অবিন চাকমা ও সুভাষ জ্যোতি চাকমা (২৮), পীং- তরুণ মোহন চাকমা'র বাড়িতে তল্লাসী চালায় এবং জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। উল্লেখ্য, মনিষ তালুকদার পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির জুরাছড়ি থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক।

সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাইছড়িতে একজনকে নির্যাতনের পর পুলিশে সোপর্দ

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ দিবাগত রাত আনুমানিক ১:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলায় দীঘলছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য উপজেলার কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের ইজাছড়ি গ্রামের জনসংহতি সমিতির গ্রাম কমিটির সভাপতি কমল চাকমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ইজাছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে আটক করে। আটকের পর সেনা সদস্যরা কমল চাকমাকে রাতে বিভিন্ন জায়গায় তাদের সাথে ঘুরতে বাধ্য করে। এরপর সেনাসদস্যরা কমল চাকমাকে দীঘলছড়ি সেনা জোনে নিয়ে গিয়ে সেখানে আটক করে রাখে। ক্যাম্পে আটকের সময় সেনা সদস্যরা অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে। এতে কমল চাকমা কোমরে ও মেরুদণ্ডে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

১২ ডিসেম্বর ২০১৭ সন্ধ্যা ৬:০০ টার দিকে সেনাসদস্যরা কমল চাকমাকে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করতে চাইলে মারাত্মক জখম অবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। ফলে সেনাসদস্যরা এর পরপরই কমল চাকমাকে বিলাইছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করাতে বাধ্য হয়। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল আনুমানিক ৮:৩০ টার দিকে সেনাসদস্যরা কমল চাকমাকে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশের নিকট সোপর্দ করে এবং রাঙ্গামাটিতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করার পর জেলে প্রেরণ করা হয়।

বিলাইছড়িতে সেনাসদস্য কর্তৃক ৪ নিরীহ জুম্ম আটক, হয়রানি

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ সকালে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার বিলাইছড়ি বাজার ও ফারুয়া এলাকা থেকে ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য কর্তৃক পৃথকভাবে ৪ নিরীহ জুম্মকে আটক করা হয়। তবে পরে হয়রানিমূলকভাবে কয়েক ঘন্টা সেনা জোনে আটক রাখার পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

জানা গেছে, ঐদিন সকাল ১০:০০ টার দিকে বিলাইছড়ি উপজেলা সদরের দীঘলছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য বিলাইছড়ি বাজার এলাকা থেকে (১) আলো রঞ্জন দেওয়ান (৩৫), পীং-মৃগাঙ্ক দেওয়ান, সাং-বাজার এলাকা ও (২) রামথার পাংখোয়া (৩৮), সাং-বিলাইছড়ি পাংখোয়া পাড়া-কে আটক করে। হয়রানিমূলকভাবে কয়েক ঘন্টা সেনা জোনে আটক রাখার পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অপরদিকে, সকাল ৮:৩০ টার দিকে বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া উপজেলার ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য পার্শ্ববর্তী এগোজ্যাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা (৩) শুভলাল তঞ্চঙ্গ্যা (৪০), পীং- পূর্ণ তঞ্চঙ্গ্যা ও (৪) প্রিয়লাল তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫), পীং-ঐ-কে নিজ বাড়ি থেকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে সেনা সদস্যরা 'সন্ত্রাসীরা কোথায় থাকে? এখানে তাদের 'বস' কে?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস ও হয়রানি করে দুপুর ১২:৩০ টার দিকে আটককৃতদের ছেড়ে দেয়।

জুরাছড়িতে সেনা জোনের শান্তি ও সম্প্রীতি সম্মেলনে সন্তু লারমার বিরুদ্ধে মেজর তৈয়বের উস্কানিমূলক বক্তব্য

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল ১০টায় জুরাছড়ি উপজেলায় জুরাছড়ি সেনা জোন কর্তৃক আয়োজিত শান্তি ও সম্প্রীতির উন্নয়ন, নিরাপত্তা সম্মেলনে জুরাছড়ি জোনের টুআইসি মেজর তৈয়ব পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমার বিরুদ্ধে বিষোদাগার করেন। মেজর তৈয়ব তার বক্তব্যে আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সরকারের দায়িত্বে থেকে সরকার-বিরোধী কথা বলে থাকেন। তিনি ঢাকায় বক্তব্য দেয়ার পর সম্প্রতি জুরাছড়িতে বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে বলে অপপ্রচারণামূলক মতামত তুলে ধরেন। মেজর তৈয়ব আরো বলেন, সরকার দলীয় কর্মীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবন নাশের হুমকি দেয়া হয় এবং দলত্যাগের জন্য চাপ প্রদান করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ প্রসঙ্গে জুরাছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান উদয় জয় চাকমা বলেন, নিহত অরবিন্দু চাকমা আমার নিকট আত্মীয়। আমি দাহক্রিয়ায় যেতে চেয়েছিলাম। সেজন্য নিরাপত্তা চেয়েছি। পুলিশ চেয়েছি। কিন্তু আমাকে পুলিশ দেয়া হয়নি। নিরাপত্তাহীনতার কারণে আমি অন্যত্র গিয়ে অবস্থান করেছি। জনগণ নিরাপদবোধ করছে না। জনগণ আস্থায় আসতে পারে এমন ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে জনগণ সহজে আসবে না।

বিলাইছড়িতে সেনা নির্যাতন ও গ্রেফতারকৃত ৫ জনসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর একটি দল একাধিক গ্রামে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-র সদস্যসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তারকৃতদেরসহ ৩১ জন জুম্মর বিরুদ্ধে এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগ এনে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ আবারও একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় উক্ত ৩১ জন জুম্ম ছাড়াও অজ্ঞাতনামা আরও ১০/১২ জনের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা হয়।

জানা গেছে, গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ বিকাল আনুমানিক ৫:৩০ টার দিকে ফারুয়া ইউনিয়নের গোয়াইনছড়ি গ্রামের বাসিন্দা নিলোচান তঞ্চঙ্গ্যা (৫০) বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকায় গরু চড়াতে গেলে আর বাড়ি ফিরে আসেননি অথবা কে বা কারা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এদিকে গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ দিবাগত রাত ৩:০০টা হতে ভোর সকালের মধ্যে ফারুয়া সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য একাধিক গ্রামে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে জনসংহতি সমিতির স্থানীয় কর্মীসহ ৮ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক করে ফারুয়া সেনাক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন চালায়। নির্যাতন চালানোর পর ঐ দিন বিকাল ৪:০০ টার দিকে ফারুয়া সেনা ক্যাম্প থেকে সম কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫), পীং- কালাচান তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- এগোজ্যাছড়ি, ফারুয়া নামের এক জুম্মকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে জেএসএস-এর সদস্যসহ বাকি ৭ জনকে বিলাইছড়ি সদরস্থ দীঘলছড়ি সেনা জোনে নিয়ে আসা হয়। গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ সকালের দিকে এদের মধ্য থেকে ২ জনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি ৫ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গ্রেপ্তারকৃত ৫ জন হলেন-

১. জীবন তঞ্চঙ্গ্যা (৪০), পীং-সুধন্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- এগোজ্যাছড়ি, ফারুয়া। তিনি জনসংহতি সমিতির ফারুয়া ইউনিয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ফারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য; ২. শম্ভু তঞ্চঙ্গ্যা (৩২), পীং- বিল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- গোয়াইনছড়ি, ফারুয়া। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির ফারুয়া ইউনিয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক; ৩. আপন তঞ্চঙ্গ্যা (৩০), পীং-ফোলেয়্যা তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- গোয়াইনছড়ি, ফারুয়া। তিনি জনসংহতি সমিতির স্থানীয় গ্রাম কমিটির সদস্য; ৪. শান্তিময় চাকমা (৩৫), পীং- মৃত উস্যা (হীরালাল) চাকমা, ঠিকানা- গোয়াইনছড়ি, ফারুয়া। তিনি ফারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের একজন কর্মচারী; ৫. রিপন তঞ্চঙ্গ্যা (৩০), পীং- নতুন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ঠিকানা- গোয়াইনছড়ি, ফারুয়া। তিনি একজন দোকানদার।

অপরদিকে আটক ও নির্যাতনের পর ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল ৭:০০ টার দিকে দীঘলছড়ি সেনা জোন থেকে ছাড়া পাওয়া দুই জুম্ম গ্রামবাসী হলেন- কন্যাচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫), পীং- তেজেন্দ্র লাল তঞ্চঙ্গ্যা এবং পূর্ণ লাল চাকমা (৪০), পীং- সুন্দরমনি চাকমা, উভয়ের ঠিকানা গোয়াইনছড়ি, ফারুয়া।

আটককৃতদের মধ্যে জীবন তঞ্চঙ্গ্যা, রিপন তঞ্চঙ্গ্যা ও আপন তঞ্চঙ্গ্যাকে লাঠি ও লাকড়ি দিয়ে আঘাত করে। একপর্যায়ে আপন তঞ্চঙ্গ্যাকে সুঁই ফুটিয়ে নির্যাতন করে। আটককৃত উল্লেখিত পাঁচজন ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জামিন লাভ করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রে নিলোচান তঞ্চঙ্গ্যা (৫০)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণের অভিযোগ এনে অপহৃতের ছেলে সজীব তঞ্চঙ্গ্যাকে বাদী করে ৩১ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিলাইছড়ি থানা মামলা নং-০৩, তাং-২৩/১২/১৭, মামলার ধারা ৩৬৪/৩৪ দণ্ডবিধি।

বালুখালিতে মেম্বার-কার্বারীদের ডেকে সেনাবাহিনীর সভা

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার বালুখালি ইউনিয়নের কেল্যামুড়া এলাকায় রাজমনিপাড়া সেনা ক্যাম্পের কম্যান্ডার জনৈক লেফটেন্যান্ট কর্তৃক ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী গ্রামের ১৪ জন মেম্বার-কার্বারীকে ডেকে এনে তাদের সাথে ক্যাম্পে এক সভা করেন। ক্যাম্প কম্যান্ডার উক্ত মেম্বার-কার্বারীদের হাতে ক্যাম্পের একটি ফোন নাম্বার ধরিয়ে দেন। ক্যাম্প কম্যান্ডার এলাকায় কোন সন্ত্রাসী আসলে বা কোথাও সন্ত্রাসীর খোঁজ পেলে ক্যাম্পে খবর দেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কেউ সেগুন গাছ বাদে অন্যান্য যে কোন গাছ-বাঁশ নিয়ে গেলে মেম্বার-কার্বারীদের অনুমোদন পত্র বা পাশ নিতে হবে বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়।

কাপ্তাইয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাসী, জিনিসপত্র তছনছ

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ দিবাগত রাত আনুমানিক ১২:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদরস্থ দীঘলছড়ি সেনা জোনের অধীন গাছকাবা ছড়া সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই ইউনিয়নের অন্তর্গত বিলাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী গাছকাবা ছড়া গ্রামের বাসিন্দা শান্তি কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) পীং- অজ্ঞাত-এর বাড়ি ঘেরাও করার পর ভেতরে প্রবেশ করে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়।

জানা যায়, সেনাসদস্যরা বাড়িতে টাঙানো এম এন লারমার প্রতিকৃতি দেখে ‘ছবিটা কার? কীজন্য এটা রাখছ?’ বলে শান্তি কুমার তঞ্চঙ্গ্যার কাছে জানতে চায়। শান্তি কুমার তঞ্চঙ্গ্যা এম এন লারমার পরিচয় জানিয়ে তার প্রতিকৃতি সবাই বাড়িতে রাখে বলে জানায়। সেনাসদস্যরা শান্তি কুমার তঞ্চঙ্গ্যাকে তিনি জেএসএস (জনসংহতি সমিতি) করেন কিনা জানতে চাইলে শান্তি কুমার তঞ্চঙ্গ্যা স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন বলে জানান। এরপর সেনাসদস্যরা তল্লাশির নামে শান্তি কুমার তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে ও এম এন লারমার ছবি ছিড়ে দিয়ে চলে যায়।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক আবারও তল্লাশী, জেএসএস সদস্যসহ আটক ৪

জেএসএস সদস্যকে পুলিশে সোপর্দ করে অন্যদের মুক্তি

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে ফারুয়া সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য তল্লাশী অভিযান চালিয়ে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-এর সদস্যসহ ৪ জন জুম্মকে আটক করে সেনাক্যাম্পে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। সেনাক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে সেনাসদস্যরা উক্ত ৪ ব্যক্তিকে নির্যাতন ও হয়রানি করে ৩ জনকে ছেড়ে দিলেও জেএসএস সদস্যকে আটকে রাখে বলে জানা যায়। আর ঐদিনই সেনাবাহিনী জেএসএস সদস্যকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে বিলাইছড়ি থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে বলে জানা গেছে।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি হলেন– পরাশ্ব তঞ্চঙ্গ্যা, পীং-অজ্ঞাত, ঠিকানা- তারাছড়ি, ফারুয়া। তিনি জনসংহতি সমিতির তারাছড়ি গ্রাম কমিটির সভাপতি এবং স্থানীয় গ্রামের কার্বারী। অপরদিকে আটকের শিকার অন্য ব্যক্তিরা হলেন–

১. জটিল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫), পীং-অজ্ঞাত, ঠিকানা-তারাছড়ি, ফারুয়া। তিনি ফারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য।
২. মনাইপ্রু মারমা (২৫), পীং-অজ্ঞাত, ঠিকানা- ফারুয়া বাজার।
৩. লাম্বা হুলো তঞ্চঙ্গ্যা (৫০) পীং-অজ্ঞাত, ঠিকানা- তারাছড়ি, ফারুয়া। তিনিও ফারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য।

নাইক্ষ্যংছড়ির সোনাইছড়িতে র‌্যাব কর্তৃক দুইজন নিরীহ গ্রামবাসী আটক

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নে লামার পাড়ার মাদক দ্রব্য উদ্ধারের নামে কক্সবাজার র‌্যাব ব্যাটালিয়ান ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নিরাপরাধ দুই পাড়াবাসী মংমে মারমা পিতা-মৃত মংছাইং মারমা এবং উহ্লামং মারমা পিতা-মংব্রাচিং মারমাকে আটক করে মামলা দিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

বিলাইছড়িতে জেএসএস সদস্যসহ ৩ জুম্ম বাড়িতে সেনা তল্লাশী ও হুমকি

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ দিবাগত রাত আনুমানিক ১২:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য উপজেলাধীন ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়নের হাজাছড়া গ্রামের জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-র সদস্যসহ ৩ জুম্ম বাড়িতে একের পর এক তল্লাশী চালায়, জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং বিভিন্ন হুমকি-ধামকি প্রদান করে। তল্লাশীর শিকার জুম্মরা হলেন- ১. ধনময় চাকমা (৩৫) পীং-নম কুমার চাকমা। তিনি জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি ইউনিয়ন কমিটির সহ-সভাপতি; ২. রূপায়ন চাকমা (২৮) পীং-অজ্ঞাত। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক; ৩. সুশান্ত চাকমা (২৪) পীং-অরুণ বিকাশ চাকমা। তিনি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

জানা গেছে, সেনা সদস্যরা প্রথমে দিবাগত রাত ১২:৩০ টায় একযোগে উক্ত তিনটি বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়ে ফিরে আসে। এসময় উক্ত ব্যক্তিরা বাড়িতে ছিলেন না।

এরপর রাত ১:৩০ টার দিকে সেনাসদস্যরা আবার রূপায়ন চাকমার বাড়িতে ঢুকে তল্লাশী চালায় এবং রূপায়ন চাকমার স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে মারধরের ভয় দেখায়। এসময় সেনাসদস্যরা রূপায়ন চাকমার স্ত্রীর কাছে তার স্বামী কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করে এবং অচিরেই ক্যাম্পে দেখা করতে না গেলে তার স্বামীর অসুবিধা আছে বলে হুমকি দেয়।

উল্লেখ্য যে, বেশ কিছু দিন ধরে সেনাবাহিনী বিলাইছড়ির বিভিন্ন গ্রামে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীদের বাড়িতে তল্লাশী, হয়রানি, আটক ও নির্যাতন চালিয়ে আসছে। ফলে গ্রামের অনেকেই এখন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে।

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির তিনজন জুম্ম ছাত্রকে আটক

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ রোজ শনিরার আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির তিনজন জুম্ম ছাত্রকে আটক করেছে বলে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ২০১৮ সালে এইচএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রায় ২৯ জনের মতো অনুতীর্ণ হয়। তাই গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ ক্লাস চলাকালীন সময়ে কলেজ অধ্যক্ষ মো: তাসাবিক হোসেন কবিবের সাথে নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ে আলাপ করার জন্য সাক্ষাত করতে চাইলে কলেজের ছাত্রদের সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করেন পাবলিক কলেজের অধ্যক্ষ মো: তাসাবিক হোসেন কবির। এতে ছাত্ররা অধ্যক্ষের উপর ক্ষেপে যান। এক পর্যায়ে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। বন্ধ করে দেন কলেজের মূল ফটক। এক পর্যায়ে ঘটনার সময় কে বা কারা কলেজের কাঁচ ভেঙে দেয়। আর সেটাকে পূঁজি করে কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু ছাত্রদের দোষারোপ করে পুলিশকে অবগত করেন। পরে পুলিশ এসে দীপঙ্কর খীসা (১৮) পিতা- জ্ঞান বিকাশ খীসা ব্যবসায় বিভাগ, ড্যানিশ চাকমা (১৭) পিতা- জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা মানবিক বিভাগ, রমেল চাকমা (১৮) মানবিক বিভাগ এর তিনজন ছাত্রকে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে আটক করে নিয়ে যায়।

উক্ত তিন ছাত্রের অভিভাবক কলেজে এসে কলেজের অধ্যক্ষের সাথে দেখা করে বিষয়টি সুরাহার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধে ধৃত ছাত্রদের ছেড়ে দেয়ার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ থানার ওসিকে ফোন করে দেন। তারপরও পুলিশ ধৃত ছাত্রদের ছেড়ে দিতে গড়িমসি করে। জেলা প্রশাসককে দোহাই দিয়ে মামলা দায়ের করার পাঁয়তারা চালায়। অবশেষে পরের দিন ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

আলিকদম উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানকে পাথর উত্তোলন বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদানের কারণে সেনাবাহিনীর লাঞ্ছনা

গত ৪ জানুয়ারি ২০১৮ বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এবং জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য কাইংথপ ম্রোকে পাথর উত্তোলন বন্ধ করার দাবিতে স্মারকলিপি প্রদানের কারণে আলিকদম সেনা জোনে ডেকে নিয়ে লাঞ্ছিত করা করা হয় বলে জানা গেছে। উক্ত স্মারকলিপি প্রত্যাহারের জন্যও কাইংথপ ম্রোকে চাপ দেয় সেনা জোন কর্তৃপক্ষ।

আদিকদমে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ গ্রামবাসীকে মারধর

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ সেনাবাহিনী বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার রম্বু গয়াম ঝিড়ি এলাকায় এক তল্লাসী অপারেশন চালায়। এ সময় সেনাবাহিনী কয়েকটি পাড়ার লোকজনকে মারধর করে আহত করে। মারাত্মকভাবে আহত ব্যক্তিরা হলেন- ১. রমেশ ত্রিপুরা খোকন (২৫); ২. ধীরেশচন্দ্র চাকমা (৪০) পীং দেবকুমার চাকমা; ও ৩. বসুদেব চাকমা পীং নীলমণি চাকমা (৬০) সর্ব সাং জ্ঞানরঞ্জন কার্বারী পাড়া; ৪. কাঞ্চন চাকমা (২৬) পীং কুমার বিকাশ চাকমা; ৫. গোলক্কো চাকমা (৫৫); এবং ৬. রইক্যা চাকমা (২২) পীং গোলক্কো চাকমা, সর্ব সাং গয়াম ঝিড়ি।

বিলাইছড়ির ফারুয়ায় সেনাবাহিনীর ৪০টি বাড়ি তল্লাসী, ২ জন গ্রেফতার, ৫ জনকে মারধর

গত ২১ জানুয়ারি ২০১৮ রাত আনুমানিক ৩:০০ টায় বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নে ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য নতুন বাবু তঞ্চঙ্গ্যা (৩৪) ও ভন্দ তঞ্চঙ্গ্যাকে (৩৩) নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। ২২ জানুয়ারি তাদের আদালতের মাধ্যমে জেলে প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে ২২ জানুয়ারি ২০১৮ রাত আনুমানিক ১২:০০ টা থেকে ১:০০টায় তক্তানালা ক্যাম্পের একদল সেনা কর্তৃক বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের তক্তানালা দক্ষিণ পাড়ায় তল্লাসী অভিযান চালানো হয়। এতে সেনা সদস্যরা জুম্মদের ৪০টি ঘরবাড়িতে ব্যাপক তল্লাসী চালায়। তল্লাসী চলাকালে ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে। জনসংহতি সমিতির সদস্যরা কোথায়, তারা কোথায় থাকে দেখিয়ে দিতে হবে– ইত্যাদি জিজ্ঞাসাবাদ করে হুমকি প্রদান করে। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রথম ৫ জন গ্রামবাসীকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে জানা যায়।

নাইক্ষ্যংছড়িতে থানছি থেকে বেড়াতে আসা ৬ ত্রিপুরাকে বিজিবি কর্তৃক গ্রেফতার

গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ৭:৩০ টায় বান্দরবান জেলার নাইক্ষংছড়ি উপজেলার দোছড়ি ইউনিয়নের কামিছড়া মৌজায় বাইসান ত্রিপুরা পাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ৬ জন নিরাপরাধ ত্রিপুরা আদিবাসী বিজিবি কর্তৃক আটকের শিকার হয়েছেন। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন ৩১ বিজিবির লেমুছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার বাক্কী বিল্লাহের নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য

উক্ত ৬ জন ত্রিপুরা আদিবাসীকে বাইসান ত্রিপুরা পাড়ার আত্মীয়ের বাড়ি হতে আটক করে এবং জোন সদরে নিয়ে অমানষিক নির্যাতন করে বলে জানা যায়। আটকৃতরা হলেন- থানছি উপজেলার রেমাক্রি ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডের হামাজন ত্রিপুরা পাড়া বাসিন্দা।

১. অনাচন্দ্র ত্রিপুরা পিতা- আথাক রায় ত্রিপুরা, হামাজন ত্রিপুরা পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, রেমাক্রি ইউনিয়ন; ২. গুণামণি ত্রিপুরা পিতা- আথুই হা ত্রিপুরা, হামাজন ত্রিপুরা পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, রেমাক্রি ইউনিয়ন; ৩. মিন্টু ত্রিপুরা পিতা- রবি ত্রিপুরা, হামাজন ত্রিপুরা পাড়া, ২নং ওয়ার্ড, রেমাক্রি ইউনিয়ন; ৪. অব্রাহাম ত্রিপুরা পিতা- মায়ারাম ত্রিপুরা, বাদুরাম ত্রিপুরা পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, তিন্দু ইউনিয়ন; ৫. মুথিরাম ত্রিপুরা পিতা- ক্যজহা ত্রিপুরা, বাদুরাম ত্রিপুরা পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, তিন্দু ইউনিয়ন; ৬. আদিলা ত্রিপুরা পিতা-অব্রাহাম ত্রিপুরা, বাদুরাম ত্রিপুরা পাড়া, ৯নং ওয়ার্ড, তিন্দু ইউনিয়ন।

আটককৃতরা গত ২৩ জানুয়ারি থানছি উপজেলা হতে নাইক্ষ্যংছড়ি হয়ে দোছড়ি ইউনিয়নে বাইসান ত্রিপুরা পাড়া বেড়াতে আসেন। তিনদিন অবস্থান করার পর ২৬ জানুয়ারি সকালে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় সেনাবাহিনী বিনা কারণে আটক করে জোন সদরে নিয়ে যায়। আটক হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পাড়ার কার্বারী নাইক্ষ্যংছড়ি জোন কমান্ডার আনোয়ারুল আজিমের সাথে দেখা করতে চাইলে প্রথমে বিকাল ২:০০ টায় দেখা করা কথা বললেও পরে দেখা না করার কথা জানিয়ে দেন। তাদেরকে রাত্রে নির্যাতন করে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন গ্রামবাসীকে আটক

গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ ভোর ৫:০০ টার দিকে ফারুয়ার ওড়াছড়ি গ্রাম থেকে ফারুয়া ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য (১) চাইন চু মারমা (হেডম্যান) পিতা চোয়ান জাই মারমা; (২) কংজো মারমা (কার্বারী) পিতা থোই অং মারমা; (৩) টুটুল মারমা পিতা কংজো কার্বারী; এবং (৪) চানি অং মারমা পিতা উষাঅং মারমাকে ধরে নিয়ে আসে। তাদেরকে দীঘলছড়ি জোনে নিয়ে আসা হয় বলে জানা গেছে। এ সময় সেনা সদস্যরা ভিকটিমদের পরিধেয় কাপড়ও বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। ৩০ জানুয়ারি বিকালের দিকে দীঘলছড়ি জোন থেকে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক বিলাইছড়ির কেংড়াছড়িতে বাড়ি তল্লাশী ও জেএসএস সদস্য খোঁজ

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাত আনুমানিক ১১:৪৫ টার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোনের একদল সেনাসদস্য কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের শামুকছড়ি গ্রামে প্রশান্ত চাকামা (২৬) পীং-বিনয় কুমার চাকমা'র বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে বাড়ির লোকদের হয়রানি করে এবং জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। প্রশান্ত চাকমা এসময় বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পেশায় একজন স্থানীয় দোকানদার এবং জনসংহতি সমিতির শামুকছড়ি গ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক। তল্লাশীর সময় সেনাসদস্যরা প্রশান্ত চাকমার স্ত্রীর কাছে জেএসএস বিলাইছড়ি থানা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক কোথায় গেছে, তাদের দেখেছে কিনা, তার বাড়ি কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

বান্দরবানে সেনাবাহিনীর গ্রেপ্তারের শিকার জনসংহতি সমিতির থানা সহ সভাপতি

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রাত ৯:৩০ টার দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বান্দরবান সেনা ব্রিগেডের একদল সেনাসদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা কমিটির সহ সভাপতি থোয়াইঅংগ্য মারমাকে (৫০) বান্দরবান পৌর এলাকার যৌথ খামার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গেছে, থোয়াই অংগ্য মারমা এসময় যৌথ খামার এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। গ্রেপ্তারের পর সেনাসদস্যরা থোয়াই অংগ্য মারমাকে বান্দরবান সদর থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, থোয়াই অংগ্য মারমাকে রাজভিলার এক চাঁদাবাজি মামলায় জড়িত করে জেলে পাঠায়। পরে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ জামিনে জেল থেকে বের হন।

বিলাইছড়ি ফারুয়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ২ জনকে মারধর, ৫টি বাড়ি তল্লাসী

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ দিবাগত রাত আনুমানিক ৯:৩০ ঘটিকার সময় বিলাইছড়ি উপজেলার ৩নং ফারুয়া বাজার সেনা ক্যাম্পের (১৩ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট) কমান্ডারের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য ফারুয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড আলিখং ত্রিপুরা পাড়ায় হাম বাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ি ঘেরাও করে। হাম বাহাদুর ত্রিপুরা তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাকে না পেয়ে সেনা সদস্যরা প্রতিবেশী নিরীহ গ্রামবাসী লামিয়া ত্রিপুরা (৪৫) পিতা কংসরাম ত্রিপুরা ও যতন মনি ত্রিপুরা (৩৫) পিতা হানাচন্দ্র ত্রিপুরার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এছাড়া সেনা সদস্যরা ফিলিপ ত্রিপুরা, দেবতান তঞ্চঙ্গ্যা, হাম বাহাদুর ত্রিপুরা, রাম বাহাদুর ত্রিপুরা ও জন বাহাদুর ত্রিপুরার বাড়ি তল্লাসী করে। এ সময় সেনা সদস্যরা ঘরবাড়ির জিনিসিপত্র তছনছ করে বলে জানা যায়।

সাংগঠনিক সংবাদ

এম এন লারমার ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্যাঞ্চল একটি মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে- সন্তু লারমা

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অধিকতর আন্দোলন সংগঠিত করুন’- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, সাবেক গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদ সদস্য, বিপ্লবী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১০ নভেম্বর ২০১৭ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কল্পনা চাকমা, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী রঞ্জিত দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসা ও সদস্য সুপ্রভা চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন জনসংহতি সমিতির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা।

স্মরণ সভার পূর্বে সকাল ৮টায় রাজবাড়িস্থ জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে প্রভাতফেরি শুরু হয়। ব্যানার ফেস্টুন সহকারে দুই লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বনরূপা প্রদক্ষিণ করে প্রভাতফেরিটি শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। তারপর শুরু হয় অস্থায়ী শহীদ মিনার ও এম এন লারমার প্রতিকৃতিতে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের পুষ্পমাল্য অর্পণ। পুষ্পমাল্য শেষে শুরু হয় স্মরণ সভা। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে সন্ধ্যায় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উড়ানো হয়। এছাড়া এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক ফোরামের উদ্যোগে বিকাল ৪টায় আয়োজন করা হয় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক ফোরামের সভাপতি শিশির চাকমার স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০ জন কবি কবিতা পাঠ করেন।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, ১০ই নভেম্বর

> এখানে সরকারের ষোলো আনা অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। বাংলাদেশ জন্মলাভ করেছে ৪৬ বছর হয়েছে। ৪৬ বছর ধরে আমরা পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ তথা এই এলাকার পাহাড়ি-বাঙালি অধিবাসীরা আমরা সেনাশাসনে রয়েছি। সেনা শাসন, গোয়েন্দা বাহিনী, এখানকার আমলা বাহিনী, ক্ষমতাসীন দলের সেটেলারদের মিলিতভাবে যে দমন-পীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা আজকে সীমাহীন পর্যায়ে চলে গেছে। আজকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমাদের নিরাপত্তাহীন, অনিশ্চিত জীবন নিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

'৮৩-এর ঘটনা একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে বিভেদপন্থী চার কুচক্রী দ্বারা সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মহান নেতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল সেই কুচক্রী মহল। সেই বিভেদপন্থী, সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এখনো সক্রিয় রয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য বর্তমানেও উঠে পড়ে রয়েছে। সেজন্যই আজকের স্মরণ সভায় বক্তাদের বক্তব্যে সেসব সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়ার ও তাদের প্রতিরোধ করার কথা উঠে এসেছে। জুম্ম সমাজে যারা সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, সরকার-শাসকগোষ্ঠীর লেজুড় হয়ে নিজেদের স্বার্থ পরিপূরণে সবসময় যারা সচেষ্ট রয়েছে তাদের সম্পর্কে আজকের স্মরণসভা আমাদেরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাদের ব্যাপারে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে, আরও সংগ্রামী হতে হবে। দরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লড়াই-সংগ্রামকে আরো উজ্জীবিত করা ও নিজেকে আরো সমর্পিত করা।

শ্রী লারমা আরো বলেন, আজকে যারা এই লড়াই-সংগ্রামকে গলা টিপে হত্যা করতে চাচ্ছেন এবং আমাদের জুম্ম সমাজের সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল যারা রয়েছে তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করা সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে বলে আমি মনে করি। আজকে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করেছে। কিন্তু সেই চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারছে না এবং সরকার বাস্তবায়ন করছে না। এখানে সরকারের ষোলো আনা অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। বাংলাদেশ জন্মলাভ করেছে ৪৬ বছর হয়েছে। ৪৬ বছর ধরে আমরা পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ তথা এই এলাকার পাহাড়ি-বাঙালি অধিবাসীরা আমরা সেনাশাসনে রয়েছি। সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী, এখানকার আমলা বাহিনী, ক্ষমতাসীন দলের সেটেলারদের মিলিতভাবে যে দমন-পীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা আজকে সীমাহীন পর্যায়ে চলে গেছে। আজকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমাদের নিরাপত্তাহীন, অনিশ্চিত জীবন নিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। এ জীবন আমরা মেনে নিতে চাই না এবং আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন চায় না। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে চায়। সেজন্য আজ জুম্ম জনগণের জীবনে এক নিরাপত্তাহীন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে। পার্বত্য চুক্তির পর ২০ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ একটি মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান বলেন, ষাট দশকে ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি এম এন লারমার আহ্বান ছিল 'গ্রামে চলো'। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত শত যুবক গ্রামে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছিলেন। এম এন লারমা নিজেও শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষায় সচেতন করেছিলেন। শিক্ষার পাশাপাশি ঘুমন্ত জুম্ম সমাজকে রাজনৈতিকভাবে জাগরিত করেছিলেন। তিনি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতা নন, তিনি সমগ্র দেশের নেতা ছিলেন। তাঁর সংসদীয় বক্তব্য আমি শুনেছি। তিনি আস্তে আস্তে যুক্তিসঙ্গতভাবে বক্তব্য দিতেন এবং শব্দ প্রয়োগ করতেন। কি প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি সংসদীয় বক্তব্য দিতেন তা আমি দেখেছি। তাঁর বক্তব্য প্রদানকালে অনেক সাংসদ তাঁকে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বক্তব্য ও দাবিনামা তুলে ধরতে পিছপা হননি। উনসত্তরে অন্যতম জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল সব কথার শেষ কথা স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম। কিন্তু কতটুকু তা অর্জিত হয়েছে? আমি মনে করি, আমরা একেবারেই বিফল হইনি। আমাদের আরো কঠোর আন্দোলন করতে হবে। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করেই সেই সফলতার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে।

জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা বলেন, এম এন লারমা ছিলেন মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ, পরিবর্তন হওয়ার গুণ-এর কথা বলেছিলেন। তারই আলোকে বিভেদপন্থীদেরকে 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে ক্ষমা করা ও পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। তিনি বলেছিলেন, আমাদের প্রধান কাজ হবে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। জুম্ম সমাজের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে মানুষকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এজন্য তিনি সাংগঠনিক নীতি দিয়েছিলেন যেটায় তিনি বলেছিলেন, শত্রুকে নিরপেক্ষ করতে হবে, নিরপেক্ষকে সক্রিয় করতে হবে। আওয়ামীলীগের এক নেতার বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হলেও এদেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক হতে পারেনি। তাই দেশের ০.০১ শতাংশ মানুষ পার্বত্য চুক্তির পক্ষে থাকলেও ৯৯.০৯ শতাংশ মানুষ চুক্তি বিরোধী। এই বাস্তবতা মনে রেখেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে তিনি বলেন।

বান্দরবানে এম এন লারমার ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোকদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

১০ নভেম্বর ৮৩ স্মরণে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১০ নভেম্বর ’১৭ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্মজাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানা কমিটির উদ্যোগে সকাল ৮:০০ ঘটিকার সময় প্রভাতফেরি, সকাল ৮:৩০ ঘটিকার সময় জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানা কমিটির সভাপতি উচসিং মারমার সভাপতিত্বে শোকসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় ভূমি বিষয়ক সম্পাদক চিংহ্লামং চাক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমা, আরো বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন বান্দরবান জেলা সভানেত্রী শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্রনুঅং মারমা, বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি থোয়াইক্যাজাই চাক। সভা সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পুশৈথোয়াই মারমা। সভার শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ ও সকল বীর শহীদ, শহীদ পরিবারের সদস্য, যারা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পঙ্গুত্ববরণ, জেলে অন্তরীণ ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন তাদের সকলের সকলের উদ্দেশ্যে ২ মিনিট মৌনব্রত পালন করা হয়। সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সুজয় চাকমা। সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকার সময় বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে ফানুস উত্তোলন এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়।

বান্দরবানে জেএসএস ও পিসিপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও হয়রানি বন্ধের দাবি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং ধর-পাকড় ও হয়রানি বন্ধের দাবিতে ১৭ নভেম্বর ২০১৭ শুক্রবার বান্দরবানে ও ঢাকায় যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর সংঘটিত এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাথে ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যাভাবে জড়িত করে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্যসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে মো: আবদুল আলীম নামে জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক বান্দরবান সদর থানায় এক চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করা হয়।

নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা,
ধর-পাকর ও হয়রানির প্রতিবাদে
বিক্ষোভ মিছিল
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
বান্দরবান জেলা শাখা।

বান্দরবান: ঐদিন সকাল ১১:০০ ঘটিকার সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির উদ্যোগে জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক নিত্যলাল চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমা, ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক অংশৈমং মারমা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াইচিং প্রু মারমা, পিসিপির বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক বামংসিং মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি একটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেই জনসংহতি সমিতি আজ অবধি গণতান্ত্রিক পন্থায় তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছে। গত ১৩ জুন ২০১৬ সালে বান্দরবান সদর উপজেলা জামছড়ি এলাকা হতে কে বা কারা, কোন সন্ত্রাসী নাকি ডাকাতি দল মংপু মারমা নামক এক ব্যক্তিকে অপহরণের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নেতৃস্থানীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে তল্লাশী, ধর-পাকড় ও হয়রানি চালানো হচ্ছে।

গত ১৬ নভেম্বরও রাজভিলা এলাকায় সংঘটিত একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গসংগঠনের অধিকাংশ নেতাকর্মীদের ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছে। যেখানে সামান্য ঘটনায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক চেয়ারম্যান, মৌজা হেডম্যানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে জড়ানো হয়েছে, যা ষড়যন্ত্রমূলক, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাই অবিলম্বে এ মামলা হতে জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের নাম প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান। আর না হলে আগামীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটি অবরোধ হরতালসহ কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন এবং কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হলে তার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে বলে মত প্রকাশ করেন।

ঢাকা: পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা কর্তৃক জেএসএস ও পিসিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার প্রতিবাদে এবং দ্রুত প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকার শাহবাগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরার সঞ্চালনায় এবং সহ-সভাপতি জ্ঞানজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির অর্থ সম্পাদক অমর শান্তি চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পিসিপির ঢাবি শাখার সদস্য জিনেট চাকমা, কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি সুপেন চাকমা এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রিবেং দেওয়ান প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্যে অমর শান্তি চাকমা বলেন, 'স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশে পাহাড়ি আদিবাসীরা যখন গণতান্ত্রিক পথে নিজেদের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, তখনই তারা অগণতান্ত্রিক পথে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর এখনও সেই একইভাবে জনসংহতি সমিতির নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই এই ধরনের মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে।'

অন্যদিকে পিসিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সিনিয়র সদস্য জিনেট

চাকমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪টি জুম্ম জনগোষ্ঠীকে তাদের স্বকীয় সত্তার মাধ্যমে বেঁচে থাকার এবং বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। হামলা, মামলা দিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না।'

বাংলাদেশের সমগ্র আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরে বাংলাদেশ আদবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিবেং দেওয়ান বলেন, বাংলাদেশের আদিবাসী সহ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরা আজ ভালো নেই। লংগদু, নাসিরনগর, রংপুরসহ সমগ্র দেশের আদিবাসী জনগণের উপরে নানা সহিংসতা চলমান।

পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সুপেন চাকমা বলেন, 'পাহাড়ের জুম্ম জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের একমাত্র সংগঠন জনসংহতি সমিতি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের চলমান আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যই যদি এ মামলা হয় তবে পাহাড়ে আগুন জ্বলবে'। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'শাসকগোষ্ঠী চুক্তি বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ঘোষণা না করলেও পাহাড়ের জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের রোডম্যাপ অবিলম্বে ঘোষণা করে রাজপথে নামবে।'

সবশেষে সমাবেশের সভাপতির বক্তব্যে পিসিপি'র ঢাকা মহানগরের সহ-সভাপতি জ্ঞানজ্যোতি চাকমা বান্দরবানের জনসংহতি সমিতি ও পিসিপি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। অন্যথায়, পাহাড়ের জনগণ ও নিউটনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তৃতীয় সূত্র মোতাবেক শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া জানাতে বাধ্য হবে বলেও মন্তব্য করেন।

ক্ষোভ আর অধিকতর আন্দোলনের অঙ্গীকারে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি পালিত

গত ২ ডিসেম্বর ২০১৭ দেশের ও পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায়ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে হতাশা, ক্ষোভ ও সরকারের প্রতি তীব্র সমালোচনা এবং চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে অধিকতর আন্দোলনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরসহ জেলার বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলী উপজেলায়ও গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে নানিয়ারচর ও কাউখালী উপজেলার জনগণ এবং দলের ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা রাঙ্গামাটি জেলা সদরের গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করেন।

সরকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা চুক্তি বিরোধী মহলই চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধিতা করে চলেছে- রাঙ্গামাটি গণসমাবেশে ঊষাতন তালুকদার

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ তম বর্ষপুর্তির ডাক
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করুন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ কর
২ ডিসেম্বর ২০১৭ শনিবার
গণসমাবেশ
প্রধান অতিথি : ঊষাতন তালুকদার
সভাপতি : সুবর্ণ চাকমা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি. রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি

রাঙ্গামাটি সদর : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঐদিন সকাল ১০:০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে রাঙ্গামাটিতে গণসমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুবর্ণ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি

সমিতির সহ-সভাপতি ও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সাংসদ ঊষাতন তালুকদার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসাইন কবীর, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অশোক সাহা, জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা প্রমুখ। জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল খীসার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলতে গিয়ে সরকার প্রায়ই পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফিরিস্তি তুলে ধরে আসছে। কিন্তু এই সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিয়ে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় আজ পার্বত্যবাসী শাসনতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলার ক্ষমতা ও কার্যাবলী এখনো আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে দেয়া হয়নি। পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপাররা সমতল অঞ্চলের মতো পার্বত্য জেলায় শাসনকার্য পরিচালনা করছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্যাঞ্চলের শাসনব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক। সরকার আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে অথর্ব করে রেখে উপনিবেশিক কায়দায় পার্বত্যাঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করছে।

পার্বত্য চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্যবাসীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সের জন্য এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্যাঞ্চলে যে হতাশা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে, তা অনুভব করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তবে কেবল অনুভব করলে হবে না, তার জন্য অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ দিতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পার্বত্যাঞ্চলে নিয়োজিত অনেক কর্মকর্তা পার্বত্য চুক্তি ও পাহাড়িদের বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে পোস্টিং দেয়ার আগে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ আইন, শাসনব্যবস্থা, পাহাড়িদের সংস্কৃতি বিষয়ে ধারণা দেয়া দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, সরকারের মধ্যে চুক্তি বিরোধী মহল লুকিয়ে আছে। তারাই চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে চলছে। শাসক মহলের সাথে যুক্ত জুম্ম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমও চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে বলে তিনি বলেন। তিনি বলেন, জুম্ম জনগণের সংগ্রাম বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে নয়। এই সংগ্রাম জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ, ভূমি ও সংস্কৃতির অধিকারের জন্য। জুম্মদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছনে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাই লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণ তথা চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য সমস্যার সমাধানে এখনো সময় আছে। তাই দ্রুততার সাথে সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে মিথ্যাচার করছে। চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্যবাসীর সাথে ১ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের সময় চুক্তি বাস্তবায়নের কথা বলতে গিয়ে কেবল উন্নয়নের কথাই তুলে ধরেছেন যা পার্বত্য চুক্তির মূল চেতনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার সামিল। প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। কিন্তু তার ভাষণে চুক্তির রাজনৈতিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের কথা বিন্দুমাত্র উচ্চারণ করেননি। জেনারেল জিয়াউর রহমান যেভাবে পার্বত্য সমস্যাকে একটি অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক সমাধানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান, শেখ হাসিনা সরকারও জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে উন্নয়নের জোয়ারে সমাধানের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন, যা তাঁর চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের স্পিরিট থেকে শেখ হাসিনা সরকারের সরে যাওয়ার ইঙ্গিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাঘাইছড়ি : বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ঐতিহাসিক ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি’র ২০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এর বাঘাইছড়ি থানা কমিটির উদ্যোগে এক বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল ১০:৪৫ ঘটিকায়। গণসমাবেশে বাঘাইছড়ি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী-পুরুষ, পেশা, বয়স নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন দাবি ও শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, ২০ বছরেও পার্বত্য চুক্তির অধিকাংশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবর্তে বস্তুত ক্ষোভ ও সরকারের প্রতি তীব্র সমালোচনার মধ্য দিয়ে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাঘাইছড়িতে পার্বত্য চুক্তির ২০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও বাঘাইছড়ি সদর ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সুনীল বিহারী চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি কিশোর কুমার চাকমা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য ও পিসিপির সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা, কাচালং ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান, বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুমিতা চাকমা,

যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির রাঙ্গামাটি শহর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুপিয়ন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য সান্তনা চাকমা প্রমুখ। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা এবং সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন দয়াসিন্ধু চাকমা।

গণসমাবেশে প্রধান অতিথি সজীব চাকমা বলেন, সরকারই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কারণে এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার কারণে জুম্ম জনগণকে আবার দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পার্বত্য পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলছে। ফলে জুম্ম জনগণের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে যে কোন সময় পার্বত্য অঞ্চলে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এর জন্য সরকারই দায়ী থাকবে।

তিনি বলেন, সরকারই জুম্ম জনগণের অধিকার, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে এবং বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। জুম্ম জনগণ জাতীয় সংহতি চাই বলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চায়। অথচ সরকার চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না করে, উল্টো নানাভাবে গড়িমসি, চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে নানা অপপ্রচার এবং চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী নানা কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণকে আবার দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে।

কাচালং ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান বলেন, নয় মাস যুদ্ধ করে যদি স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহলে বিশ বছরেও কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হবে না? সরকার যদি আন্তরিক হতো এই বিশ বছরে এ ধরনের চারটি চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারতো। তিনি আরও বলেন, এ পর্যন্ত জুম্ম জনগণ কত আশা নিয়ে ১৯৯১ সালে, ১৯৯৬ সালে, ২০০৮ সালে এই সরকারের নেতৃত্বাধীন দলকেই নিজের সবকিছু সঁপে দিয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে এই সরকারের কোন আন্তরিকতার লক্ষণ নেই। আর সরকারের মিষ্টি কথা শুনতে শুনতে সেই মিষ্টি কথায় জুম্ম জনগণের এখন বড্ড অরুচি সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ আর সরকারের মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করে না।

লংগদু : চুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লংগদু উপজেলা সদরে প্রথমে সকাল ১০:০০ টায় এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে সকাল ১০:৩০ টায় জনসংহতি সমিতির কার্যালয় প্রাঙ্গণে গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সভাপতি ত্রিলোচন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি জুয়েল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহন চান চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা, যুব সমিতির লংগদু থানা কমিটির সভাপতি তপন জ্যোতি চাকমা, পিসিপি'র লংগদু থানা সভাপতি দয়াল কান্তি চাকমা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিশংকর চাকমা।

গণসমাবেশের প্রধান অতিথি উদয়ন ত্রিপুরা বলেন, ২০ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর খাগড়াছড়িতে অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'এখন আর পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাহানি হবে না, আর অশান্তি থাকবে না, পাহাড়িরা জায়গা হারাবে না।' কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সেই কথার সাথে তাঁর বর্তমান বাস্তবতার মিল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, আজকে চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন সম্ভব হলেও দীর্ঘ বিশ বছরেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোন অগ্রগতি না হওয়ায়, বরং পরিস্থিতি দিন দিন অবনতিশীল হওয়ায় আগামী বছর চুক্তির বর্ষপূর্তি পালন সম্ভব হবে কিনা আশংকা রয়েছে।

পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জুয়েল চাকমা বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের নামে এবং জনস্বার্থে সড়ক নির্মাণের নামে যেসব কাজ করছে তাতে জনগণের উন্নতি না হয়ে বরং পার্বত্য চট্টগ্রামকে কারাগারে পরিণত করে চলেছে।

বরকল : সকাল ১০:০০ টায় বরকল সদর খেলার মাঠে প্রথমে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং গণসমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বরকল থানা কমিটির সভাপতি উৎপল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক গুণেন্দু বিকাশ চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য শ্যাম রতন চাকমা, সমিতির বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিধান চাকমা, ১নং সুবলং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরুণ জ্যোতি চাকমা, হেডম্যান এসোসিয়েশনের বরকল উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নীলাময় চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রিন্টু চাকমা, যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক বিনয় সাধন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বরকল থানা কমিটির সভাপতি শকুন্তলা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ও থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিনা চাকমা ও আইমাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অমর কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক পুলিন চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন সমিতির থানা কমিটির সদস্য জয়ধন চাকমা।

প্রধান অতিথি গুণেন্দু বিকাশ চাকমা বলেন, সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক নয়। আমরা সরকারকে বিশ্বাস করে চুক্তি করেছিলাম। কিন্তু সরকার কালক্ষেপণ করে চলেছে। তিনি বলেন, আমরা আর আশ্বাস শুনতে চাই না। আমরা বাস্তবায়ন চাই। তিনি

আরও বলেন, জনগণকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তারা আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই।

জুরাছড়ি : সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে জনগণ মিছিল নিয়ে উপজেলা শিশু পার্ক প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এর পর সকাল ৯:৪৫ টায় উক্ত শিশু পার্ক প্রাঙ্গণে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা কমিটির সভাপতি মায়াচান চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন একই কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত চাকমা। গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির আহ্বায়ক ভবদত্ত চাকমা, সমিতির জুরাছড়ি থানা কমিটির সহ-সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উদয়জয় চাকমা, সমিতির জেলা কমিটির ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক রনজিত দেওয়ান, যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, মহিলা সমিতির জুরাছড়ি উপজেলা কমিটির সভাপতি আল্পনা চাকমা, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সুরেশ কুমার চাকমা, ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যানন চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, ৩৯২নং ভালুক্যাছড়ি মৌজার প্রস্তাবিত হেডম্যান রিপন পাংখোয়া।

গণসমাবেশে প্রধান অতিথি ও জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা সকল স্তরের জনগণকে পার্বত্য অধিবাসীদের অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে অধিকতর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি সাম্প্রতিক কালে পার্বত্য অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর নিপীড়নের কথা তুলে ধরে বলেন, সেনাবাহিনী বিদেশের মাটিতে গিয়ে সুনাম অর্জন করেন, তাতে আমরা গর্ববোধ করি। কিন্তু এখানে পার্বত্য অঞ্চলে তারা কেন তল্লাসী, ধরপাকড় ও জনগণকে হয়রানি করবে? এখানে গুটি কয়েক কর্মকর্তার কারণে সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে কেন?

বিলাইছড়ি : সকাল ৯:০০ টায় উপজেলা সদরে প্রথমে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে সকাল ৯:৩০ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি শুভমঙ্গল চাকমার সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ধীর কুমার চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য কানন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা, সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা, যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সাগর ত্রিপুরা নান্টু, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা, যুব সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি সুনীল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি অরুণা দেবী চাকমা, ১নং বিলাইছড়ি ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি দেওয়ান, ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অমরজীব চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও সমিতির বিলাইছড়ি থানা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অমৃতসেন তঞ্চঙ্গ্যা।

গণসমাবেশের প্রধান অতিথি ধীর কুমার চাকমা সর্বস্তরের জনগণের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে অধিকতরভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি, সেনা ও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির কর্মীদের বাড়িতে তল্লাসী, ধরপাকড়, আটক এবং হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলায় জড়িত করার ঘটনার সমালোচনা করে অচিরেই তা বন্ধের আহ্বান জানান।

কাপ্তাই : উপজেলার বরইছড়ি সওজ কার্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১০:২০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই থানা কমিটির উদ্যোগে সমিতির থানা কমিটির সভাপতি বিক্রম মারমার সভাপতিত্বে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সৌখিন চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা কমিটির সদস্য নিকোলাই পাংখোয়া, হেডম্যান নেটওয়ার্ক এসোসিয়েশনের কাপ্তাই থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক থোয়াই অং মারমা, সমিতির থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যাসা অং মারমা, সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুইপ্রু মারমা, যুব সমিতির কাপ্তাই উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ধনঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক পুলক চাকমা, পিসিপির কাপ্তাই থানা কমিটির দপ্তর সম্পাদক হ্লাংলা মারমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির কর্ণফুলী ডিগ্রী কলেজ কমিটির সভাপতি অংচিংনু মারমা এবং সমাবেশ সঞ্চালনা করেন জনসংহতি সমিতির থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইমং মারমা।

সমাবেশে প্রধান অতিথি সৌখিন চাকমা বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তো করছেই না, উল্টো চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে বলে অভিযোগ করেন এবং বিশ বছরেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কারণে পার্বত্য পরিস্থিতি আবার পূর্বের মতই জটিল আকার ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করেন।

রাজস্থলী : সকাল ১০:৩০ টায় রাজস্থলী বাজার এলাকায় প্রথমে পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এরপর সকাল ১১:০০ টায় রাজস্থলী বাজার মাঠে এক গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা কমিটির সভাপতি পুলুখই মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সাথোয়াই প্রু মারমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থলী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ক্রয়সুই মারমা, জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য তাপস চাকমা, সমিতির খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সদস্য মনি রঞ্জন ত্রিপুরা, সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য পিপলস মারমা, পিসিপির রাজশাহী মহানগর কমিটির সভাপতি দীপেন চাকমা, পিসিপির রাজস্থলী উপজেলা কমিটির দপ্তর সম্পাদক ধনবান তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক ম্রানু মারমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির রাজস্থলী থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যা বাচ্চু এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা।

বান্দরবানে সেনা-পুলিশের বাধার মুখে জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চুক্তির ২০তম বছরপূর্তি পালিত

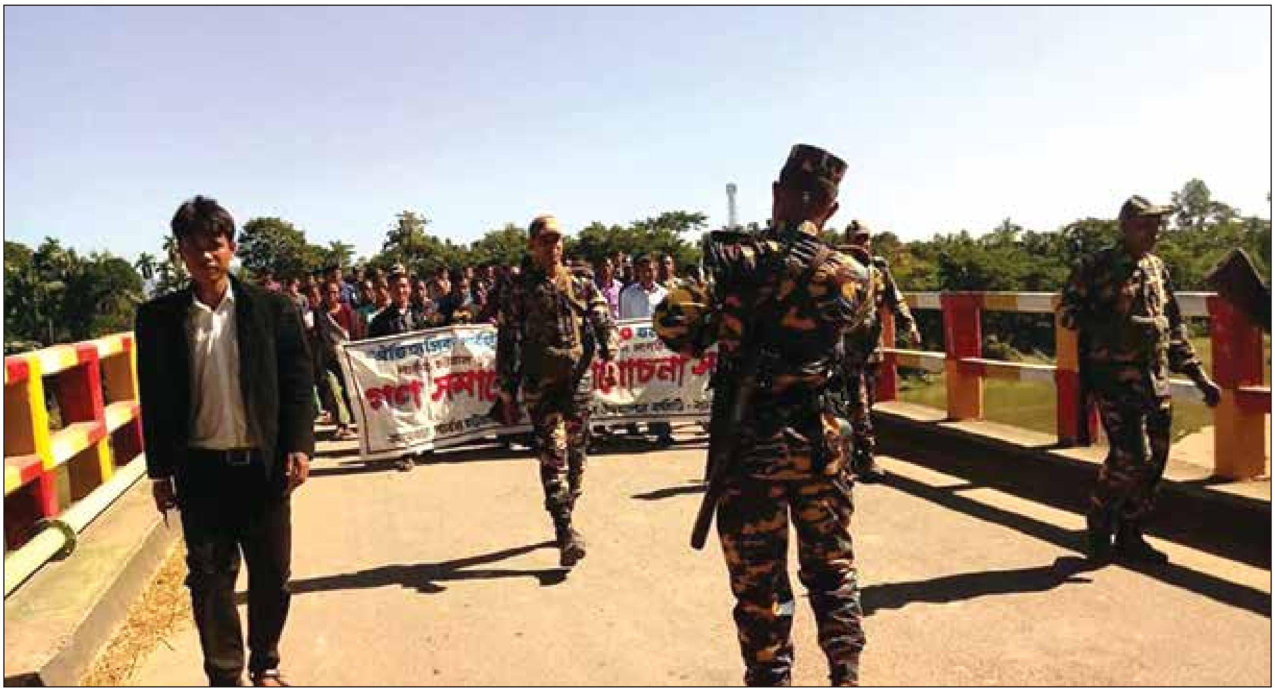

গত ২ ডিসেম্বর ২০১৭ রোজ শনিবার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০তম বছরপূর্তি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির উদ্যোগে বেলা ১.৩০ ঘটিকার সময় বিক্ষোভ মিছিল ও বেলা ২.০০ ঘটিকার সময় বান্দরবান পুরাতন রাজবাড়ি মাঠে গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

গণসমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে বান্দরবান-রাঙ্গামাটি সড়কের বালাঘাটা বাজারে, বান্দরবান-রোয়াংছড়ি ও বাঘমারা সড়কের হাংসামা পাড়া এবং বান্দরবান-রুমা ও থানছি সড়কের ফারুক পাড়া এলাকায় সেনাবাহিনী বান্দরবান সদর জোনের নেতৃত্বে নিরাপত্তার নামে তল্লাসী করে জনগণকে হয়রানি করে। পরে দুপুর ১২:০০ ঘটিকার সময় সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাজভিলা এলাকা হতে ২টি বাস বালাঘাটা বাজারে পৌঁছালে তল্লাসী শেষে ১টি গাড়ি ছেড়ে দেয় আর ১টি গাড়িতে থাকা লোকজনদের প্রথমে নাম, ঠিকানা, কি করে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। গণসমাবেশে যোগদান করতে আসছে জানালে সবার জাতীয় পরিচয়পত্র দিতে হবে বলে প্রায় দেড় ঘন্টা গাড়িটি আটকে রেখে হয়রানি করা হয়। এছাড়া একই সড়ক দিয়ে গণসমাবেশে যোগাদান করতে আসা ২৫-৩০টি গাড়ি নিরাপত্তার নামে তল্লাসী করে জনগণকে হয়রানি করে। অন্যদিকে বান্দরবান-রোয়াংছড়ি ও বাঘমারা সড়কে হাংসামা পাড়া এলাকায় গণসমাবেশে যোগদান করতে আসা ২৫টির অধিক গাড়িকে আটকে তল্লাসী করা হয়। একইভাবে বান্দরবান-রুমা ও থানছি সড়কের ফারুক পাড়া এলাকায়ও গাড়িগুলোতে একই কায়দায় তল্লাসী করা হয়। ফলে যথাসময়ে সমাবেশে যোগদান করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে জনগণ সমাবেশে আসতে দেখে বান্দরবান সদর থানা ওসি অফিসে এসে মিছিল করা যাবে না এবং সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না মর্মে জানান। কেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উপরের নির্দেশ বলে জানান। এরপর সামগ্রিক বিষয়ে জেলা প্রশাসককে জানালে তিনি পুলিশ সুপারের সাথে বিস্তারিত কথা বলতে অনুরোধ করেন। পুলিশ সুপারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি র‍্যালি করার অনুমতি দেন এবং প্রথমে র‍্যালিতে শ্লোগান দেওয়া যাবে না এবং পরে উগ্র শ্লোগান, সরকার বিরোধী ও সেনাবাহিনী বিরোধী শ্লোগান না দেওয়ার শর্তে র‍্যালি করার অনুমতি দেওয়া হয়। র‍্যালি শেষে বান্দরবান পুরাতন রাজবাড়ি মাঠে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি জননেতা উছোমং মারমার সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক উচসিং মারমার সঞ্চলনায় গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সম্মানিত সদস্য কে এস মং মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় ভূমি বিষয়ক সম্পাদক চিংহ্লামং চাক, ৪নং সুয়ালক ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ক্যহ্লাউ চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভানেত্রী ও বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ওয়াইচিং প্রু মারমা, উন্নয়ন কর্মী লেলুং খুমী, বান্দরবান জজকোর্টের এ্যাডভোকেট বাসিংথোয়াই মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অজিত তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন জনসংহতি সমিতির জেলা সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মংস্ত্ত মারমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এস মং মারমা বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি’ স্বাক্ষর করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সরকারকে একসাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে মিথ্যাচার করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দেওয়া মিথ্যা তথ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রচার করছেন। অথচ বীর বাহাদুর ৮ বছর আগেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৯৮ ভাগ চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে বলেছেন এবং ঢাকা শাক্যমুণি বৌদ্ধ বিহারের কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে এ সরকারের আমলে পার্বত্য চুক্তির ৮০ ভাগ বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে বলে বলেছেন।

কে এস মং মারমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি একটি বিপ্লবী সংগঠন। বিপ্লবী কর্মীদের মামলা, হামলা ও জেলবন্দী করে দমন করা সম্ভব নয়। কর্মীবাহিনীকে আরো বিপ্লবী চিন্তাধারা ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থি সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে হবে এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে বক্তারা আরো বলেন, সরকারের দাবি অনুসারে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। উন্নয়নের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ সংখ্যালঘু হয়ে প্রান্তিক অবস্থায় পতিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হলে এসব জাতিসমূহের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তাই পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে আরো বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

নাইক্ষ্যংছড়ি: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নাইক্ষ্যংছড়ি থানা কমিটির উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর ২০১৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। সকাল ১১.০০টা সময় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার হেডম্যান এসোসিয়েশনের গোলঘরে যুব সমিতির থানা কমিটির সভাপতি মংবাশৈ তঞ্চঙ্গ্যার উপস্থাপনায় জনসংহতি সমিতির থানা কমিটির সভাপতি মংমং মারমা সভাপতিত্বে আলোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির কৃষি ও ভূমি বিষয়ক সহ-সম্পাদক এবং থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মংনু মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন থানা কমিটি সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমেন তঞ্চঙ্গ্যা, বাইশারী ইউপি শাখার সভাপতি নিউহ্লামং মারমা, সোনাইছড়ি ইউপি কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জওয়ান মারমা, বাইশারী ইউপি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যচিংমং মারমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানা কমিটির সদস্য অংচিংহ্লা মারমা। আলোচনার সভায় বাইশারী, ঘুমধুম, সোনাইছড়ি, নাইক্ষ্যংছড়ি সদর এবং দোছড়ি ইউনিয়ন থেকে হতে কয়েক শত গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভা শেষে মিছিল করতে গেলে নাইক্ষ্যংছড়ি থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম শেখ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম সরওয়ার কামাল উপজেলার নিরাপত্তা এবং রোহিঙ্গাদের অবস্থান দোহাই দিয়ে মিছিল করতে বাধা প্রদান করেন। শ্লোগান সহকারে কোন মিছিল বের করা যাবে না বলে পুলিশ প্রশাসন থেকে নির্দেশ ছিল বলে গণসমাবেশের পর মিছিল বের করা হয়নি। ফলে কোন মিছিল ছাড়াই কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

লামা: জনসংহতি সমিতির লামা থানা কমিটির ভূমি সম্পাদক এছামং মারমার সভাপতিত্বে সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির লামা থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন আসাম। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির লামা থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক চম্পত ম্রো ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির লামা শাখার সভাপতি উসাংপ্রু মারমা। গণসমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে ও ভূমি বেদখল বন্ধ করতে হবে। লামায় ম্রো জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অব্যাহতভাবে ভূমি দখল করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি বলে স্বীকার করেছেন। ২০ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি, তাহলে আর কত বছরে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে- এই প্রশ্ন করেন বক্তারা। বক্তারা আরো বলেন, চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে রোডম্যাপ ঘোষণাপূর্বক পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান বক্তারা। গণসমাবেশে আসার সময় কোন বাধা প্রদান করা না হলেও মিছিল সহকারে লোকজন গণসমাবেশে যোগদানের সময় মিছিলের অভ্যন্তরে, আগে-পিছে সেনা সদস্যদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্লোগান সহকারে কোন মিছিল বের করা যাবে না বলে পুলিশ-সেনা প্রশাসন থেকে নির্দেশ ছিল বলে গণসমাবেশের পর মৌন মিছিল বের করা হয়নি।

আলিকদম : জনসংহতি সমিতির আলিকদম শাখার সভাপতি ও আলিকদম উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান কাইনথপ ম্রোর

সভাপতিত্বে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক য়ানঙান ম্রো। আরো বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির আদিকদম শাখার সাধারণ সম্পাদক চাথোয়াইমং মারমা এবং আদি ও স্থায়ী বাঙালি কল্যাণ পরিষদের আদিকদম শাখার সভাপতি কায়সার আহম্মেদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান। ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতেও তারা সরকারের কাছে দাবি জানান। রোডম্যাপ ঘোষণা পূর্বক চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার এগিয়ে না আসলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগুন জ্বলবে বলে বক্তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তার জন্য যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে বক্তারা জানান। শ্লোগান সহকারে কোন মিছিল বের করা যাবে না বলে স্থানীয় সেনা জোন ও পুলিশ প্রশাসন থেকে নির্দেশ ছিল বলে গণসমাবেশের পর মিছিল বের করা হয়নি।

থানচি : জনসংহতি সমিতির থানচি শাখার সভাপতি ও থানচি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান চসাথোয়াই মারমার সভাপতিত্বে সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলি মং মারমা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির থানচি শাখার সাধারণ সম্পাদক মেমং মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের থানচি শাখার সভাপতি থুইমংপ্রু মারমা, ব্রক্ষদত্ত কার্বারী, সমিতির থানচি শাখার সদস্য মংসাচিং মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বক্তারা তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। বক্তারা আরো বলেন, সরকার একদিকে চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না, অন্যদিক ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ, দমন-পীড়নসহ চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। চুক্তি লঙ্ঘন করে সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন। বক্তারা চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের মুখোমুখী হতে হবে বলে তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

শ্লোগান সহকারে কোন মিছিল বের করা যাবে না বলে পুলিশ প্রশাসন থেকে নির্দেশ ছিল বলে গণসমাবেশের পর মৌন মিছিল বের করা হয়।

রুমা: জনসংহতি সমিতির রুমা শাখার সভাপতি লুপ্রু মারমার সভাপতিত্বে সকাল ১০:৩০ টায় অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও রুমা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংথোয়াইচিং মারমা। জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য মংশৈপ্রু খিয়াং, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি রেমএময় বম বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। চুক্তি লঙ্ঘন করে সেনা সম্প্রসারণ, নামে-বেনামে ভূমি বেদখল করে জুম্মদের স্ব স্ব চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে চলেছে। রুমায় নির্বিচারে পাথর উত্তোলনে এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশের চরম ক্ষতি হয়ে চলেছে। ছড়া-ঝিরি বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বক্তারা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। শ্লোগান সহকারে কোন মিছিল বের করা যাবে না বলে পুলিশ প্রশাসন থেকে নির্দেশ ছিল বলে গণসমাবেশের পর মিছিল বের করা হয়নি।

রোয়াংছড়ি : জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি শাখার সভাপতি অংশৈমং মারমার সভাপতিত্বে সকাল ১০:৩০ টায় অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। গণসামবেশে বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি শাখার সহ সভাপতি ভারতসেন তঞ্চঙ্গ্যা, জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি শাখার সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল সেন তঞ্চঙ্গ্যা, জনসংহতি সমিতির সদস্য জুয়েল ত্রিপুরা প্রমুখ।

বিগত ২০ বছরেও চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। নানা অজুহাতে সেনাবাহিনী দমনপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি জানান বক্তারা। বক্তারা অভিযোগ করেন যে, জুম্মদের তাদের স্ব স্ব ভূমি থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ভূমি বেদখল চলছে। রোডম্যাপ ঘোষণাপূর্বক চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য বক্তারা সরকারকে আহ্বান জানান। অন্যথায় যে কোন পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে বক্তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

উল্লেখ্য যে, পুলিশ প্রশাসনের বাধার কারণে গণসমাবেশের পরে মিছিল বের করা সম্ভব হয়নি।

পাহাড়ে বাঙালি বসতি স্থাপন সরকারের একটি আত্মঘাতি কাজ- চট্টগ্রামে পার্বত্য চুক্তির দুই দশকপূর্তিতে আলোচনা সভায় আবুল মোমেন

পাহাড়ে বাঙালি বসতি স্থাপন রাষ্ট্রের একটি আত্মঘাতিমূলক কাজ। বাঙালি বসতি স্থাপন বন্ধ না করতে পারলে দেশ সংকটে পড়বে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যখন স্বাক্ষর হয় তখন আমরা স্বস্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় অনেক হতাশা রয়েছে। এই হতাশা খুব তাড়াতাড়ি সমাধান হবে বলে মনে করি না। সরকারে এখন অনেক জামাতের লোক ঢুকে যাচ্ছে। সরকার চুক্তির সময় যে কমিটমেন্ট দিয়েছে তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ২ ডিসেম্বর ২০১৭ নগরির মুসলিম হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের দাবিতে
গণসঙ্গীত ও সমাবেশ

বক্তব্যে এসব কথা বলেন আবুল মোমেন।

তিনি বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জনসংহতি ২০ বছর ধরে সংগ্রাম করছে। এখনও গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধারা বাস্তবায়ন না হওয়ায় চুক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ভূমি কমিশন কাজ করতে পারছে না। কমিশন বর্তমানে চেয়ারম্যানহীন। চুক্তি বাস্তবায়নে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের জোরালোভাবে এগিয়ে আসতে হবে উল্লেখ করে প্রধান অতিথি বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯০০ সালের শাসনবিধিতে সেই অঞ্চলে বহিরাগতদের বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। যদিও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে প্রচণ্ড রকম বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা আমাদের রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিল। স্বাধীন দেশে প্রথম সংবিধান রচনার সময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন 'আমি বাঙালি নই'। প্রধান অতিথি আবুল মোমেন আরো বলেন, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যদি দেখি- কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন থেকেই পাহাড়িদের দুর্ভোগ শুরু। দেখা যাচ্ছে উন্নয়নের সাথে বনাঞ্চল ও প্রকৃতির একটা সংঘাত হয়। ভারত এবং ব্রাজিলেও প্রকৃতি এবং আদিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সম্মানিত অতিথি ডা. একিউএম সিরাজুল ইসলাম বলেন, শুধু বাঙালিদের রক্তে দেশ স্বাধীন হয়নি। এই দেশের দাবিদার শুধু বাঙালিরা নয়, দেশের ১৬ কোটি মানুষ। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসিসহ সরকারের অনেক সফলতার জন্য ধন্যবাদ যেমন দিতে হয় তেমনি লংগদু নাসিরনগরসহ আদিবাসী জনগণের উপর নির্যাতনের জন্য নিন্দা জানাতে হয়। এ যেন মুদ্রার এপিট ওপিট। আমরা মুদ্রার উজ্জল দিকগুলো নিতে চাই। নিজের সমস্যা বলে ভাবতে না পারলে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আসুন পার্বত্য চুক্তির জন্য চট্টগ্রাম থেকে একটি জাতীয় ঐক্যের ডাক দিই। তিনি বলেন, সন্তু লারমা সংবাদ সম্মেলনে অযৌক্তিক কোন কিছু নেই। চুক্তি নিয়ে জাতীয় সংসদে আলাপ হোক। জাতীয়ভাবে আলাপ হোক। পাহাড়ের সমস্যা সমাধান করতে না পারলে দেশ আবারও বড় বিপদে পড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জনসংহতি সমিতির যুব বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা বলেন, পাহাড়ে বাসযোগ্য ভূমি নেই। ভূমি নেই বিধায় কাপ্তাই বাঁধে উদ্বাস্তুরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে যারা এখনও নাগরিকত্ব পায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। জাতীয়ভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সকল মানুষের অধিকারের জন্য কথা বলেছেন। মেহনতি মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন। আমরা নিজেদের পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাই, বাঙালি হিসেবে নয়। তার মানে আমরা বাঙালি বিদ্বেষী তা ভাবা ঠিক হবে না। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকেই আপনারা এসেছেন। আসুন আমরা সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করি। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন।

চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক তাপস হোড় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রামের পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি একিউএম সিরাজুল ইসলাম, নারী নেত্রী নূরজাহান খান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের শরৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নিতাই প্রসাদ ঘোষ, সাংবাদিক ও কবি হাফিজ রশিদ খান, ঐক্য ন্যাপের চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট এ এম মোয়াজ্জেম হোসেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক ঝুলন ধর, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চট্টগ্রামের সভাপতি আলী নেওয়াজ,

নারী নেত্রী বিজয় লক্ষ্মী দেবী, পাহাড়ী ভট্টাচার্য, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মিন্টু চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পাহাড়ে চুক্তির পরবর্তীতে সেখানে যে সংঘাত তা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নয়, সরকারের পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। আদিবাসীদের বিভক্ত করে তাদের ভূমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে। ভূমি হারানো মানে বিলুপ্ত হওয়া। সরকার কি চায় এই দেশ থেকে আদিবাসীরা হারিয়ে যাক? চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে বাস্তবায়নে কেন এত দ্বিধাসংশয়? পাহাড়ে বিশ্ববিদ্যালয় হোক মেডিকেল কলেজ হোক তা পরামর্শ করে করলে বাধা কোথায়? তারা বলেন, একটি অংশকে বাদ দিয়ে দেশে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই সংবিধান অনুযায়ী মানুষের যে মৌলিক অধিকার তা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

রাইখালীতে আ:লীগ-ছাত্রলীগ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির দুইজন সদস্যকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগদের দুর্বৃত্ত কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির দুইজন সদস্যকে বেদম মারধরের ঘটনায় জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই থানা কমিটি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন রাইখালী ইউনিয়নের ডংনালা গ্রাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য উষামং মারমাকে (৩৮) তাঁর বাড়ি থেকে স্থানীয় ছাত্রলীগের সভাপতি শাহাবুদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মিজানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে যায়।

দুর্বৃত্তরা অমানুষিকভাবে মারধর করতে করতে উষামংকে কাপ্তাই উপজেলাধীন কোদালা গ্রামের দিকে ধরে নিয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এদিকে দুপুর ১:০০ টার দিকে এলাকাবাসী কোদালা গ্রাম থেকে সারা শরীরে মারাত্মক জখম অবস্থায় অপহৃত উষামং মারমাকে উদ্ধার করে। এরপর তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় চন্দ্রঘোনা মিশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে ঐদিন দুপুর ১২:৩০ টার দিকে জনসংহতি সমিতির রাইখালি ইউনিয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কংহ্লাঅং মারমা (৪০) রাইখালি বাজারে গেলে ছাত্রলীগ-আওয়ামীলীগের একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে বেদম মারধর করে।

স্থানীয় জনগণ কংহ্লাঅং মারমাকে উদ্ধার করে বরইছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ক্যহ্লাঅং মারমার কোন উস্কানী ছাড়াই জনসংহতি সমিতির সদস্যদের উপর এহেন কাপুরুষোচিত হামলা ও মারধরের ঘটনায় জড়িত আওয়ামীলীগ-ছাত্রলীগের সদস্যদের অচিরেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই থানা কমিটি জোর দাবি জানিয়েছে।

‘রাঙ্গামাটিতে অভিযানের নামে নিরীহ মানুষের হয়রানি কাম্য নয়’

– পাহাড়ি শ্রমিক সমাবেশে ঊষাতন তালুকদার

সংগ্রামের ১৩ বছর
আসুন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অধিকতর আন্দোলন গড়ে তুলি
র‍্যালি-সমাবেশ-কাউন্সিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সফল হোক
১৫ ডিসেম্বর ২০১৭
পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম, চট্টগ্রাম

রাঙ্গামাটিতে অভিযানের নামে নিরাপত্তাবাহিনী দ্বারা নিরীহ মানুষের হয়রানি কাম্য নয়। প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়ুক তা সবাই চায়। কিন্তু অভিযানের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করলে পারস্পরিক দূরত্ব বাড়বে। এতে করে সমস্যার কোন সমাধান হবে না বলে মন্তব্য করেছেন রাঙ্গামাটির সাংসদ ঊষাতন তালুকদার।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বেলুন উড়িয়ে ফোরামের অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। ‘শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম জোরদার করি, পার্বত্য

চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অধিকতর আন্দোলন গড়ে তুলি’ শ্লোগানকে নিয়ে ফোরামের ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যারিস্টার কলেজ মাঠে সমাবেশ, কাউন্সিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেলা ২:৩০ ঘটিকায় একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ব্যারিস্টার কলেজ মাঠ থেকে ইপিজেড মোড় ঘুরে আবার ব্যারিস্টার কলেজ মাঠে এসে শেষ হয়। সুমন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রামের সমন্বয়কারী শরৎ জ্যোতি চাকমা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় কমিটির সদস্য এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, লেখক আমান মাসুদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা, চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি বাবলু চাকমা, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের অনিল বিকাশ চাকমা, দিশান তনচংগ্যা, রিটেন চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, দেশের সংবিধান ও সার্বভৌমত্বকে মেনেই চুক্তি করা হয়েছে। সরকার চুক্তির ৪৮টি ধারা বাস্তবায়নের কথা বলে থাকেন। এটা চুক্তি নিয়ে শুভংকরের ফাঁকি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ধরি ৫০টি ধারাও বাস্তবায়িত হলো কিন্তু আসল ধারাগুলো বাস্তবায়ন করছেন না। চুক্তিতে পাহাড়িদের শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্বের বিধান রাখা হয়েছে, দিয়েছেন কি? আমরা তো শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব চাই। কিন্তু তা না করে বারে বারে আমাদেরকে দূরে রাখছেন। আপনারা কি জানেন আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদকে তোয়াক্কা না করে ডিসি (ডেপটি কমিশনার) এবং এসপি’র অঙ্গুলি হেলনে পাহাড়ে প্রশাসন চলে? তাহলে চুক্তিতে বিশেষ শাসনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কেন? তিনি বলেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপদ জায়গা হচ্ছে না। ভূমি বেদখল, মন্দির ভাংচুর, ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে। সবাই চুপ! দেখার মত কেউ নেই। রাঙ্গামাটির সাংসদ আদিবাসী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্মসংস্থানের অধিকার, মজুরির অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিয়ে স্বাধীন দেশে বেঁচে থাকার অধিকার সকলের রয়েছে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের জন্য সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন। সংগঠন করে দিয়েছেন। এই সংগঠনে থেকে অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

সমাবেশে প্রধান বক্তা শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, জনসংহতি সমিতি আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষের নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করছে। জনসংহতি সমিতি বিরোধী অপশক্তি ও দলচ্যুত অংশের কথায় কান না দিয়ে সন্তু লারমা ও ঊষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির যে সংগ্রাম তাতে আপনারা সামিল হবেন। তিনি বলেন, চুক্তি বিরোধী ও তথাকথিত সংস্কারের নামে যারা দলচ্যুত হয়, উপদল গঠন করে তা ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই না। এই ভণ্ডদের কথায় বিভ্রান্ত হবেননা। জনসংহতি সমিতির নীতি আদর্শ সঠিক বিধায় ’৭২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত লড়াই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। লেখক আমান মাসুদ বলেন, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সমতলে আওয়ামীলীগ এবং পাহাড়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। পাহাড়ে জেএসএস ব্যতীত কেউ পাহাড়িদের নিরাপত্তা দিতে পারবে না।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনসংহতি সমিতির পতাকা তলে সামিল হয়ে অধিকতর আন্দোলনে শামিল হতে যুব সমাজের প্রতি আহবান জানান।

সমাবেশ শেষে কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে সুমন চাকমাকে সভাপতি, দিশান তনচঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ণ বিকাশ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রামের সমন্বয়কারী শরৎ জ্যোতি চাকমা।

রাঙ্গামাটি জেলা আ:লীগের উস্কানীমূলক পোস্টার প্রকাশে জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ

গত ৭ জানুয়ারি ২০১৮ জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত ‘জেএসএস সন্ত্রাসীদের এ কেমন নৃশংসতা!!’ শিরোনামে পোস্টার প্রকাশের ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। উক্ত পোস্টারে গত ৫ ডিসেম্বর বিলাইছড়িতে ‘রাসেল মারমাকে পাশবিক ও নিষ্ঠুর নির্যাতন’ ও জুরাছড়িতে ‘অরবিন্দু চাকমাকে খুন’ এবং ৬ ডিসেম্বর ‘ঝর্ণা চাকমাকে পাশবিক হামলার’ ঘটনায় জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করা হয়। ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অভিযোগ এনে জনমতকে বিভ্রান্ত ও জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগ কর্তৃক এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক পোস্টার প্রচার ও প্রকাশ করেছে বলে জনসংহতি সমিতি অভিযোগ করে।

বস্তুত রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নির্লজ্জ অপব্যবহার, চরম দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজি, দলীয় কোন্দল, দলাদলি ও হানাহানি, জঘন্য দলীয়করণ ইত্যাদির ফলে জেলা আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের উপর রাঙ্গামাটি জেলা তথা পার্বত্যবাসী যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও অতিষ্ঠ। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর দীর্ঘ ১২ বছরব্যাপী বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও চুক্তি বাস্তবায়নে নির্লজ্জ গড়িমসি এবং রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকার ফলে অনেক আগে থেকেই পার্বত্যবাসী জেলা আওয়ামীলীগ নেতৃত্বকে পরিত্যাজ্য করেছে। জেলা আওয়ামীলীগের এই ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতে ও জনমতকে বিভ্রান্ত করতেই সম্প্রতি আওয়ামীলীগ কর্মীদের উপর কে বা কারা হামলা করেছে কিংবা কি কারণে হামলা করা হয়েছে তার কোন যথাযথ তদন্ত এবং তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই এসব ঘটনা ঘটতে না ঘটতেই রাঙ্গামাটি জেলা

আওয়ামীলীগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে আসছে। এসব ঘটনাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে হয়রানি ও নাজেহাল করা, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীনউদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগ জনসংহতি সমিতির সদস্য ও নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে চলেছে এবং জেলা আওয়ামীলীগের যোগসাজশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক অন্তত ২৫ জন নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে; আরো ২৬ জনকে সাময়িক আটক করে নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে সর্বশেষ এ ধরনের মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অভিযোগ এনে পোস্টার ছাপিয়ে অপপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছে, যা রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক অবিমৃষ্যকারিতা ও সাংগঠনিক দেউলিয়াপনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জুম্ম জনগণ তথা স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকারকামী একটি রাজনৈতিক দল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে লিপ্ত রয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের ভুলে গেলে চলবে না যে, পূর্বে জনসংহতি সমিতিকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ‘অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী’ হিসেবে অপবাদ দিয়ে কেউ তাদের ষড়যন্ত্রমূলক নীল-নক্সা সফল করতে পারেনি। বরঞ্চ জনসংহতি সমিতি বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রতিনিধিত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এ ধরনের অবিমৃষ্যকারী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য এবং রাজনৈতিক হীনউদ্দেশ্যে প্রকাশিত এই ষড়যন্ত্রমূলক পোস্টার প্রত্যাহার করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগকে আহ্বান জানিয়েছে।

বাঘাইছড়ির শিজক কলেজে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৩য় বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ১১ ঘটিকায় বাঘাইছড়ির শিজক কলেজ প্রাঙ্গণে হিল উইমেন্স ফেডারেশন শিজক কলেজ শাখার তৃতীয় বার্ষিক শাখার সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। শিজক কলেজ শাখার সভাপতি মুক্তিসোনা চাকমার সভাপতিত্বে ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমার সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি থানা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক বুদ্ধাঙ্কুর চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি লক্ষ্মীমালা চাকমা, বাঘাইছড়ি থানা শাখা যুব সমিতির সভাপতি শান্তি মোহন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সভাপতি মনিরা ত্রিপুরা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক পলাশ চাকমা, পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি লিসিয়েন চাকমা প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, নারী সমাজ রাজনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই নারী সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে সাংগঠনিকভাবে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে নারী সমাজে আরো অধিকতর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কল্পনা চাকমার মতো আরও শত শত জুম্ম নারীকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জাগাতে হবে।

আলোচনা সভা শেষে মুক্তিসোনা চাকমাকে সভাপতি, শুভাসী চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ফেন্সী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশন শিজক কলেজ কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক শান্তি দেবী তনচঙ্গ্যা।

দীপংকর তালুকদারের বক্তব্যের প্রতিবাদ উষাতন তালুকদার এমপির

গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৮, রাঙামাটিতে সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তাকে জড়িয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের অফিসে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি দীপঙ্কর তালুকদারের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার।

রাঙামাটির সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদারকে ইঙ্গিত করে দীপংকর তালুকদার অভিযোগ করেন, ‘আজকেই (রোববার) সকাল ১০ টায় একটি সরকারি অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী ঠিকাদারদের সাথে সভা করেছেন এবং একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে শতকরা পাঁচভাগ চাঁদা হিসেবে দিতে হবে এবং টাকাগুলো ওই নির্বাহী প্রকৌশলীকে জমা দিতে হবে বলে ঠিকাদারদের জানিয়েছেন’ *(এনটিভিবিডি.কম, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮)।*

এই বক্তব্যে প্রতিবাদ জানিয়ে রাঙামাটির সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার এমপি আইপিনিউজবিডিকে বলেছেন, একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও সাবেক সাংসদের কাছে মানুষ এধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে না। তিনি বলেন, আমি কার কাছে কখন টাকা চেয়েছি সেটি প্রমাণ দিতে হবে, না হলে আমি মানহানির মামলা করতে পারি। তিনি বলেন, আমি এলাকার সংসদ সদস্য হিসেবে এলজিইডির কাজের অগ্রগতি দেখতে অফিসে গিয়েছিলাম, তাদের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায় আমি উপস্থিত ঠিকাদারদের দ্রুত কাজ সম্পাদন করার নির্দেশ দেই।

উষাতন তালুকদার এমপি আরো বলেন, ২০১৪ সনের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর দীপংকর তালুকদার তাকে নানাভাবে আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়ে আসছেন যা কোন গণতান্ত্রিক আচরণের মধ্যে পড়ে না। আমাদের সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমি নির্বাচিত সাংসদ, আমি জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ থেকে কোন সহযোগিতা পাই না অথচ দীপংকর বাবু এমপি না হয়েও সরকারি গাড়ি ব্যবহার, সরকারি উন্নয়ন কাজে নিজের নামফলক ব্যবহার করে উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করে চলেছেন। এটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সরাসরি অপব্যবহার ও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্য দীপংকর তালুকদারকে আহ্বান জানান ঊষাতন তালুকদার।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাবিতে পিসিপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা
বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ
আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতা বন্ধ কর

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে ফারুয়া সেনা ক্যাম্পের জনৈক সেনাসদস্য কর্তৃক এক মারমা যুবতীকে নিজ বাড়িতে জোরপূর্বক ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষক সেনাসদস্যের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ বিকাল ৩ ঘটিকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে কলাভবন প্রদক্ষিণ করে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বর ঘুরে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যে এসে শেষ হয়। পিসিপি ঢাবি শাখার সভাপতি অমর শান্তি চাকমার সভাপতিত্বে সিনিয়র সদস্য সতেজ চাকমার সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক লিটন চাকমা, ঢাবির সাধারণ শিক্ষার্থী সরল তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি ঢাবি শাখার সিনিয়র সদস্য জিনেট চাকমা। এছাড়া সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের (বিএমএসসি) ঢাকা মহানগর শাখার

তথ্য ও প্রচার সম্পাদক উক্যনু মারমা, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম (টিএসএফ) এর ঢাকা মহানগর শাখার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হ্লাচন্দ্র ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য রুনি চাকমা, বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থী অংশৈচিং মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিবেং দেওয়ান, পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সদস্য ব্যবিলন চাকমা এবং পিসিপি কেন্দ্রীয় সদস্য নিপন ত্রিপুরা।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারপরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সেনাবাহিনী অপসারণ করা হয়নি উপরন্তু পাহাড়ে জারি করে রাখা হয়েছে অঘোষিত সেনাশাসন। ফলে সেনাবাহিনী কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় লাইসেন্স নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নানা সহিংসতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

বক্তারা আরো অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এর আগেও বিভিন্ন সময়ে সেনা-সেটেলার কর্তৃক নানা সহিংসতার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এসবের যথাযথ বিচার না হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের এ বিচারহীনতার সংস্কৃতির বেড়াজালে বন্দী হয়ে সেনাসদস্য কর্তৃক অবাধে এ ধরনের ধর্ষণের মত নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তাই বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন তথা ধর্ষক সেনাসদস্যের যথাযথ বিচার দাবি করেন। অন্যথায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আবারো পূর্বের অস্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে গেলে সরকারকে এ দায় নিতে হবে বলে হুঁশিয়ার করেন।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক মারমা কিশোরীকে ধর্ষণ করার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে পিসিপির বিক্ষোভ সমাবেশ

মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ
স্থান: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, চট্টগ্রাম
আহ্বানে: বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল
বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ

রাঙামাটি'র বিলাইছড়ি উপজেলায় সেনাসদস্য কর্তৃক এক মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ও ধর্ষকের যথাপোযুক্ত শাস্তির দাবিতে গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৮ বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমার সঞ্চালনায় ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি বাবলু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্কুল ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক শ্রাবণ চাকমা। এছাড়াও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল চট্টগ্রাম মহানগর শাখার তথ্য প্রচার সম্পাদক মংসানু মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ইউএসটিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক মংলাই মারমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সহ-সভাপতি সৌরভ সাহা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফখরুল, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ চাকমা, বিএমএসসি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি মংক্যথোয়াই মারমা, বাংলাদেশ ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি বাহার উদ্দিন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিন্টু চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পাহাড়ে এখনও সেনাবাহিনীর পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ মদদে গুম হয়, আগুন জ্বলে। যারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব

রক্ষার্থে কাজ করে যাচ্ছেন তারাই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের উপর তথা আদিবাসী নারীদের উপর যখন ইচ্ছে তখন, যাকে ইচ্ছে তাকে অত্যাচার ও ধর্ষণ করে যাচ্ছে। বক্তারা বলেন, বিগত দিনেও পাহাড়ে সেনাবাহিনী ও সেটেলার কর্তৃক অসংখ্য পাহাড়ি নারীকে হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়েছে। এমন কি ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেও পাহাড়িদের উপর অত্যাচার আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের লেলিয়ে দিয়ে ধর্ষণের পর ধর্ষণ, হত্যার পর হত্যা করা অব্যাহত থাকলে তার ফল সুফল হবে না বলে বক্তারা জানান। ধর্ষকদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে অতি শীঘ্রই আরও বৃহত্তর কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারি দেন। সেই সাথে পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বক্তারা সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান এবং পাহাড়িদেরকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বানিয়ে সরকার যেভাবে শাসন পরিচালনা করছে সেই মন মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি বক্তারা আহ্বান জানান।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিসিপি'র বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে মারমা
কিশোরী ধর্ষণের প্রতিবাদ ও যথাযথ বিচারের দাবিতে
বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ
তাং: ২৪-০১-২০১৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সেনাশাসন বন্ধ কর
PCP

গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ১০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদ ও যথাযথ বিচারের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী মহানগরের উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

উক্ত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অরুণ বিকাশ চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক দীপন চাকমা, স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাজশাহী মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল চাকমা। এছাড়াও সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাকিল হাসান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আল আমীন প্রধান বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি মনির এবং আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি নকূল পাহান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

সমাবেশে অভিযুক্ত সেনা সদস্যকে গ্রেপ্তার করে যথাযথ শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়। এছাড়া বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অপারেশন উত্তরণ নামে বলবৎ সেনাশাসন প্রত্যাহারের দাবি জানান।

টিটিসিতে পিসিপির নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জানুয়ারী ২০১৮ 'নবীন প্রবীণের ঐক্যের বন্ধনে সুদৃঢ় হোক মোদের শিক্ষাজীবন, সুন্দর আগামী গড়ব এই আমাদের পণ'– এই শ্লোগানকে সামনে রেখে টিটিসি মাঠ প্রাঙ্গণে রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি টিটিসি শাখার সভাপতি দীপায়ন চাকমার সভাপতিত্বে এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক অতুল বরণ চাকমার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২৯৯ নং রাঙ্গামাটি পার্বত্য আসনের সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ সালাউদ্দিন শেখ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন মারমা ও রাঙ্গামাটি জেলা শাখার

নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায়-২০১৮
প্রধান অতিথিঃ শ্রী উষাতন তালুকদার
দীপায়ন চাকমা
স্থানঃ টিটিসি মাঠ প্রাঙ্গন, রাঙ্গামাটি।
তারিখঃ ২৭ জানুয়ারী ২০১৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি টিটিসি শাখা।

সভাপতি রিন্টু চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শান্তনা চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উষাতন তালুকদার বলেন, গুটিকয়েক মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আজ পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই পাহাড়কে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র চলছে তা আমাদের বুঝতে হবে এবং সবাইকে সচেতন হতে হবে। তিনি আরো বলেন, এখন প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই দেখা যায় ধর্ষণের খবর এবং কিছু দিন আগে বিলাইছড়িতে দুই বোনকে ধর্ষণ ও শ্লীনতাহানি করা হয়েছে। এই ধর্ষণের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে ও ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে প্রশাসন গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এই সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়ানোর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সর্বশেষে শিক্ষকদেরকে সুস্থভাবে পাঠদান করার অনুরোধ জানিয়ে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান এবং টিটিসির সকল ছাত্রছাত্রী যেন নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকেন এবং প্রত্যেক শিক্ষক যেন সুষ্ঠুভাবে পাঠদান করেন বক্তারা তার অনুরোধ জানান। পরিশেষে বিকাল বেলা ৪:০০ টায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক মারমা কিশোরী ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বান্দরবানে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

২২ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি বিলাইছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক দুই মারমা কিশোরী ধর্ষণের
প্রতিবাদে ও দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবিতে-
মানববন্ধন
তারিখঃ ২৮ জানুয়ারি
আয়োজনঃ সম্মিলিত আদিবাসী

বিলাইছড়িতে সেনাসদস্য কর্তৃক মারমা কিশোরী ধর্ষণের প্রতিবাদে সম্মিলিত আদিবাসী ছাত্র সমাজের উদ্যোগে গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ১০ ঘটিকায় বান্দরবান শহরের পুরাতন রাজবাড়ি মাঠে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনের পূর্বে সংগঠনের নেতা কর্মীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। মানববন্ধন শেষে এক সভায় বক্তব্য রাখেন থোয়াই অংগ্য চাক, সঞ্চিতা চাকমা, অনিক তঞ্চঙ্গ্যা, বা মং মারমা প্রমুখ। বক্তারা বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক মারমা কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান।

যুব সমিতি রাঙ্গামাটি শহর শাখার ৪র্থ বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

বিনয় বরণ চাকমাকে সভাপতি, রিতেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, সুমন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিহত করুন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকতর আন্দোলন জোরদার করুন
৪র্থ বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০১৮
প্রধান অতিথি: শ্রী পদ্মলোচন চাকমা
সভাপতি: শ্রী মিঠু চাকমা বাবু
তারিখ: ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ ইং
পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি শহর শাখা

গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ বিকাল ২:০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি শহর শাখার ৪র্থ বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। 'পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিহত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকতর আন্দোলন জোরদার করুন।' এ শ্লোগানের মধ্য দিয়ে যুব সমিতি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি মিঠু চাকমার সভাপতিত্বে ও রিতেশ চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি সদর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ্মলোচন চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি শহর কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তিমুকুল চাকমা, যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি টোয়েন চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান পলাশ কুসুম চাকমা, যুব সমিতি রাঙ্গামাটি সদর থানা শাখার সভাপতি দেবমোহন চাকমা প্রমুখ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির সহ-সভাপতি উত্তম আসাম।

আলোচনা সভা শেষে বিনয় বরণ চাকমাকে সভাপতি, রিতেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুমন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি শহর শাখা কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা।

সম্মেলন সভায় বক্তারা বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে আরো অধিকতর লড়াই সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে পাহাড়ি যুব সমাজ নিজেদের জন্মভূমি ও অস্তিত্ব রক্ষায় ন্যায়ভিত্তিক এ লড়াই সংগ্রামকে আদর্শিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাগিদ দেয়া হয়।

বক্তারা আরো বলেন, যুগ যুগ ধরে সেনা শাসনে কবলিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পরিণত করা হয়েছে। পার্বত্য

চট্টগ্রাম বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক এবং সামরিকীকায়নের মাধ্যমে ইসলামীকরণের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি জবরদখল, পাহাড়ি নারীর উপর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানীসহ যৌন নিপীড়ন, সেনা দ্বারা অপহরণের মত কাপুরুষোচিত ন্যাক্কারজনক ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সঠিক বিচার না হওয়ায় এ ধরনের ঘটনার প্রবণতা বাড়ছে। অন্যদিকে পাহাড়ে জুম্ম জনগণ নিজেদের আত্নপরিচয়ের সাথে বেঁচে থাকার নিমিত্তে যে লড়াই সংগ্রাম তার বিপরীতে জুম্ম সমাজের মধ্যে কতিপয় জুম্ম সুবিধাবাদী দালাল, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ ও মোকাবেলা, সামাজিকভাবে বয়কট করার আহবান জানানো হয়।

রুমায় পিসিপি ও যুব সমিতির কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

কাউন্সিল ও সম্মেলন-২০১৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি,
পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও
১৪তম কা
প্রধান অতিথি
সভাপতি

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিহত করুন' এ আহ্বানের মধ্য দিয়ে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ সকাল ১০ ঘটিকায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৪তম এবং যুব সমিতি রুমা থানা শাখার যৌথ কাউন্সিল ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলার সহ-সভাপতি ও রুমা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অংথোয়াইচিং মারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও রোয়াংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি মংস্ত মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক চঞ্চনা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি অজিত তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। পিসিপি রুমা থানা শাখার সভাপতি মংমিন মারমার সভাপতিত্বে ও জনি লুসাই এর সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি রুমা থানা শাখার সহ-সভাপতি থুইনুমং মারমা।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ১৯৬০ সালের আগে এবং পরে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করার ষড়যন্ত্র করেছিল যা ছাত্র ও যুব সমাজ মেনে নিতে পারেনি। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে ৪ মে লংগদু গণহত্যা সংঘটিত হলে প্রগতিশীল জুম্ম ছাত্র সমাজ এ গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গঠন করে আন্দোলন গড়ে তুলে। বর্তমানে সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্র একই উগ্র মৌলবাদী মতাদর্শ ধারণ করে জুম্মদের নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র করছে। তাই জুম্ম স্বার্থ বিরোধীদের প্রতিহত করে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে আরো বেশি আন্দোলন বেগবান করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যে কোন বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং যে কোন কঠিন পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে ছাত্র ও যুব সমাজকে আরো সচেতন থাকতে হবে।

আলোচনা শেষে থুইনুমং মারমাকে সভাপতি, উসাচিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ভানলিম বমকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি রুমা থানা কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি জেলা শাখার সহ-সভাপতি পাসেন বম।

এদিকে লালদনলিয়ান বম (তুলুং)-কে সভাপতি, জনি লুসাইকে সাধারণ সম্পাদক ও উখ্যাইমং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট যুব সমিতি রুমা থানা কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত যুব সমিতির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান যুব সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি মস্তু মারমা।

পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহবান

কর্মী সম্মেলন
১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ শুক্রবা
কল্যাণ ফোরাম

‘শ্রমজীবী মানুষের অধিকার চাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চাই’ শ্লোগানকে সামনে রেখে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ চট্টগ্রাম নগরীর আরবান সেন্টার হলে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুমন চাকমার সভাপতিত্বে কর্মী সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, সমিতির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়কারী শরৎ জ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের কক্সবাজার জেলা সভাপতি থোইঅং রাখাইন বুবু। সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু চাকমা, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সুকাম দেওয়ান, অনিল বিকাশ চাকমা, সোনাবি চাকমা, নিকেল চাকমা, জেকশন চাকমা, জগৎ জ্যোতি চাকমা, বাবু চাকমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। উক্ত সম্মেলনে মহিলা ফোরামসহ চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা, পতেঙ্গা, পাহাড়তলি ডবলমুরিং, চান্দঁগাও, কাঠগড়, মোট ১২টি কমিটি থেকে দুই শতাধিক কর্মী অংশ নেন। পর্যবেক্ষক হিসেবে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মী সম্মেলনের অতিথি শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি একটি মানবতাবাদী সংগঠন। মানবতাই এই পার্টির আদর্শ। তাই জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে মানবতা এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চলমান রয়েছে। এই সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণি মানুষকে অধিকতর সাহসের সাথে সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, রাষ্ট্র আজ উগ্র জাতীয়তাবাদের দিকে হাঁটছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা পায় না। আমরা জুম্ম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি কারণ এতে জুম অঞ্চলের সকল মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া আছে। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিশেষ জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ তো এক জাতি রাষ্ট্র নয়। বহু জাতির এবং বহু ভাষার দেশ। তাই দেশের সকল মানুষের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষে আমাদের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পন্ন মানুষের সমাবেশ ঘটাতে হবে। এই ক্ষেত্রে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সম্মেলনের বিশেষ বক্তা সজীব চাকমা বলেন, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পন্ন নেতৃত্ব দ্বারা দেশ পরিচালিত না হলে সমাজের বা দেশের বঞ্চিত অংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়না। এখানে জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ থাকে, থাকে ধর্মীয় নিপীড়ন যা আমরা দেশের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় আমরা যারা জাতিগত সংখ্যালঘু ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে না পারলে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। একটা সময় আসবে অস্তিত্বও থাকবেনা। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত চলা সম্মেলনের একটা অধিবেশনে পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং করণীয় শীর্ষক এজেন্ডার উপর বিভিন্ন থানা কিমিটির প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন না করে সরকার উল্টো জনসংহতি সমিতি ও চুক্তি বিরোধী অবস্থান নিয়ে পারস্পরিক দূরত্ব বাড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক দুই মারমা কিশোরী ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে প্রশাসনের অভিনব তালবাহানায় বুঝা যায় জুম্মরা কি ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। কর্মী সম্মেলন থেকে চাকমা রাণী য়েন য়েন এর উপর পুলিশের হামলার নিন্দা জানানো হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। টেলিফোন- +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
E-mail: pcjss.org@gmail.com, Website: www.pcjss-cht.org *শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা*